জঙ্গলের জার্নাল

বুদ্ধদেব গুহ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জঙ্গলের জার্নাল

বুদ্ধদেব গুহ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

দে' জ পা ব লি শিং ।। ক ল কা তা ৭ ০ ০ ০ ৭ ৩

www.BanglaBook.org

কাজিরাঙ্গা, আসাম, ১৯৮৬ মার্চ

গৌহাটি এয়ারপোর্টের কাছাকাছি আসতেই সন্ধে হয়ে গেল। প্লেন থেকে দেখা গেল নীচের পাহাড়ে পাহাড়ে আগুন লেগেছে। আগুনের বেশিটাই পাহাড়গুলোর কাঁধে বা মাথায়। মার্চের মাঝামাঝি সচরাচর বন-পাহাড়ে এরকম আগুন লাগে না। লাগে, আরও পরে। একটু অবাকই লাগল দেখে। তবে এ-বছর গরম খুবই তাড়াতাড়ি পড়ে গেছে। মে-জুন-জুলাইতে যে কী হবে ঈশ্বরই জানেন!

কলকাতা থেকে আসা ফ্লাইট টু-ফোর-নাইন ল্যান্ড করল, অধুনা গুয়াহাটিতে। সিঁড়ি লাগল। সিঁড়ি দিয়ে টারম্যাকে নামছি, এমন সময় ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের সাদা পোশাক-পরা এক ভদ্রলোক আমার নাম জিজ্ঞেস করলেন। তারপরই বললেন, "মজুমদারসাহেব আসছেন, ওঁর গাড়িটা একটু ঝামেলা করছে। আপনি লাগেজ ছাড়িয়ে নিয়ে বসুন। উনি এই এসে গেলেন বলে।"

ভাল করে চেয়ে দেখি গৌরদা। গৌরচন্দ্র ব্যানার্জি। দারুণ তবলা বাজান। জ্ঞানবাবুর ছাত্র ছিলেন।

বললাম, "বাঁয়া তবলা?"

গৌরদা বললেন, "বাক্স-বন্দী। সবে এসেছি ট্রান্সফার হয়ে।"

মজুমদারসাহেব মানে কল্যাণ মজুমদার। দীর্ঘদেহী, অবিবাহিত, ছটফটে, হঠাৎ-রাগী, কিন্তু ভালমানুষ কল্যাণ এখন ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের গৌহাটির স্টেশন ম্যানেজার। কল্যাণ একজন সাহিত্যিকও। একটি গল্প সংকলন এবং একটি উপন্যাসও প্রকাশিত হয়েছে ওর। উপন্যাসটি ওর জীবিকা নিয়ে। 'এক আকাশ, অন্য দিগন্ত'। চমৎকার লেখা। লোকমুখে শুনেছি, ওর একাধিক গল্পের ছবিও হয়েছে।

মাল ছাড়াতে-ছাড়াতেই কল্যাণ এসে গেল একমুখ হাসি নিয়ে। তারপর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওর গাড়িতে চড়িয়েই নিয়ে গেল শহরে। রাতটি কাটিয়েই পরদিন ভোরে কাজিরাঙ্গা যাব। 'কুবের ইন্টারন্যাশনাল' বলে একটি হোটেলে নিয়ে গেল কল্যাণ। সেখানের ফ্রন্ট অফিস ম্যানেজার মিস্টার পল খাতির-আত্তি করলেন অনেক। তিনি নাকি কলকাতার পার্ক হোটেলে ছিলেন। আসলে 'পাল'। আধুনিক হোটেলের ম্যানেজার হতে হলে পালে হাওয়া আটকায়, তাইই 'পল' হয়েছেন। কাল ভোরে বেরোবার জন্য হোটেল থেকেই গাড়ির বন্দোবস্ত করে দিলেন ওঁরা। কল্যাণের কারণে বিশেষ দেখভালও হল।

প্রথমবার কাজিরাঙ্গাতে এসেছিলাম উনিশশো বাহান্নতে। বাবার সঙ্গে। সেবারই স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা পাশ করে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হয়েছি। আমরা অবশ্য এসেছিলাম শিলং থেকেই। মুখার্জিজেঠু (বিরেনাথ মুখার্জি) আর গুরুদাসকাকুর সঙ্গে। গুরুদাস ঘোষ। তখন উনি শিলং-এ ইন্সপেকটিং অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ ইনকাম ট্যাক্স ছিলেন। আর মুখার্জিজেঠু ছিলেন আসাম, মেঘালয়, মণিপুর, নাগাল্যান্ড এবং ত্রিপুরার ইনকাম ট্যাক্সের কমিশনার। এখন দু-জনের কেউই নেই। গৌহাটি আসার সময় প্লেনেই আসামের তৎকালীন বনমন্ত্রী শ্রীআর. এন. দাস এবং তৎকালীন চিফ কনজারভেটর অফ ফরেস্ট মিস্টার স্ট্রেসি আমাদের সহযাত্রী ছিলেন। পরে ওঁরা গৌহাটি থেকে এবং আমরা শিলং থেকে গিয়ে মিলিত হয়েছিলাম কাজিরাঙ্গায়। শিলং পাহাড় থেকে গাড়িতে নেমে এসে পথে নগাঁওয়ের (নওগাঁ) সার্কিট হাউসে এক রাত ছিলাম। সঙ্গে মুখার্জিজেঠুর ছেলে গোপাল (শীতিকণ্ঠ) এবং নমুও (নমিতা) ছিল। গোপাল আমারই সমবয়সী ছিল। বন্ধুও। আজকাল দেখাশোনাও নেই। যে-যার জীবনের কাদাতে মরা পানকৌড়ির মতো গেঁথে গেছি।

সেইসব দিনের কথা মনে করলে মন বড় বিধুর হয়ে ওঠে। যে-দিনগুলো পেছনে ফেলে এলাম, সে-দিনগুলোই ভাল।

চিফ কনজারভেটর স্ট্রেসিসাহেব নিজে আমাদের ফ্লোরিকান পাখি চিনিয়েছিলেন। যাকে বলে, বেঙ্গল ফ্লোরিকান। চিনিয়েছিলেন রাইনো-বার্ডও। এক-খঙ্গ গণ্ডারের পিঠে বসে সেই ছোট্ট পাখিরা গণ্ডারের গায়ের পোকা খায়। বনমন্ত্রী দাসসাহেবও সঙ্গে ছিলেন। মনে আছে, তখনকার কাজিরাঙ্গার রেঞ্জ অফিস বলতে ছিল শুধুমাত্র একটি খড়ের বাংলো। তার কাঠের গেটের দু-পাশে দু-টি কাঠের গণ্ডার। অনেকেই গণ্ডার, রাইনো-মোষ, হগ-ডিয়ার ইত্যাদি দেখেছিলাম সেবারে। একটি ব্যাঙ-ডাকা স্কুলবাড়িতে রাত কাটিয়েছিলাম কাজিরাঙ্গা গ্রামে। তখন থাকার আর কোনো জায়গাই ছিল না সেখানে। নওগাঁ থেকে গাড়িতে এসে পরদিন কাকভোরে উঠেই কাজিরাঙ্গা দেখতে বেরিয়ে পড়েছিলাম।

দ্বিতীয়বার কাজিরাঙ্গাতে যাই, খুব সম্ভব উনিশশো সত্তর বা একাত্তরে। সঙ্গে আমার স্ত্রী-কন্যাও ছিলেন। প্রথমে গেছিলাম ইম্ফলে। মণিপুর রাজ্যের রাজধানী। সেখানে কয়েক দিন থেকে, 'মোরে'র সীমান্ত পেরিয়ে বার্মাতেও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেছিলাম পাসপোর্ট ছাড়াই 'তামু' নামের একটি সীমান্তবর্তী জায়গাতে। তখন প্যাগোডাতে উপাসনা হচ্ছিল। সুন্দরী মেয়েরা লুঙ্গি আর সিল্কের জামা পরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তারপরেই গেছিলাম লেক লক্‌টাক্‌। যে হ্রদের কাছেই নেতাজির আই. এন. এ. বাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় শাসকবাহিনীর যুদ্ধ হয়েছিল। টিনের চালে মেশিনগানের গুলির ঝাঁঝরা-করে-দেওয়া চিহ্নও দেখেছিলাম উনিশশো ছাপ্পান্নতে, যখন মা-বাবার সঙ্গে প্রথমবারে ইম্ফলে যাই।

মণিপুর থেকে গাড়িতে করে চমৎকার সব পাহাড়, উপত্যকা, ঝরণা পেরিয়ে এসেছিলাম নাগাল্যান্ডের পথে। বর্ষাতে। নাগাল্যান্ডের নানা জায়গা এবং 'মাও' পেরিয়ে। মনে আছে, পথের পাশে-পাশে অনেক জায়গাতেই হরিণের মাংস বিক্রি হচ্ছিল। কোহিমাতে পৌঁছেছিলাম সন্ধেবেলা। কোহিমাতে ছিলাম এম. এল. এ হস্টেলে। কোহিমার নাগা রেস্তোরাঁতে, আমার স্ত্রীর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও সাপের মাংস খেয়েছিলাম। বেকার! আমাদের শিকারি-দোস্ত পাঁচু ওর চেয়ে অনেক ভাল সাপ রাঁধে।

পরদিন নাগাল্যান্ডের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মি. হোকেকোসিমা সবাইকে চা-পানের জন্যে নেমন্তন্ন করেছিলেন। উনিই ডিমাপুরের ফরেস্ট বাংলোও ঠিক করে দেন আমাদের থাকার জন্যে। কোহিমা থেকে বাঁশ আর বেতবন আর নিশ্ছিদ্র হরজাই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বয়ে-যাওয়া 'ডিফু' নদীর পাশে-পাশে-চলা খাড়া পথ বেয়ে নেমে এসেছিলাম ডিমাপুরে। ডিমাপুরের ফরেস্ট বাংলোতে দু-দিন থেকে চা-বাগানের পর চা-বাগান পেরিয়ে এসে পৌঁছেছিলাম কাজিরাঙ্গায়। সেবারেই দেখেছিলাম যে, আসাম গভর্নমেন্টের সুন্দর দোতলা একটি ট্যুরিস্ট লজ হয়েছে। তার ডানপাশে কয়েকটি পরপর কটেজও ছিল। আই. টি. ডি সি.-র না আসাম সরকারের ঠিক মনে পড়ছে না। মাথায় খড়ের ছাউনি, কিন্তু ভিতরে এয়ার কন্ডিশন্ড। সেই বাংলোতেই থাকা হয়েছিল। উনিশশো বাহান্নর ব্যাঙ-ডাকা স্কুলবাড়িতে রাত কাটানোর পর 'কোয়াইট-আ-চেঞ্জ'। তাই না?

সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে সবকিছুই বদলে যায় খুব দ্রুত। সবচেয়ে বেশি বদলে যায় বোধহয় মানুষ নিজেই। রোজ সকালে উঠে আয়নায় যে-মুখকে আমরা দেখি, তার আদলের কোনও বদল আদৌ হয়েছে বলে নিজের চোখে ধরা পড়ে না, কিন্তু কখনও ছেলেবেলার কোনও বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে আতঙ্কিত হয়ে উঠে নিজেকেই বলতে হয়, আরে, এই বিচ্ছিরি লোকটা আবার কে! পরমুহূর্তেই দুঃখের সঙ্গেই বুঝতে হয়, মানতে হয় যে, আমার মুখটিও নিশ্চয়ই আমার বন্ধুর মুখেরই মতো বিচ্ছিরি হয়ে গেছে।

বদল অবশ্য শুধু মুখেই হয় না। সময় মনকেও বদলে দেয়। ছেলেবেলার যে-আমি রেলগাড়ির জানালার পাশে বসে টেলিগ্রাফের তারের লেজ-ঝোলা ফিঙের চকিতচিকন আওয়াজ অথবা রেলগাড়ির অসংখ্য গড়িয়ে-চলা চাকার বিভিন্ন বোল এবং তালের বাজনায় কতখানিই না খুশি হতে পারতাম,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেই আমিই তো খুশি যে কী করে হতে হয় তা আজ ভুলেই গেছি।

কাজিরাঙার কথা এসে পড়াতে অনেক অনেক অপ্রাসঙ্গিক পুরনো কথা এবং হয়তো অপ্রাসঙ্গিক ঘটনাও মনে এসে গেল। উনিশশো বাহান্নতেই বাবা আর মুখার্জি জেঠুর সঙ্গে আমরা ওই দলই গেছিলাম গারো পাহাড়ের রাজধানী 'তুরা'তে। সবে পথের দু-পাশের পাহাড়ে-পাহাড়ে জুম্ চাষ করবার জন্যে আগুন দিয়ে পোড়ানো হয়েছে জঙ্গল। তাতে আবার বৃষ্টি হওয়ায় পোকামাকড়ে ভর্তি। ঝাঁকে-ঝাঁকে রঙ-বেরঙা বুনো-মুরগি চরে বেড়াচ্ছিল শেষ-বিকেলে। নলবাড়ি থেকে তুরা পৌঁছতে পৌঁছতেই জিপে বসে পথ-পাশের আগুনে-সাফ কালো বনে আটটি বনমোরগ মেরেছিলাম শট্-গান দিয়ে। রাতে ওই দিয়েই হয়েছিল আমাদের ডিনার। রাতটা সার্কিট হাউসে ছিলাম তুরাতে পৌঁছে।

সকালবেলা রওনা হওয়া গেল গৌহাটি থেকে কাজিরাঙার দিকে। অ্যাম্বাসাডর গাড়ির চালকের নাম শ্রীকান্ত। আগরতলার লোক। গাড়ির যিনি মালিক তিনি রওনা হবার আগে তাকে ডেকেছিলেন 'শ্রীকান্ত' বলে। ক্রিকেটারের নামে বোধহয় স্মার্ট মনে হয় বেশি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মেঘালয়ে এসে পড়লাম। জোড়বাট। ডান দিকে শিলঙের পথ চলে গেছে। কিছুটা গিয়েই আবার আসাম।

নওগাঁ এখন মস্ত জায়গা। আজ থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে একটি শান্ত ঘুমন্ত শহর বলেই মনে হত তাকে। ঘুম এখন বোধহয় সব শহরের চোখ থেকেই বিদায় নিয়েছে চিরতরে। নওগাঁতে পৌঁছবার আগে জাগি রোডে (নাথোলা) হিন্দুস্থান পেপার করপোরেশনের মস্ত কারখানা। কাগজের মিলে দু-দিক থেকে সার-সার ট্রাক, বাঁশ আসছে বিভিন্ন জায়গা থেকে। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে কোয়ার্টার্স। বিরাট শহর গড়ে উঠেছে এই কারখানাকে কেন্দ্র করে। ইউনিট টু-র ছোট-ছোট বাড়ি এবং ইউনিট ফোরের ফ্ল্যাটবাড়ি সব পথের পাশে।

নওগাঁর আগে ও পরে চওড়া রাস্তার দু-পাশে বাঁশের চ্যাগার-দেওয়া সব বাড়ি। কলাগাছ, পেঁপেগাছ, সুপারিগাছ (গুয়া); গেটের উপর বোগেনভেলিয়া। উত্তরবঙ্গের চেয়ে আসামের জনসংখ্যা কম। অনেক বেশি ছিমছাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন উত্তরবঙ্গের তুলনায়। আসামের গান, নাচ,

www.BanglaBook.org

সাহিত্য, ইতিহাস, এসবও বহু পুরনো। বাঙালিদের মস্ত দোষ এই যে, আমরা সব সময় নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত থেকেছি। প্রতিবেশীদের খোঁজ পর্যন্ত রাখিনি বিশেষ। কূপমণ্ডূকতা সত্যিই মস্ত দোষ আমাদের। আসামের বিশিষ্ট নিজস্ব সংস্কৃতিও আছে। বিনয়, নম্রতা, সভ্যতা, এসবও শেখার আছে। যদি শেখার আগ্রহ কারও থাকে।

এই পথেই পড়ে আইতত্তাবি গ্রাম। বিখ্যাত অহমিয়া লেখক লক্ষ্মীনারায়ণ বেজবরুয়ার জন্মস্থান। মূল পথ থেকে চলে যেতে হয় কিছুটা ভেতরে। পথের উপরে নিশানাও দেওয়া আছে।

দেখতে-দেখতে পথের বাঁ পাশে ব্রহ্মপুত্র দেখা গেল। মার্চের মাঝামাঝিও তার বিস্তৃতি দিগন্তে লীন। তীর দেখা যায় না খালি চোখে এখনই। বর্ষায় তো কথাই নেই। এই ব্রহ্মপুত্র, মধ্যপ্রদেশের নর্মদা, উত্তরবঙ্গের তিস্তা বা ওড়িশার মহানদীরই মতো অত্যন্ত প্রিয় আমার। এই নদের একরকম রূপ আসামের গোয়ালপাড়া জেলার ধুবড়ি শহরের কাছে। এই বুড়হা পাহাড় কাজিরাঙ্গার সামনে আবার অন্য রূপ। এরই অন্যতর রূপ চোখে পড়ে ডিব্রুগড়ে।

যে-কোনও নদ বা নদীই প্রথম দর্শনে আমাকে পেছনের লালবাতি-জ্বালানো আউটার-সিগন্যাল পেরিয়ে যাওয়া দ্রুতগামী ট্রেনেরই মতো হঠাৎই বিবশ করে দেয়। নদীর দৌড়ে-যাওয়া উধাও জলরাশির দিকে চেয়ে মনে হয় আমারও যেন কোথাও যাবার ছিল অথচ যাওয়া হল না।

বুড়হা পাহাড়ের মধ্যে দিয়েই চওড়া পথ, ন্যাশনাল হাইওয়েটি চলেছে। সে আসছে গৌহাটি থেকেই। পাশে প্রায় হাতে হাত রেখেই সে যেত। আগে পথটি ছিল খুবই সরু। নদীর পাশে প্রত্যেক বছরই বন্যায় গণ্ডার আর হগ্-ডিয়ার, বাইসন আর বুনো-মোষেরা সাঁতরে এসে উঠত এই পথে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে। বিস্তীর্ণ, মাইলের পর মাইল নদীর চরে বাসা-বাঁধা-চড়ুয়ারা, যারা গোরু-মোষ পালে, তরমুজ আর ফুটি ফলায় বালিতে, তারাও সব উদ্বাস্তু হয়ে যেত। ঘরের প্রতি মায়া যাদের নেই, তাদের মতো সুখী মানুষ বুঝি আর হয় না। চড়ুয়ারা ঘর ভাসাবে বলেই ঘর বানায় প্রতি বছর। তাদের খুবই ঈর্ষা হয় আমার।

কুওয়ারিটোলে এসে পৌঁছলাম। এখান থেকেই বাঁ দিকে শিলঘাটে চলে গেছে পথ ন-কি. মি-র মতো। ব্রহ্মপুত্রের ওপারে যারা যেতে চায়, তাদের এখান থেকেই নদী পেরোতে হয় ফেরিতে। গাড়ি, ট্রাক. সবই ফেরিতে পেরোনো যায়। ওপারে ভোমরাঘাটে গিয়ে ওঠে তারা। ভোমরাঘাটে একবার গিয়ে উঠতে পারলে সেখান থেকে তেজপুর অল্পই পথ।

বুড়হা পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে গাড়ি চলেছে এখন। শ্রীকান্ত দশটি প্রশ্নের একটি উত্তর দেয়। তাও তার ত্রিপুরী ভাষায়। মানুষটিকে সাধু-সন্নিসি টাইপের বলে মনে হল। তার উপর মুখে আবার সর্বক্ষণ পান-জর্দা। কিছু শব্দ বাইরে আসে, কিছু আসে না। হঠাৎ পথের বাঁ দিকে চোখ পড়ায় তাকে

www.BanglaBook.org

দাঁড় করাতে বললাম গাড়ি। দেখি, প্রায় গোটা-পাঁচেক জেনুইন গণ্ডার ঘাস খাচ্ছে ব্রহ্মপুত্রর পারের গভীর ঘাসের এবং অন্যান্য হরজাই গাছগাছালির বনে। কাল দুপুরে বোধহয় কোনও বিলে গা ডুবিয়ে ছিল। গা-ময় কাদা। এখন শুকিয়ে গিয়ে সাদা দেখাচ্ছে। আমাদের গণ্ডারেরা আসলে এমন ফর্সা নয়। শুকনো কাদার সাদা পাউডার মেখেই এমন ফর্সা হয়েছে।

আফ্রিকান দু-শিঙ্গর গণ্ডারও দেখেছি পুব আফ্রিকার গোরোংগোরোর মৃত আগ্নেয়গিরির খোলে। সেরেংগেটির ঘাসবনের ভেতরের জলাতে জলহস্তী। আমি তো দেখেইছি, ড্রাইভার শ্রীকান্তকেও একটু ওয়াকিবহাল করার মহৎ উদ্দেশ্যে বললাম, "দেখেছ শ্রীকান্ত, ওগুলো গণ্ডার। দ্যাখো। দেখে নাও।"

শ্রীকান্ত তার কথার সঙ্গে পান-জর্দার খুশবু উড়িয়ে, চোখ না-তুলেই বলল, "ওইগুলান্ আর দ্যাখনের আছেডা কী?"

উত্তেজিত হয়ে আমি বললাম, "কও কী তুমি?"

"হঃ। গেন্দা! কেডায় না দ্যাখছে? আমার কাকার দুকান আছে কাজিরাঙ্গায়। আটটা গাই এহনো। আটটাই একলগে বাচ্চা দিছে। দুধের বান ডাইক্যা গেছে ইক্কেরে।"

বুঝলাম, দুকান মানে দোকান। "তার সঙ্গে গণ্ডার দেখার সম্বন্ধ কী?" হতভম্ব হয়ে আমি বললাম।

তারপর শ্রীকান্ত বলল, "আমি যখন ছোট ছিলাম, এহানেই ছিলাম। গোরুগুলো চরত আপনমনেই। কোনও-কোনওদিন গোরুর পিঠে চড়েও যেতাম। চারধারেই গেন্দা। অবশ্য বড় বাঘও ছিল। গত বছরেই তো বর্ষাকালে কাকার দুটো গোরু খেয়েছে বাঘে। বাঘ অবশ্য দেখা যায় না। সে চেহারা দেখাবে বলে মনঃস্থির না করলে তাকে দেখা মুশকিল বড়। হেই সক্কলই আমার দেখা।"

"ভালই তা হলে।" বাহাদুরি না-করতে-পেরে হতাশ গলায় বললাম আমি। তারপর বললাম, "এখন চোরা-শিকার কেমন হচ্ছে এখানে?"

"আছে।" বলল শ্রীকান্ত। এমনভাবে 'আছে'টা বলল যেন আছেও, আবার নেইও।

একটু চুপ করে থেকে আবারও বলল, "মার্চ মাসেই তো একজন গার্ডকে গুলি করে মেরে দিয়ে গেল।"

"তাইই? এটাও তো মার্চ মাসই চলছে।" অবাক গলায় বললাম আমি।

"হ!" শ্রীকান্ত বলল, "পান খাইবেন নাকি স্যার? ড্যাশবোর্ডে রাখছি। ক-টা দিমু?"

"আরে! একজন ফরেস্ট গার্ড পোচারের গুলি খেয়ে মরে গেল; আর আমি পান খাব কি?"

"তা কী কইরবেন আর। এই মার্চে তো নয়, হেই মার্চে।"

"হেই মার্চে মানে?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"এই গত বছর, এই সময়ই আর কি। নাইনটিন এইটটি ফাইভে।"

"ও। তাইই বলো।"

গাড়িটা ডান দিকে ঢোকাল শ্রীকান্ত, টাটার চা-বাগান পেরিয়ে এসে টাটারই অন্য একটি বাগানে। হাতিখুলি বাগান। এরই পাশে ইন্ডিয়ান ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট করপোরেশনের ট্যুরিস্ট লজ্। আসাম গভর্নমেন্টেরও লজ আছে। ডর্মিটরিও। অনেকই থাকার জায়গা। গুয়াহাটি থেকে দুশো সতেরো কি.মি. চলে এলাম দেখতে-দেখতে।

যে-পথটা ছেড়ে দিয়ে শ্রীকান্তর গাড়ি ডান দিকে ঢুকল, সেই পথটাই দুপুরের আলোছায়ার মধ্যে উড়ে-উড়ে দুলতে-দুলতে চলে গেল সাইখোয়া-ঘাট। অতদূর যাবার ইচ্ছে ছিল না। ইচ্ছে হল মেথোনি চা-বাগান পেরিয়ে, বোকাহাট পেরিয়ে, ধানসিরি পোলো ক্লাবে গিয়ে একটু ঘুরে আসি। জীবনানন্দ দাশের কবিতার কথাও মনে হল।

আই. টি. ডি. সি. লজের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার সনৎ কর বাঙালি বটে, কিন্তু কাজিরাঙ্গারই বাসিন্দা। অহমিয়াই হয়ে গেছেন। বাংলা বলেন, এই পর্যন্ত। বাংলা পড়াটড়ার পাট চুকে গেছে। দোষটা তাঁদের নয়, বাংলার বাঙালিদেরই। বাংলার সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য—সবকিছুই যে বাংলার বাইরে ধীরে-ধীরে মরে যাচ্ছে তার জন্যে আমরাই দায়ী। এর ফলটা বোঝা যাবে আরও পনেরো-কুড়ি বছর পরে। তখন আর কিছুই করার থাকবে না।

সনৎ কর খাতিরযত্ন করলেন। ভাল ঘরও দিলেন।

কাজিরাঙ্গা ন্যাশনাল পার্কের এলাকা প্রায় সাড়ে চারশো বর্গ-কিমি-র মতো। উনিশশো একাত্তর সাল থেকে কার্বি অ্যাংলঙ্গ পাহাড়শ্রেণীর বৃটিশ বর্গ কিমি মতো এলাকাও এর মধ্যে আনার কথাও চলছে। কিন্তু এখনও কিছু হয়নি।

কার্বি কিন্তু একটি ভাষার নাম। এই ভাষা যে-পাহাড়িরা বলে, তারা হচ্ছে মিকির। আদিবাসী। নির্বিরোধী। স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে ভালোবাসে তারা এবং উঁচু পাহাড়ে নিজেদের পুরনো জীবনযাত্রা নিয়ে, নিজেদের সামাজিক রীতিনীতি নিয়ে নিজেদেরই মতো সুখে থাকে। এই আধুনিক, সভ্য মানুষদের প্রতি তাদের আস্থা বিশেষ নেই। তাই তারা তাদের এড়িয়েও চলে। ওদের নিজস্ব সুখ নিয়ে ওরা সুখে আছে।

কার্বি-অ্যাংলঙ্গ ওই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত না-হলেও বুড়হা-পাহাড় থেকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গোটাঙ্গা, সিলডুবি অঞ্চল, পানবাড়ি, কাঞ্চনজুরি, হলদিবাড়ি এবং ব্রহ্মপুত্রর প্রায় চারশো বর্গ কি. মি. এলাকাও এখনকার সাড়ে চারশো বর্গ কি. মি. এলাকার মধ্যে পড়ে। এইসব অঞ্চল বিভিন্ন সময়ে যুক্ত হয়েছে এই এক-খড়্গ গণ্ডারের অভয়ারণ্য কাজিরাঙ্গার সঙ্গে।

শুধু ব্রহ্মপুত্রই নয়, কত ছোট-ছোট নদী আর বিল যে আছে ওর ভিতরে তার ইয়ত্তা নেই। মূল এলাকা কিন্তু উলুবন (এলিফ্যান্ট গ্রাস) আর কিছু 'কাঠোনি'র। কাঠোনি মানে কাঠের বা বড় গাছের জঙ্গল। মরা ডিফ্‌ফুল, ডিফ্‌ফুলু, ভেংড়া-বরজুরি, ডিরিং, কোহরা, ডেহিং, ভালুকজুরি আর দেওপা নদী বয়ে গেছে এর মধ্যে-মধ্যে। এদের কেউ-কেউ পুব থেকে পশ্চিম দিকে বয়েছে, কেউ-কেউ কার্‌বি-অ্যাংলঙ্গ পাহাড় থেকে নেমে এসে ব্রহ্মপুত্রে গিয়ে মিশেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে। এইসব নদীর মধ্যে-মধ্যে যেসব ছোট-বড় চরের দ্বীপ গজিয়েছে, তাদের বলে 'চাপারি'।

জানোয়ারের মধ্যে এখানে আছে গেন্দা বা এক-খড়্গ গণ্ডার, হাতি, বুনো-মোষ, আফ্রিকায় যাদের বলে 'ওয়াটার বাফেলো', ভারতীয় বাইসন বা গাউর, শম্বর, হগ-ডিয়ার, উল্লুক বা হোয়াইট-ব্রাওড গিব্বন, লাঙ্গুর, সাদা মাথার, বাঘ, নানারকম সিভেট্‌-ক্যাট, বেজি, উদবেড়াল, ভালুক, সোয়াম্প্‌-ডিয়ার আর গাঙ্গেয় শুশুক। পাখিও আছে নানারকমের। স্কাইলার্ক, স্পট-বিল্‌ড এবং ধূসর পেলিকান, নানারকম বক, যারা কাদামাখা হাতিদের পিঠে চড়ে পিঠের পোকা খেতে-খেতে মাহুতের মতোই তাদের চরিয়ে বেড়ায় মেঘহীন নীলাকাশের বেড়া-ঘেরা নরম দুপুরের ঘাসের বনে-বনে। আছে নানা জাতের ঈগল, বেঙ্গল ফ্লোরিকান, গণ্ডারের গায়ের পোকা-খাওয়া ছোট-ছোট টিক-বার্ড অথবা রাইনো-বার্ড। সাপেরা এবং তাদের জাতভাইয়েরাও কম নেই। কমোন মনিটর-লিজার্ড, কমোন কোবরা, কিং-কোবরা আরও নানা জাতের বিষধর ও নির্বিষ সাপ; কচ্ছপ। মাছও আছে। ইয়া বড়-বড়। বড়-বড় চকচকে রুপোলি চিতল ঘাই মারে হুলালপথ নদীতে, যে-নদী ব্রহ্মপুত্রে গিয়ে পড়েছে। ওই মোহনার নাম ডিফ্‌ফলমুখ। কী চমৎকার যে তেল এইসব চিতলমাছে! ধনেপাতা, কাঁচালঙ্কা দিয়ে পেটি রাঁধলে যা খেতে হবে, তা ভাবলেই জিভে জল এসে যায়।

বড় বিলের মধ্যে, ঘাসিয়ামারি। ছোট, ভইষামারি।

বিকেলেই বেরোলাম গাড়ি নিয়ে। হাতিতে চড়লে রাজা-মহারাজা মনে হয় বটে নিজেদের কিন্তু সে অল্প বয়সেই। যখন পেটে চর্বি ছিল না তখন হাতিতে চড়ে বিহার ও ওড়িশার অনেক জায়গায় এবং উত্তরবঙ্গের তিস্তার চরে-চরে এক সময় শিকার করেছি। কিন্তু এখন হাতিতে চড়লে চিতলের পেটি আর তেলকই-খাওয়া পেটের চর্বি 'কে রে' 'কে রে' করে আর্তনাদ করে ওঠে। রাজা-মহারাজা হওয়া বড়ই কষ্টের। তাই তা হওয়ার শখ বর্জন করেছি বাধ্য হয়েই।

একদল হাতি দাঁড়িয়ে আছে মিহিমুখ বিলের পাশে। শুকিয়ে-যাওয়া

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাদায় তাদের প্রত্যেককে চিত্র পরিচালক তপন সিংহ'র 'সফেদ হাতি' বলেই মনে হচ্ছে। বাঁ দিকে একটি একলা দাঁতাল দাঁড়িয়ে কী ভাবছে। অহমিয়াতে এদের বলে 'বুরুন্টিকা'। কাদা মেখে কিম্ভূতকিমাকার মূর্তিতে সে দাঁড়িয়ে আছে বর্ষাকালের কলকাতার ময়দানের জার্সি-পরা কাদামাখা ফুটবলারেরই মতো। মেজাজও বেশ খারাপ। মনে হচ্ছে, কয়েক গোলে হেরেছে ম্যাচ।

অনেকেই দেখলাম, যাঁদের বন-জঙ্গল এবং জংলি জানোয়ার সম্বন্ধে অহেতুক ভীতি আছে; সঙ্গে রাইফেলধারী গার্ড নিয়ে এসেছেন। কিন্তু রাইফেল নামেই রাইফেল। থ্রি-ফিফ্‌টিন। ইন্ডিয়ান অর্ডিনান্সের রাইফেল। কারও হাতে একনলা বা দোনলা বন্দুক। ওই সব রাইফেল বন্দুক নিয়ে হাতি গণ্ডারকে আওয়াজ করে ভয় দেখানো ছাড়া আর কিছুই হয় না। তার চেয়ে বেসুরে গান গাইলে এফেক্ট আরও ভাল হতে পারে। তেমন গায়ক সাপ্লাই করতেও অসুবিধে নেই। বিস্তর আছে। অবশ্য এটাও ঠিক যে, গার্ডদের কাজই তো প্রয়োজনে ওদের শুধু ভয় পাওয়ানো, মারা নয়।

আমার সঙ্গের গাইডের নাম বীরেন দত্ত। সরু গোঁফ। মিষ্টি মুখ।

কাজিরাঙ্গার রেঞ্জার শ্রীগুনিন শইকিয়ার সঙ্গে আজ দুপুরে অনেকক্ষণই ছিলাম চোরা-শিকারিদের সঙ্গে সংঘর্ষের কথা ভাল করে জানতে।

এই ঘাসী কাজিরাঙ্গাতে গাছ আছে নানারকম। তবে এসব গাছ বন-পাহাড়ের গাছেদের থেকে অনেকই আলাদা। চেহারাও অন্যরকম। লাংলার টোপর-পরা বর আর আফগানিস্থান বা উগান্ডার বরের চেহারায় যেমন তফাত থাকেই, এখানের শিমুল, শিশু বা হিজল, গামারি বা সিধা গাছের সঙ্গেও বিহার, ওড়িশা বা মধ্যপ্রদেশের ওই গাছেদের চেহারার বিস্তর ফারাক। স্থানীয় ভাষায় এইসব গাছকে বলে পোমা, নাহর, বনশুক, গামারি, সিধা, বরুণ, সতিয়ানা, এজার, হুঁয়ালো, ভেঁলো। ভেঁলো হচ্ছে শিমুল বা সতিয়ানার মতো। তক্তা হয় তাতে। এজার গাছে-গাছে বৈশাখে সুন্দর ফুলও ফোটে। গোলাপি। চৈত্রে এখন পত্রহীন। উলঙ্গ হয়ে অসংখ্য হাত আকাশের দিকে তুলে উদ্বাহু হয়ে পথপাশের সারি-সারি এজার যেন বৃষ্টির প্রার্থনা জানাচ্ছে। তবে বৃষ্টির বাড়ি এখনও অনেক দূরে।

কাঠোনিতে ছোট-বড় শিমুলই বেশি। দু-চারটে বড়-বড় বট-অশ্বত্থও আছে। ব্রহ্মপুত্রের বানের মধ্যেই তাদের বেঁচে থাকতে হয়। তাই চেহারাও কেমন ডাঙায় রোদপোয়ানো কুমির-কুমির হয়ে যায় তাদের। রুখু-রুখু।

ঘণ্টাখানেক ঘুরেটুরেই বীরেন দত্ত বললেন, "এবার আমার ডিউটি অফ্‌। ফিরে চলুন।"

গভীর জঙ্গলের দিকে বাঁ দিকে যে-পথটা চলে গেছে, সেটাই গিয়ে উঠেছে বুড়হা পাহাড়ে যে কাঞ্চনজুরি গেট আছে, সেইখানে। সে-পথে যেতে পারলে ভালভাবে দেখা যেত। কিন্তু পারমিশান নেই। সে-পথে নাকি রাইফেল-বন্দুকধারী গার্ডরা ছাড়া অন্যদের সঙ্গে যাওয়ারও অর্ডার নেই।

আমার অভিজ্ঞতা বলে যে, সব অভয়ারণ্য অথবা গেম-পার্কের বন-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিভাগের কর্মীরাই কড়াকড়ির ব্যাপারে একটু বাড়াবাড়িই করে থাকেন। তাঁরা ছাড়াও যে বনজঙ্গল বা বন্যপ্রাণী সম্বন্ধে অন্য কেউও কিছু-কিছু জানতে পারেন, এমন কথা ভাবাও বোধহয় তাঁদের অনেকের পক্ষেই মুশকিল। অবশ্য ট্যুরিস্টদের বেশিরভাগই যে জানেন না এটাও ঠিক। তাই তাঁদের খুব একটা দোষও দেওয়া যায় না। তবে ব্যতিক্রম কোনও-কোনও ক্ষেত্রে করলে, সেই অভয়ারণ্যেরই প্রচার হতে পারে। তাতে লাভ তাঁদেরই। পূর্ব আফ্রিকার বনে-পাহাড়ে ভক্সওয়াগনকম্বি গাড়িতে করে একা-একাই যখন ঘুরছিলাম তখন তার ড্রাইভার-কাম-গাইডও আমার সঙ্গে শ্রীবীরেন দত্তর মতোই ব্যবহার করেছিলেন। গাড়ি থেকে নামলেই নাকি সিংহ ক্যাক করে ঘাড় কামড়ে ধরবে, নয়তো গাম্বুন ভাইপার সাপ হিস্‌হিস করে কামড়ে দেবে। নিদেনপক্ষে সেৎসি মাছি তো আছেই।

ওঁর কথা আমি অবশ্য শুনিনি, যদিও আফ্রিকা ছিল বিদেশ। নিজের দেশের বনবিভাগের কর্মীরাও যদি বিদেশের কর্মীদেরই মতো ব্যবহার করেন, তা হলে দুঃখ একটু হয়ই। দর্শনার্থীদের মধ্যেও কে যে কেমন, সে সম্বন্ধেও একটা মোটামুটি ধারণা থাকলে ওঁদের পক্ষেও ভাল। নিজের পরিচয় যতটুকু একজন ভদ্রলোকের পক্ষে নিজমুখে দেওয়া সম্ভব তা দিয়েওছিলাম রেঞ্জার শ্রীশইকিয়াকে, তা সত্ত্বেও ভালভাবে ঘোরা হয়ে উঠল না।

বীরেন দত্তকে চা-শিঙাড়া খাওয়ালাম গেটের বাইরে এসে। পান-জর্দাও। কিছু সোয়াম্প-ডিয়ার, হগ-ডিয়ার, একটি একা-ওড়া গ্রে পেলিকান, একটি মেছো-ঈগল এবং হুলালপাথে সেই উলটানো-পালটানো বড় বড় চিতলমাছ ছাড়া আর কিছুই দেখা হল না।

আগেই শুনেছিলাম গত বছরে, অর্থাৎ উনিশশো পঁচাশিতে মতিলাল বড়ুয়া নামের একজন ফরেস্ট-গার্ড চোরা-শিকারিদের গুলিতে এখানে প্রাণ হারান। মার্চের আঠাশ তারিখে।

স্টেসিসাহেবের আমলেও এ-অঞ্চলে গণ্ডারের চোরা-শিকার ছিল। কিন্তু তখন আগ্নেয়াস্ত্রের এমন ছড়াছড়ি ছিল না। ইংরেজরা তখন সবে দেশ ছেড়ে গেছেন। তাঁদের সময়কার আইনশৃঙ্খলা, কানুনের ভয়-ডর তখনও কিছু বেঁচে ছিল। এখনকার ভারতীয়দের মতো সকলেই 'স্বাধীন' হয়ে যায়নি তখনও। যথার্থ স্বাধীনতা মানেই যে জীবনের অনেকানেক ক্ষেত্রে স্বেচ্ছারোপিত পরাধীনতাও, এমন কথা আমরা মানিনি বলেই দেশের এমন আহামরি অবস্থা আজকে। সৈয়দ মুজতবা আলি 'দেশে বিদেশে'তে লিখেছিলেন যে, কাবুল শহরের পথে ঘোড়ার গাড়িতে করে যাচ্ছেন, মানুষজন, খচ্চর, উট, গাধা—সবাই নিজের খেয়ালে পথ চলছে। ঘোড়ার গাড়ি তাদের সবাইকে কাটিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে করে এঁকেবেঁকে পথ চলেছে। মানুষদের তো বিশেষ সমীহ করেই। আলিসাহেব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তোমাদের এখানে কি আইনকানুনের কোনও বালাইই নেই?' সঙ্গী তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেছিল, 'আমরা হচ্ছি স্বাধীন জাত। আমরা কি তোমাদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মতো পরাধীন? এখানে সকলেই স্বাধীন। যার যেরকম খুশি সেইরকমই চলবে।'

সেই ধরনের স্বাধীনতা ছিল বলেই আফগানিস্থানের আজ এই দুরবস্থা। আমরা ভারতীয়রাও এখন সেইরকমই স্বাধীন হয়েছি। ভয় হয়, আমাদের দেশের অবস্থাও আফগানিস্থানের মতোই না হয়। প্রত্যেক স্বাধীনতারই মধ্যে যে একধরনের স্বেচ্ছা-পরাধীনতার ব্যাপার থাকেই, যা না থাকলে এবং যা না মানলে কোনও দেশই এগোতে পারে না; তা এতদিনেও আমরা শিখে উঠতে পারলাম না।

স্লেইসিসাহেবের সময়ে দিশি চোরা-শিকারিরা গাদা-বন্দুক ব্যবহার করত। উনিশশো আশি পর্যন্ত এখানে গণ্ডারদের চোরা-গর্তে ফেলেই কবজা করত চোরা-শিকারিরা।

গণ্ডারদের এক আশ্চর্য স্বভাব আছে। তারা একই জায়গায় কিছুদিন ধরে নোংরা করতে থাকে। সেখানে ছোটখাটো পাহাড় জমে উঠলে সেই জায়গা বদলায় তারা। ওই সময়ে ভাল-আগ্নেয়াস্ত্রহীন চোরা-শিকারিরা সেইরকম জায়গার কাছাকাছিই লুকিয়ে থাকত। তারপর গেন্দা নোংরা করার সময় লেজ উপরে তুললেই গুলি করত, ভাল করে বারুদঠাসা গাদা বন্দুকের সিসের গুলি দিয়ে। নরম জায়গায় গুলির ক্ষত হলে সে-ক্ষত কখনওই শুকোয় না। গুহ্যদ্বারে ক্ষত তো নয়ই।

গুলি করার পর চোরা-শিকারিরা সন্তর্পণে সেই গেন্দাকে অনুসরণ করত। কয়েক দিন পর রক্তক্ষরণে-ক্ষরণে সে বেচারি যখন চলচ্ছক্তিহীন হয়ে মাটিতে পড়ে যেত, তখন তারা তার খড়্গ কেটে নিয়ে যেত 'দাও' দিয়ে কুপিয়ে-কুপিয়ে তাকে মেরে।

এত শিক্ষার প্রসারের পরও পৃথিবীর নানা দেশের অনেক গণ্ডার-সদৃশ মোটা-চামড়ার বড়লোক, যারা শুধু নিজেদের ভালটাই বোঝে, অন্যের চিন্তা আদৌ করে না, তারা নিজেদের চিরদিনই তরুণ রাখবার জন্যে গণ্ডারের খড়্গের গুঁড়ো দিয়ে বানানো এরকম ওষুধ এখনও খায়। টোটকাতে বিশ্বাস করে। ওই গুঁড়ো নাকি বুড়োদেরও জোয়ান করে দেয়। ধারণা, তাদের। আর সেই কারণেই পৃথিবী থেকে গণ্ডার প্রায় লোপ পেয়ে যেতেই বসেছে।

BanglaBook.org

কাজিরাঙ্গার অভয়ারণ্য এলাকার মধ্যে-মধ্যে ফরেস্ট গার্ডদের, চোরা-শিকার বন্ধ করার জন্যে এবং জানোয়ারদের খোঁজখবর রাখবার জন্যে ক্যাম্পে থাকতে

www.BanglaBook.org

হয় ভাগ-ভাগ করে। সাধারণত এক-একটি ক্যাম্পে চারজন করে গার্ড থাকে। তাদের চারজনের মধ্যে দু-জনের কাছে হয় থ্রি-ফিফ্‌টিন রাইফেল, নয়, দু-নলা বা একনলা টুয়েলভ্‌-বোর শট্‌গান থাকে।

মতিরামের বয়স হয়েছিল বছর-চল্লিশেক। কাঞ্জিরাঙ্গা থেকে বনবিভাগেরই বানানো একটি পথ দিয়ে গেলে মাইল দশেক পরে পেলিকান কাঠোনি। এক সময়ে ওই কাঠোনিতে পেলিকানরা বাসা বেঁধে ডিম পাড়ত। এখন তারা বনের আরও অনেক গভীরে চলে গেছে যদিও, কিন্তু পেলিকান কাঠোনির নাম পেলিকান কাঠোনিই রয়ে গেছে। পেলিকান কাঠোনিতে বড় গাছের মধ্যে ছিল কোরোই (অ্যাল্‌বিনিয়া প্রোসেরা), বোল আম, আউটেঙ্গা (ডেলিয়ানা ইন্ডিকানা), দু-একটি বড় অশত্থ, শিমুল, সিধা ইত্যাদি।

ঘটনার দিন শ্রীগুনিন শইকিয়া, রেঞ্জার এবং শ্রীস্বপন শীল শর্মা (এখন কার্শিয়াঙের রেঞ্জার্স কলেজে আছেন) রেঞ্জ অফিসে বসে একজন চোরা-শিকারিকে ভাল করে জেরা করছিলেন। অল্প ক-দিন আগেই একটি গণ্ডারকে গুলি করার অপরাধে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। জেরা যখন চলছে ঠিক সেই সময়েই মতিরামের দলের একজন ভগ্নদূতের মতো এসে খবর দিলেন যে, তাঁরা চোরা-শিকারিদের গুলির শব্দ শুনেছেন। যা জানা গেল তাদের কাছে তা হচ্ছে এই যে, গুলির শব্দ শুনেই মতিরাম আর অন্য তিন-জন কোথা থেকে গুলিটা হল তার হদিস করার চেষ্টা করতে-করতে এগিয়েও ছিলেন। গাছের মাথায় চড়ে ওঁরা দেখতে পেলেন যে, এক জায়গায় কতগুলো গো-বক উড়ছে। যেখানে পাখি উড়ছে, তার কাছাকাছিই গুলিটা হয়েছে এমন অনুমান করেই ওঁরা ওইদিকে এগিয়েও যান। চার কি. মি. মতো পথ হবে সে জায়গাটা ওঁদের ক্যাম্প থেকে। মতিরামের দলের চারজনের মধ্যে মতিরামের কাছে একটা একনলা সিঙ্গল ব্যারেল বারো-বোরের শট্‌গান, অন্য একজনের হাতে একটি থ্রি-ফিফ্‌টিন রাইফেল। এই ফায়ারিং-পাওয়ার নিয়ে জায়গাটার কাছাকছি মতিরামেরা পৌঁছতেই চোরা-শিকারিরা দূর থেকেই দেখতে পেয়ে গুলি চালায় ওঁদের দিকে। যদিও সে-গুলি ওঁদের কারও গায়েই লাগেনি তবু মতিরামেরা পালটা গুলি না-ছুঁড়ে উত্তেজিত হয়ে রেঞ্জ-অফিসে এলেন রিপোর্ট করতে। গুনিন শইকিয়া আর স্বপন শীল শর্মা যখন সেই গেন্দা-গুলি-করা চোরা-শিকারিকে জেরা করে তার কাছ থেকে খবর বার করার চেষ্টা করছিলেন, সেই সময়েই ভগ্নদূতের মতো এই খবর নিয়ে এসে হাজির হলেন মতিরামরা। খবর শুনেই রেঞ্জ-অফিসে হইচই পড়ে গেল। তক্ষুনি আট-আটজনের দুটি দল তৈরি করে দু দলকে এক-এক করে পাঠিয়ে দেওয়া হল জিপে। দু-দলকে সবসুদ্ধ আটটি আগ্নেয়াস্ত্র দেওয়া হল, চারটি-চারটি করে। আটটির মধ্যে ছ-টি থ্রি-ফিফটিন রাইফেল এবং দুটি শট্‌গান। প্রথম দলটিকে পাঠানো হল লাউডুবির দিকে, অন্যদের পেলিকান কাঠোনির দিকে। দু-দলকেই ওয়াকি-টকিও দিয়ে দেওয়া হল, যাতে রেঞ্জ-অফিসের সঙ্গে প্রয়োজন হলেই তারা কথা বলতে পারে। কী

www.BanglaBook.org

হল বা না-হল, জানাতে পারে। জিপ রেঞ্জারসাহেবের একটাই ছিল। সেই জিপটাই দু-ট্রিপে ওই ষোলোজনকে ওই দু-জায়গায় পৌঁছে দিয়ে ওখানেই রয়ে গেল।

যে-এলাকাতে গুলি হয়েছিল এবং গো-বকদের উড়তে দেখেছিল, পেলিকান কাঠোনির কাছের সেই পুরো ঘাসী এলাকাটাতেই আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকেই কিছুদিন আগে। যেমন প্রত্যেক বছরই গরমের শুরুতে দেওয়া হয়। বড় গাছেদের অবশ্য কোনও ক্ষতি হয় না তাতে।

ওই দুটি দল লাউডুবি আর পেলিকান কাঠোনির কাছে পৌঁছে আলাদা হয়ে গিয়ে ওই পোড়া ঘাসের বনের মধ্যে দিয়ে এক সাঁড়াশি-অভিযান শুরু করল পেলিকান কাঠোনির দিকে। ষোলোজন গার্ড এবং দশটি আগ্নেয়াস্ত্র, জিপ এবং ওয়াকি-টকি, সেই তখনও-অদৃশ্য এবং সম্ভবত একজনমাত্র চোরা-শিকারির মোকাবিলার পক্ষে যথেষ্টই ছিল। জিপের শেষ ট্রিপ চলে গেলে, রেঞ্জার শইকিয়াসায়েব একটি সিগারেট ধরিয়ে আবারও মোট্‌কা গোগোইকে নিয়ে পড়লেন। যে-চোরা-শিকারি ক-দিন আগে একটি গেন্দাকে গুলি করেছিল, তার নামই মোটকা গোগোই। তবে লোকটি সত্যিই মোট্‌কা ছিল কি না আমার জানা নেই। অনেক শুটকো লোকের নামও মোট্‌কা হয় দেখেছি।

জেরা যখন জোরকদমে এগোচ্ছে, ঠিক তখনই ওয়ারলেস সেটে কোড-ওয়ার্ড ক্যাঁ-ক্যাঁ করে উঠল : রাইনো! রাইনো!

প্রথম দলটি, যাদের পেলিকান কাঠোনিতে পাঠানো হয়েছিল; তাদের মধ্যে একজন উত্তেজিত গলায় খবর দিল যে, ওরা চোরা-শিকারিদের সঠিক অবস্থান জানতে পেরেছে। শিকারি একজন নয়, চারজন। ব্যাপার ডেঞ্জারাস। তবে জবর খবর হচ্ছে এই যে, চোরা-শিকারিদের মধ্যে তিনজনকে ওরা মেরেও ফেলেছে। চতুর্থজন একটা বড় বটগাছে উঠে লুকিয়ে আছে পাতার আড়ালে। তাকেই এখন কবজা করার চেষ্টা চলছে কিন্তু বিপদ হয়েছে এইই যে, গুলি সব ফুরিয়ে গেছে ওদের। গুলির দরকার আরও। এক্ষুনি।

রেঞ্জার গুনিন শইকিয়া এই খবরে স্বভাবতই খুশি এবং উত্তেজিতও হলেন। কিন্তু নাম গুনিন হলেও হাত গুনতে তো আর জানেন না তিনি! অতগুলো গুলি দিয়ে কী যুদ্ধ করলেন ওঁরা, তা ওঁরাই জানেন। প্রত্যেককে পাঁচ রাউন্ড করে গুলি দেওয়া হয়। সবই ফুরিয়ে ফেললেন গার্ডরা তিনজন ডাকাত মারতে? তা ছাড়া গুলি এখন পাঠানোই বা কী করে? একটিমাত্র জিপ, সেটি তো আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এও ঠিক যে, তক্ষুনিই কিছু করা দরকার। শইকিয়াসাহেব তাড়াঘড়ি পর্যটন বিভাগের একটি জিপ বন্দোবস্ত করে, সঙ্গে যথেষ্ট গুলি এবং স্বপন শীল শর্মা-সাহেবকে নিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই অকুস্থলে গিয়ে পৌঁছলেন খালি হাতেই। মানে শুধুই গুলি নিয়ে। আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না কোনওই।

www.BanglaBook.org

ভাগ্যিস সেই রাস্তাটা সে বছরই বানানো হয়েছিল। নইলে অত কম সময়ে পৌঁছনো যেত না আদৌ! তবে ঠিক পৌঁছোনওনি তখনও, তাঁরা যখন পেলিকান কাঠোনি থেকে তিনশো মিটার দূরে আছেন; তখনই একজন গার্ড পড়ি-কি-মরি করে দৌড়ে আসতে আসতে হাত তুলে চ্যাচাচ্ছিলেন, 'পলাউক্ পলাউক্!' মানে, 'পালিয়ে যান, পালিয়ে যান।' সেই গার্ড নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েই গুনিনসাহেবদের সংপরামর্শ দিতে-দিতে দৌড়ে আসছিলেন। সেই সময়ে বটগাছের ঝুপড়ি ডালপালার প্রায়ান্ধকার থেকে যে-কোনও সময়ে গুলি এসে ধরাশায়ী করতে পারত তাঁকে।

সেই "পলাউক, পলাউক" চিৎকারে রেঞ্জারের দল দাঁড়িয়ে পড়েন। কাছে এসে সেই গার্ড যে সংবাদ দিলেন তা শুনে তো চোখ কপালে উঠল শইকিয়া-সাহেবদের। আসল ঘটনার সঙ্গে প্রথম ওয়ারলেস্ মেসেজের কিছুমাত্র মিলই ছিল না।

আসল ঘটনা যা ঘটেছিল, তা হল একেবারেই অন্যরকম: মতিরাম এবং অন্যান্য গার্ডরা জিপে করে রেঞ্জ-অফিস থেকে ফিরে গিয়ে শিকারিদের খুঁজতে-খুঁজতে বড় বটগাছটার ঠিক নীচে এসে পৌঁছোন। অনেকদূর হেঁটে আসায় ক্লান্ত হয়ে মতিরাম পকেট থেকে একটি সিগারেট বার করেন। সিগারেটে দেশলাই জ্বেলে যখন আগুন ধরাতে যাবেন ঠিক তখনই চোখ উপরের দিকে তুলতেই উনি দেখতে পান, বটগাছের উপরে একজন নাগা-শিকারি রাইফেল হাতে বসে আছে।

মতিরামের সঙ্গে শিকারির চোখাচোখি হওয়া মাত্রই মতিরাম চিৎকার করে উঠে সঙ্গীদের জানান। কিন্তু মতিরাম তাঁর বন্দুকে হাত ছোঁয়াবার আগেই সেই নাগা-শিকারি মতিরামকে গুলি করে। গুলি করতেই উনি মাটিতে পড়ে যান। সঙ্গীরা তখন গাছটিকে লক্ষ করে এবং ওই শিকারিকে লক্ষ করেও গুলি ছুঁড়তে থাকে। গাছের একাধিক জায়গা থেকেও যখন গুলি আসতে থাকে তখন বোঝা যায় যে, শিকারি একজন নয়।

সবসুদ্ধু আঠারো-উনিশটি গুলি ছোঁড়েন ওঁরা এবং মতিরাম অ্যান্ড কোম্পানির গুলি খেয়ে গাছে লুকানো দলের তিনজন শিকারিই গুলিবিদ্ধ হয়ে নীচে পড়ে যায়। মতিরামদের দলের আটজনের মধ্যে চারজনই নিরস্ত্র ছিলেন। নিরস্ত্রদেরই একজনের হাতে ছিল ওয়াকিটকি। গুলির বহর দেখে ওই নিরস্ত্র চারজনই পিঠটান দেন। নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে গিয়ে রেঞ্জ-অফিসে খবর দেন যে, তিনজন শিকারি গাছ থেকে পাকা আমের মতো গুলিতে খসে নীচে পড়েছে। কিন্তু তাঁদের মতিরাম বড়ুয়াও যে গুলি খেয়ে সবচেয়ে আগেই পড়ে গেছেন তা উনি জানতেনও না পর্যন্ত। যা জানতেন, সেইরকমই মেসেজ পাঠিয়েছিলেন রেঞ্জ-অফিসে।

গুলিতে পেলিকান কাঠোনির চারপাশের অনেক গাছই চিরে গিয়েছিল। সশস্ত্র গার্ডরা সকলেই যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। ওয়াকিটকি যাঁর হাতে ছিল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাকে সঠিক খবরটা দিতে পারেননি। হয়তো ব্যাপার বেগতিক দেখে গার্ডেরও সঠিক খবরটা যে কী জানার কোনও তাগিদ ছিল না।

পালাউক, পলাউক শুনে শইকিয়াসাহেবরা পালিয়েছেন কিনা জানা নেই, তবে শইকিয়াসাহেবের কাছে যতটুকু শোনা গেল, তাতে এইই জানা গেল যে, পলাউক শুনেই দাঁড়িয়ে পড়ে ওঁরা ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করেন। ব্যাপার বেগতিক দেখেই ওঁরা সঙ্গে-সঙ্গে জোরে জিপ চালিয়ে ফিরে যান কাজিরাঙ্গা পুলিশ স্টেশন। সেখান থেকে এক ব্যাটালিয়ন আর্মড-পুলিশ এবং পুলিশের গাড়ি নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আবারও পেলিকান কাঠোনিতে ফিরে আসেন। সেখানে পৌঁছে বটগাছের এক ফার্লং দূরে থেকেই তাঁরা হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে থাকেন ওইদিকে। এবং পুলিশের ব্যাটালিয়ন বট-গাছটিকে ঘিরেও ফেলে। তবে মাত্র তিনদিক। অন্যদিকে এলিফ্যান্ট-গ্রাস ছিলই। সেদিকে ঘাস পোড়ানো হয়নি। তাই সেদিকটা অরক্ষিতই রয়ে গেছিল। শিকারিরা চাইলে ওদিক দিয়ে পালাতে পারত।

বটগাছের নীচে পৌঁছেই দেখা গেল মতিরাম বড়ুয়া বুকে ও পায়ে গুলি-লাগা অবস্থায় পড়ে আছেন। রক্তে ভেসে যাচ্ছে সমস্ত জায়গাটা। গাছের নীচে আরও অনেক জায়গাতেও রক্ত পাওয়া গেল, কিন্তু বেমালুম গুলি-হজম-করা সেই নাগা শিকারিদের কাউকেই দেখা গেল না। তারা আহত হয়ে গাছ থেকে পড়ে যাওয়া সত্ত্বেও। মতিরামকে সঙ্গে-সঙ্গেই জিপে করে হাসপাতালে পাঠানো হল। কিন্তু হাসপাতালের পথেই তাঁর প্রাণ বেরিয়ে যায়। বেচারি! 'পানি, পানি! বাঁচাও, বাঁচাও' করে অনেক চেঁচিয়ে-ছিলেন, তাঁর পালিয়ে যাওয়া নিরস্ত্র সঙ্গীরা তাঁর আর্ত চিৎকারকেই আহত নাগা-শিকারিদের আর্ত চিৎকার বলে ভুল করেছিলেন। উত্তেজিত অবস্থাতে এরকম অনেক ভুলই হয়।

মতিরামকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েই রক্তের দাগ-দেখে এগোলেন ওঁরা সকলে, রাইফেল, বন্দুক রেডি পরিশানে ধরে। কিছুদূর এগোতেই, আহত জানোয়ারের রক্তের দাগ যেমন পাওয়া যায় ঘাসে, ঝোপঝাড়ে; তেমনই আলা। আলাদা তিনটি ব্লাড-ট্রেইল পাওয়া গেল। অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করেও নাকি আহত শিকারিদের টিকিও মিলল না। তখন এলিফ্যান্ট-গ্রাসের বনের মধ্যে যেদিকটাতে ঘাস তখনও ছিল, সেদিকটাতেও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। ওই ঘাসবনে আগুন ধরে যেতেই একজন লুকিয়ে-থাকা আহত, রক্তাক্ত শিকারি আগুনের হাত থেকে বাঁচার জন্যে কোনওরকমে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে বেরিয়ে আসতেই পুলিশের হাতে পড়ল। তাকে জেরা করে জানা গেল যে, গুলি তিনজন চোরা-শিকারির গায়েই লেগেছিল এবং তারা তিনজনই আহত হয়েছে। তবে নেতা যে চতুর্থজন, তার কিছুই হয়নি এবং সে পালিয়েও গেছে। বিপদে, সঙ্গীদের ফাঁসিয়ে দিয়ে নিজে প্রাণ নিয়ে পালাতে না জানলে নেতা হওয়া যায় না বোধহয় আজকাল।

তবুও অন্যদের ধরার জন্যে সূর্যাস্ত অবধি তন্নতন্ন করে খোঁজাখুঁজি

www.BanglaBook.org

করেও কাউকেই পাওয়া গেল না। পরদিন সকালে আবারও নতুন করে খোঁজ আরম্ভ হল। কিন্তু লাভ হল না কিছু। তখন স্বাভাবিক ভাবেই ধরে নেওয়া হল যে, শিকারিদের আঘাত নিশ্চয়ই তেমন গুরুতর নয়। তাই তারা পালিয়েই গেছে।

দুর্ঘটনার চতুর্থ দিনে মিস্টার পি. সি. দাস, চিফ্-কনজারভেটর, ওয়াইল্ডলাইফ (এখন তিনি আসামের চিফ্-কনজারভেটর জেনারেল) নিজেই এলেন সরেজমিনে তদন্ত করতে। কাজিরাঙ্গা ন্যাশনাল পার্কের ডিরেক্টর মি. পরমা লাহোনও আসেন। মি. লাহোন কিন্তু ঘটনার দিনেই তাঁর নিজের ওয়ারলেসসেটে রেঞ্জ-অফিস আর মতিরামের দলের মধ্যে ওয়াকি-টকিতে যে-কথা হয়, তা মনিটর করামাত্রই নিজের রাইফেল নিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে একাই ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছিলেন। খুবই প্রশংসনীয় কাজ বলতে হবে।

দ্বিতীয় এবং চতুর্থ দিনে আটটি হাতি দিয়ে ঘাসবন আঁতিপাতি করে খোঁজা হয়। মি. দাস যেদিন ছিলেন, মানে চতুর্থ দিনে, ওই এলিফ্যান্ট-গ্রাসের বনের মধ্যে থেকেই একটি পচা, ফোলা, গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ খুঁজে পান ওঁরা।

শিকারিদের চারজনের মধ্যে প্রথমজন গুলিতে আহত অবস্থায় ধরা পড়েছিল প্রথম দিনেই। দ্বিতীয়জনের গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ ফোলা শক্ত অবস্থায় পাওয়া গেল চতুর্থ দিনে। নেতা পালিয়ে গিয়েছিল অক্ষত অবস্থায়। এবং অন্যজনের যে কি হল, সেটাই রহস্য। সেও কি পালিয়েই গিয়েছিল? এতভাবে খুঁজেও দ্বিতীয়জনের মৃতদেহটি প্রথম এবং দ্বিতীয় দিনে পাওয়া গেল না কেন? যদি প্রথম দিনই ঘাসের মধ্যে তিনজন মানুষের ব্লাড-ট্রেইল পাওয়া গিয়ে থাকে, তা হলে তো অনুমান করতে হয় যে, নেতা ছাড়া যে পালিয়ে গেল, সেও আহতই ছিল। আহত অবস্থায় সে পালাল কী করে? নদী দিয়ে পালাল? না অন্যভাবে?

মতিরাম বড়ুয়ার মৃত্যুকে ঘিরে এই চারজন নাগা-শিকারির ব্যাপারটাতে একটু রহস্যের গন্ধ থেকেই যায়। অবশ্য দাসসাহেব এবং লাহোনসাহেব নিজেরা যখন এসেছিলেন এবং ব্যাপারটার তদারকি নিজেরাই করেছিলেন, তার উপর পুলিশের এক ব্যাটালিয়ন সশস্ত্র প্রহরীও যখন যুক্ত ছিলেন ওই খোঁজে; তখন রহস্য কোনও থাকার কথা নয়। তবু পুরো ঘটনাটাই গোয়েন্দা-কাহিনীরই মতো মনে হয়। তাইই রহস্যের গন্ধ নাকে লেগে থাকেই।

মতিরামের পরিবারকে বনবিভাগ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়া হয়। তা ছাড়া প্রত্যেক গার্ডের, যাঁরা চোরা-শিকারিদের মোকাবিলা করার দায়িত্ব নিয়ে নির্জনে ক্যাম্প করে থাকেন, তাঁদের জন্য কুড়ি হাজার টাকার জীবন-বীমার প্রিমিয়ামও নাকি বনবিভাগই দেন। সেই কুড়ি হাজারও পেয়েছিলেন মতিরামের পরিবার।

এই ঘটনার কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জেনে আমার মনে হয়েছে যে, ভারতের সমস্ত অভয়ারণ্যেই, যেখানেই চোরা-শিকারিদের পা পড়ে;

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেখানকার ফরেস্ট-গার্ডদের রাইফেল চালনা এবং প্যারা-মিলিটারি না হলেও অন্তত ফিল্ড-ট্রেকিংয়ের একটি করে কোর্স বাধ্যতামূলকভাবেই করাবার ব্যবস্থা করা উচিত, তাঁদের চোরা-শিকারিদের ধরতে পাঠানোর আগে। নইলে আরও অনেক মতিরামরা মারা যাবেন। হাতে রাইফেল থাকলেই সকলেই যে অভিজ্ঞ, প্রতিপক্ষর মোকাবিলা করতে পারবেন এমন নয়। শটগানও তাঁদের একেবারেই দেওয়া উচিত নয়। কারণ, এদেশের চোরা-শিকারিরা যেমন শয়তান, এদেশের ফরেস্ট-গার্ডরাও সকলেই আবার ভগবানও তো নন! দুর্বলতা মানুষের স্বভাবের অঙ্গ। শটগান দিয়ে আধুনিক চোরা-শিকারিদের মোকাবিলা করাও যায় না। এই নাগা-শিকারিরা থ্রি-ও-থ্রি প্রহিবিটেড বোরের রাইফেল এমনকি সেল্ফ-লোডিং রাইফেলও (এস. এল. আর) যে ব্যবহার করেছিল, তার প্রমাণ নাকি পাওয়া গিয়েছিল।

কাজিরাঙ্গায় আই. টি. ডি. সি-র লজ আসাম সরকার পয়লা এপ্রিল থেকে নিয়ে নিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারের হাত থেকে। যেমন নিয়ে নিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের কান্হামুক্তির সাফারি লজ কেন্দ্রীয় সরকারের হেফাজত থেকে ইতিমধ্যেই মধ্যপ্রদেশ সরকার। বিহারের পালামৌয়ের বেত্লাতেও একটি লজ বানাচ্ছেন আই. টি. ডি. সি.। সেটির কাজ প্রায় শেষও হয়ে এসেছে। সেটিও হয়তো পরে বিহার সরকারই নিয়ে নেবেন। আসলে আই. টি. ডি. সি. নিজেই এই সব লজ ছেড়ে দিচ্ছেন মুনাফা হয় না বলে। আসামেরই মানাস টাইগার প্রোজেক্টের কোর-এরিয়াতে ঢোকবার মুখেই যে রেঞ্জ-অফিস, সেখানেও আই. টি. ডি. সি. নাকি একটি ফরেস্ট লজ বানাবেন কিছুদিনের মধ্যেই। আই. টি. ডি. সি-র প্রত্যেকটি লজই খুব সুন্দর। তবে গ্যাবিজর সামর্থ্যর মধ্যে এগুলো থাকলে আরও ভাল হত। অত পয়সা দিয়ে সকলে তো থাকতে পারেন না। আরও একটা কথা, কাজিরাঙ্গার লজ সম্বন্ধে বলা দরকার। ওই লজটি এবং আসাম সরকারের লজটিও একেবারে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীদের বাড়িঘর, কোয়ার্টারের মধ্যেই করা হয়েছে। জঙ্গলের মধ্যে যে আছি তা একেবারে মনেই হয় না। মনে হয়, যেন কোনও মফস্বল শহরেরই মধ্যে আছি। বেত্লা এবং মানাসের প্রস্তাবিত লজগুলিও যথেষ্ট নির্জন জায়গাতে হবে না। লজের চারপাশে জঙ্গলের পরিবেশও নেই। জঙ্গলের গভীরে তো নয়ই। অবশ্য বনবিভাগের আপত্তিতেই ট্যুরিজম্

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডিপার্টমেন্ট বনের গভীরে লজ বানাতে পারেন না।

মধ্যপ্রদেশের কানহার লজটি অবশ্য ঠিক বানজার নদীর উপরেই। চমৎকার স্থাপত্যও তার। নদীর ওপারেই গভীর জঙ্গল। ফরেস্ট লজ এত খরচ করে বানালে তার চারপাশে অরণ্যের পরিবেশ যাতে থাকে, তা দেখা দরকার। আদতে না থাকলেও তা সহজেই গড়ে নেওয়া যেতে পারে। এটুকু ভাবনাও যে কেন ভাবেন না পর্যটন দপ্তর তা বোঝা দায়।

পূর্ব-আফ্রিকার সেরোনারা ফরেস্ট লজ, সেরেঙ্গেটি ন্যাশনাল পার্কের মধ্যে এমনভাবেই তৈরি। রাতে কারও বাইরে বেরোনোই মানা। বেরোনো অত্যন্ত বিপজ্জনকও। জানলার নীচেই সিংহ-সিংহী শুয়ে থাকে। দিনের বেলা ডাইনিং-রুম থেকে দেখা যায়, উটপাখি প্রায় জানালার কাছেই এসে কোনও বনবিলাসী তারই ডিম দিয়ে বানানো ওমলেট দিয়ে ব্রেকফাস্ট করছে কি করছে না, তাইই যেন উঁকি মেরে সরেজমিনে তদন্ত করে যায়। বহু মানুষ, বনবিভাগের, কাজ করেন সেরেঙ্গেটিতে। সেরোনারা লজের কর্মীর সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু তাঁদের বাসস্থান লজ থেকে এক কি.মি মতো দূরে। লজের জেনারেটরও সেখানেই। লজ থেকে বহু দূরে। যেখানে শহর গড়ে তুলতে হয়েছে, জেনারেটরের আওয়াজটাকেও সেখানেই চালান করে দিয়েছেন ওঁরা। খেপে-খেপে লজের কর্মচারীদের কাচবন্ধ গাড়ি নেওয়া-আনা করে। তাঁদের বসতির শহর থেকে লজে, দিনের মধ্যে এবং রাত দশটা অবধি বহুবার। আমাদের দেশেও এমন হলে খুবই ভাল হত। আশা করি, আই. টি. ডি. সি. এবং বিভিন্ন রাজ্যের বনবিভাগের কর্তৃপক্ষরা এই নিয়ে ভাববেন একটু। তানজানিয়ার মতো একটি অনুন্নত দেশ যদি এইসব দিকে নজর দিতে পারেন, তা হলে ভারতের মতো এত বড় দেশই বা পারবে না কেন?

জঙ্গল থেকে ফিরে চানটান করে লজের ঘরের বারান্দাতেই বসেছিলাম। আলো নিবিয়ে।

মতিরাম বড়ুয়ার মৃত্যুর কথাটা ভেবে মনটা খারাপ লাগছিল। এক বছর হয়ে গেছে ছিয়াশির মার্চের শেষে।

ক-দিন বাদেই পূর্ণিমা। আমার ঘরের পাশেই একটি শিশুগাছ। চাঁদের আলোয় চকচক করছে তার পাতা। বুড়হা পাহাড়ের দিক থেকে মাদলে চাঁটি মারার আওয়াজ ভেসে আসছে। সঙ্গে কার্বি ভাষার গান। কে জানে, ওইদিকে মিকিরদের কোনও বস্তি আছে কি নেই। মার্চের চাঁদের রাতের বন বা পাহাড়ের মধ্যে তীক্ষ্ণ চোখে কিছুই খুঁজতে নেই। খুঁজতে গেলেও খুঁজে পাওয়া যায় না কিছুই। আকাশ, বন, পাহাড় নদী সব এককাকার হয়ে যায় তখন চাল-ধোওয়া জলের মতো ইঁদুরগন্ধি জ্যোৎস্নায়। সব সময় সবকিছুই স্পষ্ট এবং সম্পূর্ণ হলে বোধহয় ভাল লাগে না। এমন রাতের অস্পষ্টতা, অপূর্ণতা এই দুধলি আলোয় কার্বি-অ্যাংলঙ্গ পাহাড়ের পরবাসের লাজুক মিকিরদের বস্তির কোনও পথভোলা মানুষের মাদলের আওয়াজ আর কার্বি ভাষার গান এইসব মিলেমিশেই ভাল লাগাকে

www.BanglaBook.org

পরিপূর্ণ করে তুলতে হয় এমন চৈতি চাঁদের সম্মোহে।

যেমন এমন রাতে ; হয়তো তেমন জীবনেও।

তোমরা যখন বড় হবে তখন আমার এই অস্পষ্ট কথা হয়তো স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবে।

আজ তাড়াতাড়িই খেয়ে শুয়ে পড়তে হবে। কাজিরাঙ্গায় দু-রাত তিন-দিন থাকা হল। কাল একেবারে ভোরে উঠে রওনা হব। গৌহাটি। সেখান থেকে বড়পেটা রোড। সঞ্জয় দেবরায়, মানাস টাইগার প্রোজেক্টের ফিল্ড ডিরেক্টর ; এবং তাঁর শান্তিনিকেতনে-পড়া মিষ্টি স্ত্রী মধুশ্রী দেবরায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাব। নেমন্তন্ন জমা আছে অনেক দিনের। মানাসে আবারও যদি যাওয়া হয়, তা হলে পরে কখনও মানাসের 'জঙ্গলের জার্নাল'ও হয়তো তোমরা পড়তে পাবে। মানাসে এখন শিমুলের বনে-বনে সারা দুপুর ধরে বীজ-ফাটা তুলো ভেসে বেড়াচ্ছে নীল আকাশ, মানাস, হাকোয়া বেকি এবং ফুরা নদীর পটভূমিতে। তারপরে আলতো হয়ে বহুবর্ণ ঝরাপাতাদের উপরে এসে থিতু হচ্ছে মাটিতে। পরতের পর পরত। সুইজারল্যান্ডের পিঁও গিঁ বর্গের উপরে যেমন সেপ্টেম্বরে বরফ নামে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে। কানে শোনা যায় না, কিন্তু দু-চোখ ভরে যায়।

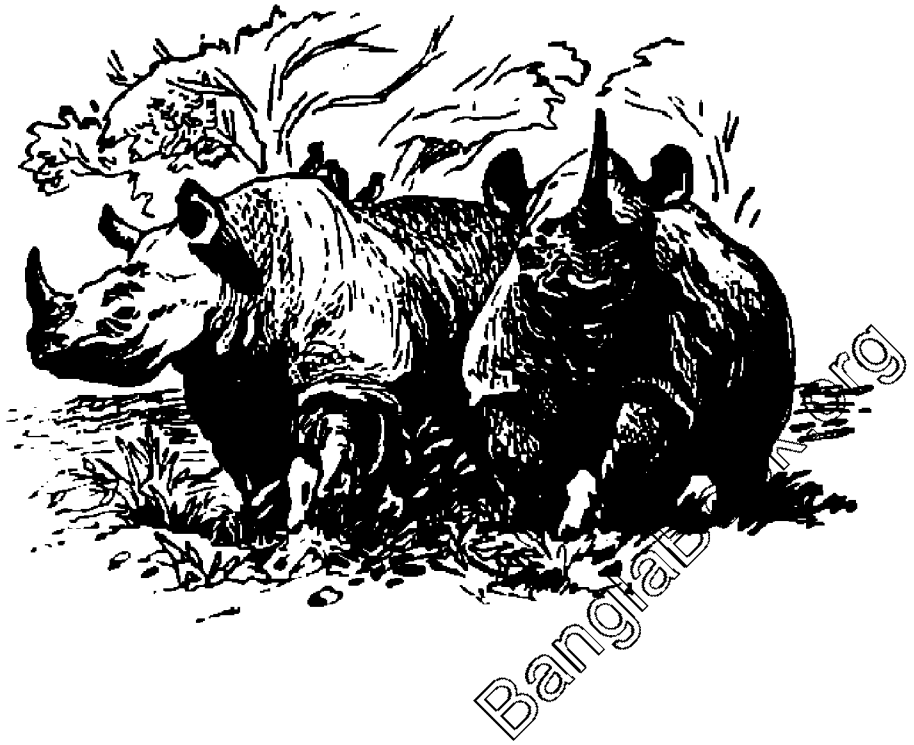

www.BanglaBook.org

কেঁড়, বাংলো পালামৌ, বিহার
৩০।৩।৮৫

তখনও কুয়াশার পাতলা আস্তরণ ছিল রাঁচী এয়ারস্ট্রিপ্-এ। সকাল ছটা পাঁচ-এ কোলকাতা ছেড়ে ছটা পঞ্চান্নতে নেমে গেল বোয়িং রাঁচীতে।

খুব বেশি লোক যে এখানে নামলেন, তা নয়। হপিং-ফ্লাইট। এখান থেকে পাটনা এবং লক্ষ্ণৌ হয়ে দিল্লি যাবে।

বুড়ো বাহাদুর আমাকে দেখেই সেলাম করল। অত সকালেও মুখে মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ। মহুয়া শুধু গাছেই ফলে না। তবে হয়তো গত রাতের মহুক্ই হবে।

সেলামটা আমার জন্যে নয়। মোহন বিশ্বাসের খাস ড্রাইভার কিষুণ নিতে এসেছে আমায় তাইই আমিও ভি. আই. পি. হয়ে গেলাম।

মোহনের নিবাস যদিও দূরের ডালটনগঞ্জে, তবু রাঁচীতেও প্রতিপত্তি তার খুব কম নয়। প্রতি সপ্তাহেই কোলকাতা যেতে হয় ওকে ব্যবসার কাজে একবার করে। তাইই এয়ারস্ট্রিপের সকলেই তার চেনা। খাতিরও করে সকলে।

বাহাদুর মাল তুলে দিল গাড়িতে। কিষুণ স্যুটকেসটা বুটে রেখে ব্রিফকেসটা পেছনের সিটের উপর রাখল। বাকেট্ সিট,—ফ্রন্ট সিট দুটির মাঝখানে কনসাল্ লাগানো। ফ্লোর—শিফ্ট গিয়ার। সিটের উপর সিল্কের চমৎকার কাভার লাগানো। এত বেশি পরিষ্কার, স্টিরিও এবং এয়ারকন্ডিশানার লাগানো গাড়ি যে, চড়তে একটু অস্বস্তিই হয়।

কিষুণ বলল, মেসিন কি চালিয়ে দেব হুজোর?

বললাম, শহর যতক্ষণ না পেরচ্ছ, ততক্ষণ চালাও। শহর পেরিয়ে গেলেই বন্ধ করে দিও। খোলা হাওয়ায় ভেসে চলে যাব। চৈত্র শেষের ভোরে ঝলক্ ঝলক্ মহুয়ার বাস ভাসবে এখন হাওয়াতে, পলাশে পলাশে লাল হয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থাকবে চারদিকের বন, পাহাড় ; টাঁড়। শিমুল দাঁড়িয়ে থাকবে বুক টান-টান করে, বুকের সব ক্ষতগুলি নিয়ে বোবা কিন্তু ভালো পুরুষের মতো। বনে আসার এইই তো সময় ! চৈত্র বনে, চাঁদের বনে, মনের বনে।

কিছুক্ষণ গাড়িটা স্টার্ট করতেই ভাল লাগতে লাগল ভীষণই।

পথে, রাঁচী মেইন রোডে 'রাজ হোটেল'। রাজ হোটেলের ম্যানেজার গোস্বামীবাবু আর আদিত্য মুখার্জি। তাঁদের সঙ্গে দেখা না করে গেলে ক্ষুণ্ণ হবেন। প্রকৃত অনুরাগী দুজনেই। আরও আছেন একজন অচিন্ত্য, যদিও হোটেলের সঙ্গে যুক্ত নয় ও।

হোটেলে নেমে চা এবং টা খেতে হল। ইতিমধ্যে কিছুক্ষণ জর্দা পান নিয়ে এস। মঘাই। ফেরার টিকিটের কথাও আদিত্যকে বলে দেওয়া গেল। ইচ্ছে ছিল সাতই এপ্রিল রওনা হয়ে ট্রেনে আটই কলকাতা পৌঁছব। ট্রেনে যাতায়াতের মতো আরাম নেই। সময় কম লাগলেও প্লেনে নানারকম টেনসান থাকেই। সেই মতোই টিকিট কাটার কথা বললাম।

ওঁরা বললেন, ফেরার দিন যেন তাড়াতাড়ি আসি রাঁচীতে। অনেক বাঙালি ভদ্রলোক আলাপ করতে চান, লেখা-টেখা নিয়ে আলাপ আলোচনাও। বিকেল চারটে নাগাদ এসে পৌঁছলেই ভাল হয়। হাতে সময় থাকবে যথেষ্ট ট্রেন-ধরার আগে।

বললাম, তাইই হবে।

ওঁদের ধন্যবাদ দিয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম।

রাঁচীর মেইন রোডে গাড়ি চালানো আজকাল প্রায় অসম্ভব। যদিও আমি নিজে চালাচ্ছিলাম না। বছর আট-দশ আগেও, যখন ম্যাকলাস্কিগঞ্জের বাড়িটা ছিল, অপর্ণা সেন নেননি ; তখনও প্রায় প্রতিমাসেই নিজেই কলকাতা থেকে গাড়ি চালিয়ে এসেছি গেছি এই পথ দিয়ে। তখনও ভিড় এইরকম দমবন্ধ ছিল না। অবশ্য আজকে ভোরে তেমন ভিড় নেই। কারণ, আজ রামনবমী। পুরো বিহারেই ছুটি। পাবলিক হলিডে।

দেখতে দেখতে ফিরায়ালালের চওক্ পেরিয়ে কাছারির পাশ দিয়ে এসে রাতু রোডে পড়লাম। বাস স্ট্যান্ড পেরিয়ে জোরে অ্যাকসিলারেটর দাবল কিছুণ।

এই রাঁচী শহরে প্রথম আসি উনিশশ ঊনপঞ্চাশে। আজ থেকে ছত্রিশ বছর আগে কিশোর বয়সে। কী সুন্দর ছিমছাম নির্জন জায়গা ছিল রাঁচী। উঁচু-নীচু পথ। টানা রিক্সা চালাত সাঁওতাল, ওরাও, সুন্দর সব সরল পবিত্র নিষ্পাপ মুখের সুগঠিত শরীরের সব মানুষেরা। পুষ্প-পুষ্পও। মুড়ি থেকে ছোট লাইনে ট্রেন আসত। গাড়িতে এলে, ছোটাপালু ঘাট হয়ে হাজারীবাগ থেকে আসা হত। পথে তখন প্রায়ই বাঘ বা চিতা দেখা যেত।

ছবির মতো সুন্দর ছিল রাঁচীর বি. এন. আর. হোটেলটি। তখন ছিল বেঙ্গল-নাগপুর-রেলওয়ে। এখন তো এস. ই. আর.। সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে। আমাদের মুখে এখনও বি. এন. আরই প্রথম আসে। সত্যি সত্যিই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্বাদে ব্যাস্বাদের, মন ভালো করার জায়গা ছিল। আজকের রাঁচীকে দেখে সেই রাঁচীর কথা ভাবা পর্যন্ত যায় না।

মানুষ অনেকই উন্নতি করেছে। তার বিজ্ঞান, তার প্রযুক্তি, তার অর্থলালসা, সবকিছু সৌন্দর্যকে বিসর্জন দিয়ে তার এই ভাল থাকা ভাল পরা টিভি ভিসিআর-এর সংস্কৃতি তাকে কোথায় যে নিয়ে চলেছে তার হিসাব সে নিজে যখন করতে বসবে তখন সত্যিই বড় দেরী হয়ে যাবে হয়তো। আজকের মানুষ রাডারলেস মানুষ। চলার তাগিদেই চলছে। কোথায় কোনদিকে যে চলেছে, তা এক মুহূর্ত ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখার সময়টুকুই তার নেই। এ বড় দুর্দৈবের সময়।

সময় আমারও নেই। আমিও এই সব মানুষেরই একজন। তবু, আমার মধ্যে এই সচেতনতাটুকুকে, অপরাধবোধকে আজ অবধি বড় কষ্ট করে হলেও বাঁচিয়ে রেখেছি। মাঝে মাঝেই তাই জঙ্গলে আসি। একেবারে একা। নিজের জীবনের গন্তব্য নিয়ে ভাবতে। এবং আদৌ কোনো গন্তব্য আছে কী নেই সে কথাও ভাবতে। পুরোনো দিনের নাবিকরা যেমন মাঝে মাঝে তাদের যাত্রাপথ ঠিক করে নিতে পাল সরিয়ে-নাড়িয়ে, ধ্রুবতারা বা কম্পাস দেখে; আমিও তেমন মূল গন্তব্য থেকে সরে-আসা বেয়ারিং কারেক্ট করতে আসি জঙ্গলে পাহাড়ে। তারই বড় ধিক্কার; মনের ভিতরে বড় ধাক্কা লাগে। কিছুই হল না। কিছুই করার মতো করা হল না এত বছরেও।

এদিকে বেলাশেষের ডাক মাঝে মাঝেই কানে আসে চৈত্রপবনের ঝরাপাতার ঝরঝরানিতে, চাঁদের বনে হঠাৎ পাতা খসার গা ছমছম শব্দে। বুঝি, এই সুন্দর পৃথিবীতে চিরদিন কারোই থাকার অধিকার নেই। ভাড়া বাড়ি এ। কেউ ভদ্রলোকের মতো বিনা ঝামেলায় তাড়াতাড়ি ছেড়ে যায়, কেউ বা বাড়িওয়ালার সঙ্গে হুজ্জোত-হাঙ্গাম করে কিছু বেশিদিন থাকে। কিন্তু ছেড়ে যখন যেতেই হবে তখন আর ঝামেলা করে লাভ কি? হাসিমুখেই যাওয়া ভাল। তবু, মন খারাপ লাগে বইকী। এই জীবনকে, প্রকৃতিকে, এই গভীর অসীম বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্যকে নিংড়ে নেওয়া হল না, অসংখ্য নারীর শরীর ও মন এখনও না পাওয়া রয়ে গেল, দেওয়া হল না আমাকেও, যারা আমায় চেয়েছিল; বাঁচা হল না যেমন করে একজন মানুষের বাঁচা উচিত এক জীবনে। এই ভুবনে।

ভাবলেই কষ্ট হয়।

কী এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। তারপরই আবার ভাল লাগে। বেশ তো। "এই তো ভাল লেগেছিল, আলোর নাচন পাতায় পাতায় এই তো!" অনেক দুঃখের সঙ্গে আনন্দ তো অনেকই ছিল! আছেও। পেয়েছিই বা কম কী! কৃতজ্ঞতায় তাতেও তো নুয়ে আসে মন। বেশ আছি। বেশ আছি। বেশ যাব।

ডানদিকে রাতু রাজার বাড়ি। বাঁয়ে সেই মস্ত তালাও। চৈত্র-শেষের সকালে কটি জলপিপি আর ডুবডুবা হঠাৎ এদিক ওদিক জল-ছড়া দিয়ে এই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শান্ত সকালের নির্লিপ্তিকে চমকে ছিঁড়ে দিচ্ছে। রাস্তা, সামনে সোজা চলে গেছে মান্দার হয়ে বিজুপাড়া। তারপর সঁস। মস্ত হাট বসে এখানে। তারও পর কুরু। কুরু থেকে ডানদিকে চান্দোয়ার ঘাট পেরিয়ে চান্দোয়া-টোড়ি এগারো মাইল। সেখান থেকে বাঁয়ে মোড় নিয়ে লাতেহার হয়ে ডালটনগঞ্জ।

কিন্তু ডালটনগঞ্জে যাবো না। তার সাত আট মাইল আগেই বেতলা ন্যাশনাল পার্কের পথে ঢুকে যাব বাঁ দিকে। তারপর কেচকীর কাছের ঔরঙ্গার ব্রিজ পেরিয়ে কুটমুর মোড়ে মোড়ে এসে, বারোয়াড়ির রাস্তাকে সোজা চলে যেতে দিয়ে বাঁয়ে মোড় নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে উড়ে যেতে দিয়ে আমরা যাব বেতলা।

কিষুণকে বললাম, এবার এয়ার কন্ডিশনার বন্ধ করে কাচ নামাও। আকাশেও মেঘ মেঘ। কোথাও আঁধি উঠেছিল কাল রাতে। ঠান্ডা হাওয়া বইছে একটা। ঝরা পাতার গন্ধ। এখনও তেমন জঙ্গলের জায়গায় এসে পৌঁছয়নি পথ, তবুও ঝলক্ ঝলক্ গন্ধ আসছে মহুয়ার। বড়ই নস্টালজিক্ করে তোলে আমাকে এই মহুয়ার গন্ধ। ছেলেবেলা থেকে কত বছরের স্মৃতি। মা, বাবা, বাবার নানা শিকারি বন্ধুবান্ধব, আমার নিজের শিকারের আর জঙ্গলের বন্ধুবান্ধব। এক-একটা চৈত-বোশেখ মাস এক-একরকম আনন্দের পসরা নিয়ে হঠাৎ হঠাৎ মস্তিষ্কের কোষে কোষে, রন্ধ্রে রন্ধ্রে এসে উপস্থিত হয়। মস্তিষ্কের মধ্যে আলোড়ন তোলে। হাসি শুনতে পাই মৃত মানুষের। একদৃষ্টে স্মিত চোখে আমার চোখের দিকে চেয়ে থাকা কত নারী ও পুরুষের চোখ; দামাল হাওয়ায় উৎসারিত হওয়া ঝরা পাতারই মতো মস্তিষ্কের মধ্যে স্মৃতি শীৎকার দিয়ে ঘূর্ণি তোলে। তখন মনে হয়, মনে পড়ে যায়, কত কী ছিল এই জীবনে! এক জীবনে। এবং এখনও কত কী আছে। অভাব কিসের?

চেনাজানা মৃত মানুষেরা নতুন ধুতি শাড়ি পরে সারে সারে শালবনের নিচে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকে, বলে, সময় হলে চলে এসো। ইলেকট্রিক্ ফার্নেসের সামনে শোয়ানো, গরদের শাড়ি পরা-আমার মায়ের রানীর মতো সুন্দর কিন্তু ঠান্ডা শরীর। সেই শরীরের শৈত্য মেরুদন্ডে শিরশিরানি তোলে। মা যেন না বলেই বলেন, সময়কে পেরিয়ে যেতে চাস না জীবনে কখনও। সময় নিজে চাইলেই তবেই সময় সুসময়। সময়কে অতিক্রম যদি করে যেতে চাস তাহলে সময়ই প্রথমে অসময় এবং পরে দুঃসময় করে দেয় নিজেকে। সময় নিয়ে চালাকি করিস না। তাড়াহুড়োও নয়। সময় মতো বাঁচিস সময় মতো আসিস। আমরা তো আছিই তোর অপেক্ষায়।

এখন তো বেশ আছি। বেশ বাঁচছি।

কে জানে? সত্যিই বেশ থাকে কী মানুষ! এই চেনাজানার জগৎটা, ভাড়া বাড়িটাতেই যে মন লেগে গেছে। নতুন বাড়ি, সে যতই ভাল হোক না কেন, মন সরে না যেতে। ভয় করে। দুয়ারটুকু পার হতে সত্যিই বড়

www.BanglaBook.org

সংশয়। 'জয় অজানার জয়' বলা সহজ। কিন্তু মন দ্বিধা ও আশঙ্কায় ভরেই থাকে।

জানি না কেন, ইদানিং কেবলই মৃত্যুর কথা মনে হয়। বিশেষ করে জঙ্গলে এলেই। জঙ্গলেই যেন মরি। রোগে ভুগে নয়, হঠাৎ। কোনো দুর্ঘটনায়। মৃত্যু সব সময় অপ্রত্যাশিত, তাৎক্ষণিক হওয়াই কাম্য। মৃত্যুর জন্যে সেজেগুজে অপেক্ষা করা আমার পোষাবে না। তাছাড়া তাতে চরিত্র-হানিরও সম্ভাবনা আছে। যার উপর মৃত্যু শমন জারী করে তার মনে আরও আয়ুর জন্যে কাঙালপনাও জাগাটা স্বাভাবিক। তবে গর্ভাধানের পর থেকে জন্মর মধ্যে যেমন এক নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধান থাকে, মৃত্যুর শমন জারী হওয়ার পর থেকে মৃত্যুর মধ্যেও তেমনই এক নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধান থাকেই। কিন্তু সেই ব্যবধানটুকু যে কতখানি তা আমাদের অজানা। জীবনে কারো কাছেই ভিক্ষা চাইনি কিছু। তাই ভাবি, মরণেও যেন না চাইতে হয়। এমনি মাথা উঁচু করে, দম্ভ ভরে, হা-হা হাসি হাসতে হাসতেই যেন একদিন হঠাৎ নিভে যাই।

এইই প্রার্থনা।

কিষুণ বলল, বিজুপাড়ায় এলাম।

একবার তাকালাম। ডানদিকে পথ চলে গেছে ম্যাকলাস্কিগঞ্জে, খিলারির সিমেন্ট কারখানাতে।

মুখটা ঘুরিয়ে নিলাম। অপর্ণা বলেছিল যে, বাড়িটা লালাদা আপনারই রইল। যতবার খুশি আসবেন।

ভাবছিলাম যে আমিও সে কথা বলেছিলাম কারাল সাহেবের মেয়েকে, যার কাছ থেকে আমি বাড়িটা কিনেছিলাম। ওরা অস্ট্রেলিয়ায় চলে গেল যখন। বাড়ির দর-দাম ঠিক করার সময় আমার মা বলেছিলেন, "ডিস্ট্রেস সেল" করছে বাড়ি; মানুষকে ঠকাবি না। যা দাম চায়, তার চেয়ে বেশি দিবি। দিয়েছিলাম। ওরা যেদিন চাবি দিল আমার হাতে, সেদিন কেঁদেছিল। বলেছিল 'থ্যাঙ্ক উ্য ভেরী মাচ। উ্য আর সো কাইন্ড। আমরা দেশে যদি একবারও আসি তবে এসে সত্যিই কদিন থাকব কিন্তু এখানে।' ওরাও জানত আমিও জানতাম যে, ওরা আর কখনও আসবে না ম্যাকলাস্কিগঞ্জে। অপর্ণা যখন বলেছিল আমাকে তখনও ও জানত এবং আমিও জানতাম যে, ম্যাকলাস্কিগঞ্জে হয়তো আসতেও পারি কিন্তু আমিও কখনও আসব না আর ঐ বাড়িতে।

আসা যায় না। যা আমার একান্ত ছিল, তা অন্যের হয়ে গেলে সেই সম্পত্তি অথবা মানুষেরও উপর একধরনের অভিমানমিশ্রিত ঘৃণা জন্মায়। যা ফেলে আসা যায়, তার প্রতি হৃদয়ের টান রাখা উচিতও নয় হয়তো। 'একটু উষ্ণতার জন্যে' উপন্যাসে আমার ম্যাকলাস্কিগঞ্জ থেকে গেছে চিরদিনের মতো। কেউই তাকে আর আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। হয়তো থেকে যাবে 'একটু উষ্ণতার জন্যের' অসংখ্য পাঠক-পাঠিকার মনেও।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এইটুকুই সান্ত্বনা। সেই দূরের, শান্তির, সৌন্দর্যের ম্যাকলাস্কিগঞ্জ আমারই থেকে যাবে চিরদিনের মতো।

বাবা বলতেন, "নেভার লুক ব্যাক ইন্ লাইফ।"

আই ডোন্ট।

যে পথ মাড়িয়ে এসেছি সে পথে তাকাইনি আর কোনোদিনও। রাগেও নয়, দুঃখেও নয়; অভিমানে তো নয়ই। যা গেছে তা গেছে। দিনের আলোর গভীরে তারারা থাকে হয়তো, কিন্তু সে থাকা না থাকা সমান। কবির কবিতাতে যা সম্ভব, জীবনে তা প্রায়শই নয়।

আমার বাড়ি বিক্রি করে দিলেও কিছুদিন পর আমার ভায়রা একটি বাড়ি কিনেছে ম্যাকলাস্কিতে। দুবার এসেছিলাম। ওরা খুশি হবে বলে।

মোহনের খাস ড্রাইভার কিষুণ চমৎকার গাড়ি চালায়। ওর চালানো গাড়ি এবং জিপে গত তিরিশ বছর হল চড়ছি। ও গাড়ি চালালে দিনে রাতে সবসময়ই নিশ্চিন্ত।

কুরুতে এসে যখন চাঁদোয়ার দিকে মোড় নিল গাড়ি ডাইনে, তখন বেলা সাড়ে নটা। বললাম, ঘাটে উঠে একবার আমঝারীয়াতে দাঁড়িও কিষুণ এক-মিনিট: জল খাব এবং বাথরুমে যাব একবার।

আমঝারীয়াতে প্রতিবারই এসেই বড় কষ্ট হয়। পথটা খুবই সুন্দর। জ্যাকারান্ডা গাছগুলো ফিকে বেগুনী ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে। মনে হচ্ছে যেন হাল্কা বেগুনী রঙা ঘনঘোর স্তনভারে ন্যুব্জ একদল তন্বী সাঁওতাল মেয়ে একে অন্যর কোমর জড়িয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে এখুনি নাচ শুরু করবে বলে। নাচের চেয়েও নাচ শুরু করার আগের মুহূর্তটিকে অনেক বেশি সম্ভাবনাময় ও সুন্দর বলে মনে হয় তো।

আমঝারীয়ার বাংলোর মতো চওড়া এবং দীর্ঘ বারান্দা খুব কম বন-বাংলোতেই আছে। দুঃখ হয় যে, নিচের উপত্যকার এক সময়ের ঘন গভীর জঙ্গল এখন আর কিছুই নেই। আমঝারীয়ায় আজ যারা যাবেন তাঁরা ধারণাও করতে পারবেন না তিরিশ এমন কী কুড়ি বছর আগেও কেমন ছিল। সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। জঙ্গল বোধহয় আর থাকবে না এই গরিব, লোভী, অর্থগৃধ্নু, অশিক্ষিত; কু-রাজনীতির মানুষের দেশে। সবই শেষ হয়ে যাবে।

মাঝে মাঝে একলা পলাশ দাঁড়িয়ে আছে লালে লাল হয়ে প্রকৃতির বুকের ক্ষতর মতো। আমাদের লজ্জারই প্রতীক হয়ে। হু হু করে হাওয়া দিচ্ছে। জঙ্গল নয়, প্রায় টাঁড়েরই উপর দিয়ে। এই জায়গাটা অনেকটা মধ্যপ্রদেশের মান্ডুর মতো। "রূপমতী মেহালর" চত্বরে দাঁড়িয়ে নিচের নিমার-এর উপত্য-কায় চাইলে যেমন দেখায়, অনেকটা তেমনই। তবে নিমার-এর উপত্যকা আরও অনেক গভীর, খাড়া নেমে গেছে মান্ডু দুর্গের এলাকা থেকে। দূরে নর্মদা নদ দেখা যায় আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলে। যে নদের নাম আগে ছিল "রেওয়া।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এখানেও ভাল করে খুঁজলে চাট্টি নদী দেখা যায়। দেখা যায় মহুয়া-মিলন স্টেশনটি। খয়েরী অজগরের মতো চোপান এক্সপ্রেস চলে যায় শীস তুলে বারকাকানা থেকে ম্যাকল্যাক্সিগঞ্জ, মহুয়ামিলন, টৌড়ি, লাতেহার; ছিপাদোহর, ডালটনগঞ্জ হয়ে উত্তর প্রদেশের চোপানে। উত্তর ভারতে কয়লা যায় পশ্চিমবঙ্গ আর বিহার থেকে। পশ্চিমবঙ্গে যায় কাগজের কলের বাঁশ। আর কাঠ।

মোহন বিশ্বাসের কলকাতার ম্যানেজার গোর মুস্তাফী একটি ড্রাফট দিয়েছিলেন মোহনের চাঁদোয়া-টৌড়ির ম্যানেজার তিওয়ারীজীকে দিয়ে দেবার জন্যে। তাই ঢুকতে হল ওদের চাঁদোয়া-টৌড়ির ডেরায়। রেল লাইন পেরিয়ে চাতরার দিকের পথে, যে পথে পড়ে 'বাঘড়া' বা 'জাবড়া' মোড়। সেখান থেকে ডাইনে গেলে সীমারিয়া, টুটিলাওয়া, বনাদাগ এবং আমার যৌবনের প্রেমিকা হাজারীবাগ।

মোহনের টৌড়ি-ডিপোর আগের ম্যানেজার ছিলেন রামচন্দরবাবু। ওজন দু-স্টোন্। ভাত খেতেন, যাকে বলে একেবারে ক্যাট-জাম্পিং-রাইস। অর্থাৎ বিড়ালও ডিঙোতে পারত না সেই ভাতের পাহাড়। জবরদস্ত পুরুষ। এখন নিজেই ব্যবসা করছেন। দু-দুটি লাক্সারি ভিডিও বাস। নিজে নাকি ঘোড়ায় চড়েন। টাট্টু ঘোড়া, ঘোড়াটার সঙ্গে দেখা হল না এ যাত্রা। হলে, সমবেদনা জানিয়ে আসতাম। অনেক জন্মের জমানো পাপ থাকলে তবেই কোনো ঘোড়াকে রামচন্দরবাবুর মতো দুবলা-পাতলা মানুষের বাহন হতে হয়। দেখা হল না রামচন্দরবাবুর সঙ্গেও। মোহনের সুবাদে এঁরা সকলেই আমাকে যে সম্মান ও খাতির করেছেন চিরদিন, তার কণামাত্র যোগ্যতাও আমার নিজের ছিল না। আজও নেই।

এখনকার ম্যানেজার তিওয়ারীজী ছিপছিপে সজাগ মানুষ; খাতির করলেন অনেক। ওমলেট খাওয়ালেন আই. পি. পি. কোম্পানির অমর ভটচাজ। ঐখানেই আছেন পরিবার নিয়ে। হিন্দি স্কুলে পড়ছে বাচ্চা। প্রবাসী বাঙালিরা আর বোধ হয় বেশিদিন বাঙালিত্ব বজায় রাখতে পারবেন না। এবং সে জন্যে দায়ী পুরোপুরি আমরাই, যে সব বাঙালি পশ্চিমবঙ্গে বাস করি। কী আমরা করেছি নিজেদের জাতির জন্যে? নিজের প্রদেশের রাজধানীতে নিজেরা ভিখিরি দয়াপ্রার্থী পরের। লজ্জাবোধ থাকলে লজ্জা হত আমাদের। সে সব মহৎবোধ-এর ঝঞ্জাট আমরা অতি সহজেই কাটিয়ে উঠেছি। পশ্চিমবাংলার নব্য বাঙালিরা তুলনাহীন। ধন্য তাঁরা! আমিও তাঁদেরই একজন।

কিষুণকে বললাম, কিছু লেবুর জোগাড় করতে। বেলা দশটা। সূর্য মধ্য গগনে। গাড়ি এয়ার-কন্ডিশানড। বেতলা পৌঁছতে, খারাপ রাস্তা এবং বহু ডাইভার্সন থাকায় তিন ঘণ্টারও বেশি লাগবে এখান থেকে। অতএব দুধারে জঙ্গলের দৃশ্য দেখতে দেখতে, লেবু মেশানো জলে ভোদকা মিশিয়ে খেতে খেতে, ভাবতে ভাবতে, স্মৃতিমন্থন করতে করতে পাহাড় সাঁতরে,

www.BanglaBook.org

মহুয়ার গন্ধ মেখে, পলাশের গালচের উপর দিয়ে চলে যাওয়া। এইই ভালো হবে।

ডিপো থেকে বেরিয়ে গাড়ি ঘুরল ডাইনে।—এবার লাতেহারের দিকে। হাতে ভোদ্‌কার গ্লাস। কিষুণের হাতে স্টিয়ারিং থাকলে একটুও চল্‌কায় না তারল্য, পাহাড়ী পথেও। সঙ্গে ক্যাসেট নিয়ে গেছিলাম। চড়িয়ে দিলাম আমার প্রিয় গান। রসুলানবাঈ-এর : কংকর মোহে লাগ যাইহে না রে! কংকর লাগলে কি? কুছ্‌ ডর নাহি, গগর মোরা ফুট যাইহে নারে। গগর ফুটলে কি, কুছ ডর নাহি, চুন্দর্ মোরা ভিঁজ যাই হে না রে…

আহ্! গানের মতো জিনিস নেই। এ জন্মে কোনো কিছুই ভাল করে করা হল না। জীবনের প্রথমেই প্রায়রিটি ফিক্স্ না করে নিতে পারলে পরের জীবনে তা আর শোধরানো যায় না। প্রায়রিটি ফিক্স করে নিয়ে তারপর সমস্ত মনোযোগ, সাধনা, সেই দিকেই দিতে হয়। তাহলেই সিদ্ধি। পারলাম না। 'জ্যাক অফ অল ট্রেডস্' হয়েই রইলাম, এবং 'মাস্টার অফ নান্'।

লাতেহারের পাণ্ডিতজীর দোকানে যাওয়া-আসার পথে দুটো কালাজামুন আর একটু নিম্‌কী না খেয়ে গেলে মন খুঁত খুঁত করে। পাণ্ডিতজী বুড়ো হয়ে গেছেন এখন। দুপুরে এসে দোকানে বসেন। বড় ছেলেটি ছিপ্‌ছিপে ছিল। সেও দোকানে বসে বসে প্রকাণ্ড মোটা হয়ে গেছে। ছোট ছেলেটির হীরো-হীরো ভাব। জামাকাপড়ের কায়দা-টায়দা আছে। বড়লোক বাঙালি ব্যবসায়ীর ছেলেরই তো রকম সকম। কাজ নেহাৎ না করলে নয়, তাইই করে বলে মনে হয়। বড় ছেলে আমাকে দেখে দোকান ছেড়ে এসে নমস্কার করে কথা বলল। বাবার গুণ পেয়েছে। বাবার ভুঁড়িও। উপায় নেই। অনেক-গুলো গাধা মরে একটা বড় ছেলে হয়। এইই সব ভবিতব্য। প্রিকণ্ডিশনড্। ব্যতিক্রম যে থাকে না তা নয়, তবে ব্যতিক্রম সাধারণ নিয়মকে প্রমাণ করে না।

বেত্‌লা পৌঁছলাম বটে কিন্তু মোহনের কোনো গাড়ি বা জিপ দেখা গেল না সেখানে। রাঁচীতে গোস্বামীবাবু এবং আদিত্যবাবু দুজনেই বলেছিলেন যে, আমার রিজার্ভেশন আছে কেঁড় বাংলোতে, বেত্‌লা ছাড়িয়ে গাড়ুর পথে। এখানে গাড়ি না দেখে কিষুণ বলল, চালিয়ে হুজৌর কেঁড়।

কেঁড়-এ গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন দুটো বেজে গেছে। সকাল সাতটা থেকে গাড়িতে বসে আছি। দেখি, গেটে তালা দেওয়া। চৌকিদার রামলগনকে হেঁকে ডেকে সাড়া পাওয়া গেল না। বোঝা গেল, আজ রামনবমী। তাই কোথাও বসে জম্পেস্ করে মহুয়া খাচ্ছে। রামনবমীর জন্যে ফরেস্টের বাংলোও তালাবন্ধ।

তখন লজ্জিত কিষুণ বলল, চালিয়ে হুজৌর, উনলোগোনে বেতলামেই জরুর হোগা।

উনলোগ মানে, হয় রমেন বোস, নয় বাবুজ কর, নয়ত নিমাই ভটচাজ। আমি ভোর চারটেতে উঠেছিলাম সকালে প্লেন ধরার জন্যে। এবং তার আগে পুরো দুমাস অফিস থেকে রাতে বেরিয়েছি আটটায় অথবা তারও পরে, ইয়ার

www.BanglaBook.org

এন্ডিং-এর জন্যে। শরীর মেজাজ কিছুই ভাল নয়। তদুপরি এই রাশিয়ান তরলিমা। রাশ্যানদের আমি দুচোখে দেখতে পারি না। আর কোনো কারণের জন্যে নয়, তাদের মোটে হাসতে দেখি না বলে। দ্বিতীয় কারণ, রাশ্যান মেয়েদের নিম্নাঙ্গ ভীষণই ভারী হয়। লাতেহারের পণ্ডিতজীর বড় ছেলেরই মতো, মেয়েদের সম্বন্ধে আমার ধারণা খুবই উঁচু। সেই ধারণা এবং রোম্যান্টিকতার সঙ্গে রাশিয়ান মেয়েরা মোটে মানানসই নন। তবে জানি না, রাশিয়াতে আমি যাইনি; সেখানে গেলে হয়তো হাসি-খুশি পুরুষ ও ছিপছিপে মেয়ে দেখলেও দেখতে পারি। আপাতত রাশিয়ার উপর রাগটা ভোদ্‌কার উপরে স্থানান্তরিত করলাম কিছুটা আর কিছুটা 'উনলোগ'-এর উপরে। বেত্‌লাতে আবার ফিরে গাড়ি থেকে আমি নামলামই না। কিষুণকে বললাম, তুমি উপরে গিয়ে দেখো। ওঁরা যদি কেউই না থাকেন তো আমাকে আবার সোজা রাঁচী পৌঁছে দিয়ে এসো। আমি আজই ফিরে যাব।

কিষুণ বলল, কাহে হুজৌর? ডালটনগঞ্জ চলেঙ্গে আপকো লেকে।

আমি বললাম, নেহী। হাম রাঁচীহি যায় গা।

রাঁচী যে কারণে আগে বিখ্যাত ছিল, সেই কারণেই হয়তো আমাকে রাঁচী নিয়ে যেতে হতে পারে এই কথা ভাবতে ভাবতে কিষুণ উপরে উঠে টুরিস্ট লজ-এ। গাড়িতে বসে উনলোগদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

উনলোগ এর মধ্যে একজনকে হয়তো বাবলুবাবুকে দেখা যাবে এক্ষুনি যদি এখানে তাঁরা থেকে থাকেন। বাবলুবাবু সিঁড়ি দিয়ে লাফাতে লাফাতে নাবছেন।

বাবলুর মাথার চুলে একটু সাদা লেগেছে এখন। কিন্তু তাকে দেখছি একই রকম গত তিরিশ বছর। সাদা পায়জামা, হাফ-হাতা পাঞ্জাবি, নয়ত হাত-গোটানো। শীতকালে একটি সোয়েটার ওঠে তার উপর এবং একটি আলোয়ান। মুখে সব সময় কালাপাত্তি জর্দা দেওয়া পান। চোখ দুটো লাল। ঠোঁটের সঙ্গে মানিয়ে যায়: কিন্তু বাবলুবাবু নন, রমেনবাবু সিঁড়ি দিয়ে লাঠি-ঠকঠকিয়ে নামলেন।

নেমেই ঘাড় বেঁকিয়ে কিষুণকে বললেন, অজীব্ আদমী হ্যায় ভাই তু। খানাকা ইন্তিজাম করকে ম্যায় হিঁয়া বৈঠা হুয়া হ্যায় ঔর তু সাহাবকো লেকে কেঁড় ভাগ্ গেলি!

কিষুণ বলল, ম্যায় ক্যায়সে জানু? রাজ-হোটেলে বলল কেঁড়, বেত্‌লার চেক্‌নাকাতে জিগ্যেস করলাম, তারা বলল, হ্যাঁ মোহব্বাবুকা জিপ পহিলে গ্যায়া উসতরফ্।

আর্‌রে উও তো বাবলুবাবু। ছাপাদোহর গায়ে হ্যায় উনোনে।

ম্যায় ক্যায়সে জানু?

চলুন চলুন, জেরা গড়বড় হয়ে গেছে। আজকে রাত্রিবাস এখানেই। খাওয়ার রেডি আছে। বলেই হাঁক ছাড়লেন, হোয় খইরুল্…জলদি খনা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লাও কামরায়।

অন্য লোকজন স্যুটকেস আর ব্রিফকেস নিয়ে এল।

বেশ গরম পড়ে গেছে এদিকে কলকাতারই মতো, খুব তাড়াতাড়িই এ বছর। রাশিয়ান ভোদ্‌কা সেই গরম বাড়িয়ে দিয়েছে আরো। কেঁড়-এ গিয়ে ফিরে আসতে রাগের চোটে আরও দুটো বেশি খাওয়া হয়ে গেল। রাগ জিনিসটা খুব খারাপ।

খেয়ে দেয়ে ঘুম লাগালাম।

রমেনবাবু বললেন, আমি দিবানিদ্রা দিই না। চেয়ারে বসে আমি কনটেমপ্লেশন্‌ করি খাওয়ার পর।

এই রমেনবাবু একজন গ্রেট লোক। ওঁর জীবন নিয়ে সহজেই একটি তিনখণ্ড উপন্যাস লেখা যায়। আমি লিখেওছি কিছু কিছু। 'কোয়েলের কাছেতে', 'কোজাগরে'। ওঁর বয়স কত তা চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই। বেঁটে-নাটা গাট্টা-গোট্টা মানুষ। সামনের দিকে একটু টাক পড়েছে। উপরের এবং নিচের পাটির কয়েকটি দাঁত হাপিস্‌। রমেনবাবু বলেন, আসলে বাঁধানো ইচ্ছে করেই ভেঙে দিয়েছি। লোকে ভাববে, ন্যাচারাল।

বয়স চল্লিশও হতে পারে সত্তরও হতে পারে। কোমর এবং একটি পা গেছে বছর ছয়েক আগে বোম্বে রোডে অ্যাকসিডেন্টে। জিপে করে যাচ্ছিলেন কলকাতা মোহনবাবুরই কাজে, মাস্তান রংবাজ অল্পবয়সী হীরো ড্রাইভার ছিল। দাঁড়িয়ে থাকা একটা লরির নিচে জিপ সেঁধিয়ে যায়। পাঁচ মাস কলকাতার নার্সিং হোমে ছিলেন রমেনবাবু। হাতে লাঠি নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেন বটে কিন্তু জীবনীশক্তি এবং স্পিরিটের কিছুই ঘাটতি নেই। চ্যাম্পিয়ন লোক।

বিকেলে ঘুম ভাঙল মাদলের আওয়াজে। রামনবমীর জৌলুস বেরিয়েছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের তিনখানা হাতীকে সাজিয়ে গুজিয়ে। প্রচুর মহুয়া সেবন করে ছেলেরা সব মেয়ে সেজে নাচানাচি করছে। যে লোকটি লম্বা লেজ লাগিয়ে হনুমান সেজেছে তার অভিনয় খুব ন্যাচারাল হচ্ছে। মহুয়াই তাকে দিয়ে যা করানোর করিয়ে নিচ্ছে। নিজের কিছুই করতে হচ্ছে না। আবীরও মেখেছে দেখলাম। উৎসবের দিন আজ। বেত্‌লা ট্যুরিস্ট লজ-এর চৌকিদার এবং কেঁড় বাংলোর চৌকিদার রামলগনের মুখ লম্বা হয়ে গেছে মহুয়ার নেশায়। হয়তো আমার নিজের মুখও লম্বা হয়ে গেছিল রাশিয়ান-দের দয়ায়। ভাগ্যিস সব জায়গায় নিজের মুখ নিজে দেখা যায় না।

একটু পায়চারী করলাম রমেনবাবুর সঙ্গে নিচের পথে। সবুজ শার্ট পরা, চোখে সানগ্লাস, ফর্সা সুদর্শন এক যুবক জিপ চালিয়ে চলে গেলেন পাশ দিয়ে। রমেনবাবুকে দেখে হাত তুললেন।

কে?

আমি শুধোলাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আররে। ইনিই তো লাহিড়ী সাহেব হচ্ছেন।

কে লাহিড়ী সাহেব ?

আররে সঙ্গম লাহিড়ী, বেতলার গেম-ওয়ার্ডেন হচ্ছেন।

কোথা থেকে এলেন ?

ডালটনগঞ্জ গেছিলেন বোধ হয়।

কেন ?

বাঃ ঐখানেই তো হেড কোয়াটার্স। চ্যাটার্জী সাহেব তো ওখানেই থাকেন।

তিনি কে ?

ফিল্ড-ডিরেক্টর, টাইগার প্রজেক্ট, পালামৌ।

ও।

কলকাতার বাঙালি ?

না, না। উনিও বিহারে সেটলড্ হচ্ছেন আর কী। পূর্ণিয়া না কোথায় বাড়ি যেন। ওঁর স্ত্রী মিসেস চ্যাটার্জীও জঙ্গল-ফঙ্গল জানোয়ার-ফানোয়ার নিয়ে লেখেন নানা কাগজ-টাগজে। খুবই কালচার্ড হচ্ছেন।

বাঃ। কোন্ কাগজে লেখেন ?

অনেকেই কাগজে। এই তো সেদিনই 'আজকাল'-এ একটি লেখা বেরিয়েছিল।

তাইই বুঝি।

হ্যাঁ।

আলাপ করবেন নাকি লাহিড়ী সাহেবের সঙ্গে ?

না। আজ থাক। কয়েকদিন পর। কথা বলে বলে একেবারেই ক্লান্ত। কথা না-বলতেই এখানে আসা। আমি বললাম।

রমেনবাবু আমাকে চেনেন। উনি ভুল বুঝবেন না জানতাম। নইলে জলে থেকে জলের রাজা কুমীরের সঙ্গে আলাপ না-করতে চাওয়াই তো মূর্খামি। আসলে কলকাতায় প্রতিদিন এত টেলিফোন ও এত মানুষের মোকাবিলা করতে হয় যে বাইরে এলে বোবা হয়েই থাকতে ইচ্ছে করে। সেটাই হয় আসল বিশ্রাম।

রমেনবাবু বললেন, বিলকুল্ ঠিক। কোনো ব্যাপারই নেই। যখন ইচ্ছে হবে বলবেন, আলাপ করিয়ে দেব।

তারপরই বললেন, জানেন তো লালাদা, লাহিড়ী সাহেবের চারটি বাচ্চা হয়েছে অল্প কদিন আগে।

ঘাবড়ে গেলাম। একসঙ্গে চারটি বাচ্চার কথা শুনে।

চারটি বাচ্চা মানে ; একসঙ্গে ?

ধুড়ি! মানে, ওঁর নিজের স্ত্রীর নয়। উনি তো ব্যাচেলর।

আরও ঘাবড়ে গেলাম আমি।

মানে ?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মানে, ওঁর বাঘিনীর চারটে বাচ্চা হয়েছে। বেত্‌লা ব্লকেই "ভালি"তে বাচ্চা দিয়েছিল বাঘিনী। এখন বাচ্চাগুলো বড় হয়ে গেছে। পোয়ার বাঘ-বাঘিনী তারা এখন। এই তো সেদিন কেঁড়ের থেকে ছিপাদোহরে যাওয়ার পথে বাবলু একটিকে দেখেছিল সন্ধের সময়। মহুয়াডাঁরের কর্নেল বিক্রম দেখেছেন পরশুদিন বাঘ। দেখলেন না লেখা আছে ক্যান্টিনের বারান্দাতে 'টাইগার লাস্ট সাইটেড অন ২৮।৩।৮৫'।

তাইই।

বললাম আমি।

ভাল কথা। বেত্‌লাতে বহু বছর বাঘ দেখা যায়নি।

এমন সময় বাবলুবাবু এলেন জিপ চালিয়ে ছিপাদোহর থেকে। বললেন, নমস্কার লালাদা। কোনো তক্‌লিফ হয়নি তো?

রমেনবাবু বললেন, তুই শালা একটা এঁড়েই রয়ে গেলি। গেলি যখন, চেক্‌নাকাতে বলে যেতে পারতি না, যে কৃষ্ণ এলে ওকে বলতে যে, আমি বেত্‌লাতেই আছি এবং লালাদা আজ এখানেই থাকবেন?

লেহ্‌ লট্‌কা।

বাবলু তার ওরিজিনাল এক্সপ্রেশন ঝাড়ল। যত ঝাড় সব মাইরী আমাকেই তোমাদের। তুমি একটু ঘাড় লম্বা করে নজর রাখলেই পারতে। কোথায় কোন্‌ সাটুলীর সঙ্গে লট্‌কে ছিলে এখন আমাকে দোষ দিচ্ছ।

বললাম যা হয়েছে, হয়েছে, এবার চল যাই। তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ব আজ। তোমরাও খাবে তো আমার সঙ্গে?

হ্যাঁ। খাব। মোহনবাবু তো নেই। মালকিনও নেই। আপনি এতদিন পরে এলেন, একটু ড্রিঙ্কস্‌-টিরিংস্‌ হবে না? আপনারা এলেই না একটু মজাটজা হয়। নইলে তো শালা এই জঙ্গলে জঙ্গলেই রগড়ে বেড়াই সুবা-সাম।

আমি খাবো না। তবে চলো। আমার সঙ্গে একটা ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট-এর বোতল আছে। তোমরা খেও।

কালকে মোহনবাবু এসে যাবেন। আপনার সব বন্দোবস্ত ফিট্‌ হয়ে যাবে। সকালে ফোন করেছিলেন, বলেছেন লালাদার কোনো অসুবিধা যেন না হয়। মোহনবাবু এসেই কাল এখানে আসবেন। মালকিন্‌ পরে আসছেন। তিন চার দিন পর।

এক নম্বর ঘরের বারান্দাতে বসলাম আলো নিবিয়ে। চিতল হরিণগুলো মহুয়া খাচ্ছে বাংলোর গায়ে গা য় চাঁদের আলোয়। শুক্লপক্ষ দেখেই এসেছি। সাতদিন থাকব এবং ঠিক সাতদিন পরেই পূর্ণিমা। ট্রি-হাউসের সামনে নুনী করেছে একটা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট। সেখানে নুন চাটতে এসেছে অনেক হরিণ। শুধু চিতলরাই আসে বাংলোর কাছে। সম্বর বা কোটরা বড় একটা দেখিনি কখনও। বাইসনও আসে, সময় সময়। পুজোর পর, ক্বচিৎ হাতী, বাংলোর কাছাকাছি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওরা হুইস্কি খেলো। কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে, চাপাটি আর মুরগির ঝোল খেয়ে শুয়ে পড়লাম গুডনাইট করে। ওরা বললেন আগামীকাল ঠিক সকাল নটা সাড়ে নটার সময় এসে আমাকে এবং মালপত্র তুলে নিয়ে কেঁড়-এ পৌঁছে দেবে আমাকে।

ওরা চলে গেলে দরজা বন্ধ করে সব লাইট নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম। এখন পাখা লাগলেও, মনে হল একটু পর বন্ধ করে দিতে হবে। বাইরে চাঁদের আলো। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জোর হচ্ছে।

হরিণগুলো খচ্‌মচ করে বেড়াচ্ছে। হাওয়াতে মহুয়ার মাতাল-করা ভারী গন্ধ। একটা পিউ-কাঁহা ডাকছে ক্রমাগত। দোসর সাড়া দিচ্ছে পালামৌ ফোর্ট এর দিক থেকে।

ভারী ভাল লাগছে। এই গন্ধ, এই শব্দ, এই পরিবেশ আমার ফাইভস্টার হোটেলের চেয়েও অনেকই ভাল লাগে। কার সঙ্গে কিসের তুলনা। তাইই তো বারে বারে আমি এ জঙ্গলে, কী অন্য জঙ্গলে সুযোগ পেলেই আসি।

পাশের ঘরে কারা আছেন জানি না। হঠাৎ জোরে রেকর্ড প্লেয়ার বাজালেন। যদিও বারণ আছে। অনুপ জালোটার গজল।

অনুপ জালোটা নিশ্চয়ই ভাল গান। কিন্তু যে গান এই চাঁদের বনে শোনা যায় তার তুলনায় সব গায়ক-গায়িকার গানই অকিঞ্চিৎকর। যাঁরা এটুকু বোঝেন না, তাঁরা এত জায়গা থাকতে কেন যে জঙ্গলে আসেন।

বেতলা/কেঁড় ৩১।৩।৮৫

মাঝ রাতে একবার উঠেছিলাম। বাথরুমে গিয়ে বাইরের দরজা খুলে বারান্দাতে এসে বসলাম কিছুক্ষণ ঘুম চোখে। জ্যোৎস্না ফুট ফুট করছে। পেছন দিকের প্রান্তরে অনেকগুলো প্রাচীন ঝুপড়ি-হওয়া মহুয়া গাছ থাকায় আলো ভাল খোলে না। চিতল হরিণগুলো তখনও মহুয়া খেয়ে ডাকছে। ভোর রাতে ছেলেমেয়েরা মহুয়া-কুড়োতে এসে আর কী পাবে?

পাবে। প্রকৃতি সকলের জন্যেই সংস্থান রাখেন। ক্রমাগতই মহুয়া ঝরছে। হরিণরা চলে গেলেও মানুষ-মানুষী পাবে।

টাকু-টাকু-টাকু-টাকু-টাকু-করে কপারস্মিথ পাখি ডাকছে। কমলদহর দিক থেকে তীক্ষ্ণ স্বরে ময়ূর ডেকে উঠল। নাকি পালামৌ ফোর্ট-এর দিক থেকে। এখন ফোর্টের উপর থেকে ঔরঙ্গা নদীর দিকে চেয়ে থাকলে

www.BanglaBook.org

কেমন দেখাবে কে জানে? চাঁদের রাতে কখনও ছোটে যাইনি। 'পাল-আম্বে-টা', দ্রাবিড় ভাষায় মানে হচ্ছে দাঁত বের করা নদী। বর্ষায় যখন ঔরঙ্গা বেয়ে বেগে জল ছুটে যায় তখন উঁচু হয়ে থাকা কালো কালো পাথরগুলো দেখে ঐ রকমই মনে হয়। 'কোয়েলের কাছে'তে লিখেছি এই চেরো রাজাদের আর আজ থেকে অনেকই বছর আগে খারওয়ারদের কথা। যাদের দুর্গ এই 'পালামাউ ফোর্ট।'

সকালবেলা ঘুম ভাঙল পাখিদের চিকন কলকাকলিতে। শুয়ে শুয়ে শুনতে লাগলাম। আকাশে মেঘ করেছে। যেন বর্ষাকাল। "আজ সকালে বনের ছায়া লুটিয়ে পড়ে বনে, জল ভরেছে ঐ গগনের নীল নয়নের কোণে।" আস্থায়ী যে কী। মনে পড়ে না আজকাল সব গান। গানের সুরের আসন-খানি পাতি পথের ধারে। "ওগো পথিক, তুমি এসে বসবে বারে বারে। ঐ যে তোমার ভোরের পাখি নিত্য করে ডাকাডাকি, অরুণ-আলোর খেয়ায় যখন এস ঘাটের পারে/মোর প্রভাতীর গানখানিতে দাঁড়াও আমার দ্বারে।"

আমরা যখন ডোভার রোডে থাকতাম তখন অর্ঘ্য (অর্ঘ্য সেন) প্রায়ই এসে এই গানটি এবং "আজ সকাল বেলার বাদল আঁধারে বনের বীণায় কী সুর বাঁধা রে" গানটি শোনাত। অবশ্য আমারই অনুরোধে। পরে যখন রাজা বসন্ত রায় রোডের লন-ওয়ালা বাড়িতে চলে গেলাম আমরা তখন তো সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের অনুষ্ঠান ছাড়াও রীতিমত 'বসন্তোৎসব', 'বর্ষামঙ্গল' ইত্যাদি করতাম বাড়িতে। লনে শ্রোতারা বসতেন আর লনের সামনের খোলা ঘরে ডায়াস হত। পাড়ার ছেলেমেয়েরাও সঙ্গে থাকত। আজকে তাদের ছেলেমেয়েদেরও হয়তো বিয়ে হয়ে গেছে। কারো নাতি-নাতনীও হয়ে থাকতে পারে। উমাকে মনে আছে।

সময় কী করে উড়ে যায়।

অর্ঘ্য আমার চেয়ে এক ক্লাস উঁচুতে পড়ত কলেজে। ও সায়েন্সের ছাত্র ছিল, আমি কমার্সের।

বিছানাতেই গড়াগড়ি দিচ্ছিলাম। গায়ের ব্যথা মরেনি তখনও। আজকাল এয়ার-বাসের দৌলতে দু-ঘণ্টায় দিল্লি আর আড়াই ঘণ্টায় বম্বে গিয়ে গিয়ে গাড়িতে একসঙ্গে সাতঘণ্টা বসে থাকা ক্লান্তিকর মনে হয়। সে যতই আরামদায়ক এয়ারকন্ডিশান্ড গাড়ি হোক না কেন। অভ্যেস খারাপ হয়ে গেছে।

খইরুল চা নিয়ে এল। বেশ মোটা হয়ে গেছে। মদ ধরেছে বোধহয়। বিস্কিট দিল, রমেনবাবুর রেখে যাওয়া প্যাকেট থেকে। ফলও ছিল। সন্দেশ। ওসব থাকল। বলল, নাস্তায় পরোটা, ওমলেট আর আলু ভাজা করে দিচ্ছে গরম গরম।

বললাম, সাড়ে আটটায় নিয়ে আসতে। ঘরেই। বাবলু আর রমেনবাবু নটা সাড়ে নটাতে আসবেন বলেছেন।

চান করে ব্রেকফাস্ট খেয়ে যখন তৈরি হয়ে গেলাম তখন নটা বাজে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভাবলাম, কেচ্‌কীর দিকের রাস্তায় আস্তে আস্তে হেঁটে এগিয়ে যাই, পথে যে কোনো মুহূর্তে ওদের জিপের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। এবং চড়ে পড়ব। তখন মনে ছিল না যে, বাবলুর ঘড়ি সচরাচর ঘণ্টা খানেকের উপর চলো থাকে।

নিচে নেমে, মধুবন-এর পাশ দিয়ে এগোলাম। গত বছরের আগের বছরের শীতে কয়েকজনকে নিয়ে যখন এসেছিলাম তখন 'মধুবনে'ই ছিলাম। সামনে আই. টি. ডি. সি.-র লজ তৈরি হচ্ছিল। এখনও হচ্ছে। এবং আরও অনেকদিন হবে মনে হয়। নীরেনদা এবং মিস্টার এবং মিসেস রায়চৌধুরীকে নিয়েও একবার বর্ষাকালে এসে বেতলাতে ছিলাম। তারও অনেক আগে ঋতু ও মালিনীকে নিয়ে। তখন মালিনী আট বছরের ছিল। ন্যু ইয়ার্স ইভ্‌-এ জোর-হল্লাগুল্লা হয়েছিল। আই. পি. পি.-র মিস্টার শেঠ এসেছিলেন। ওড়িশার জঙ্গলের বন্ধু চাঁদুবাবুও এসেছিলেন সেবার আমার সঙ্গে। সাতসকালে উঠে বেলগাছ খুঁজে খুঁজে বেল পাতা ছিঁড়ে কচাকচ্‌ করে চিবিয়ে খেতেন। নানা বাতিক ছিল চাঁদুবাবুর। মানুষটি জঙ্গলকে খুবই ভালবাসতেন। জঙ্গল এবং জংলী জানোয়ার সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল গভীর। তাঁর কথা অন্যত্র বলব।

হঠাৎ মেঘ সরে গিয়ে রোদ বেরোল। কিন্তু ততক্ষণে পায়জামা পাঞ্জাবি ও কাবলী জুতো পরে এগিয়ে গেছি অনেকটা। টুপিও আনিনি। মেঘ এমন হঠাৎ কেটে যাবে বুঝিওনি। বেশ রোদ লাগছে। অথচ গাছের ছায়ায় যে দাঁড়াব তেমন গাছ নেই একটিও। কুটুমু গ্রামের সীমানা পর্যন্ত জঙ্গল প্রায় সাফ হয়ে গেছে। থাকবার মধ্যে পলাশ গাছ। তার ছায়া শীতকালে হলে সামান্য গরমে গরম হয়। তার নিচে কমলা রঙা গালচে কিন্তু মাথার উপরে রঙিন রোদ কমলা আভায় ঝিক্‌মিক করে।

বাবলুর জিপের কোনোই পাত্তা নেই। অতএব হাঁটতেই থাকলাম। পিছনে হাঁটার চেয়ে সামনে হাঁটাটা অনেক স্বস্তির। পথে এবং জীবনেও পেছনে হাঁটার মধ্যে হটে যাওয়ারও ব্যাপার থাকে একটা :

শেষে দেখি কুটুমুর মোড়েই পৌঁছে গেলাম। বাঁদিকে বোরোয়াডির পথ। সোজা গেলে ঔরঙ্গার ব্রিজ পেরিয়ে সাতমাইলের মোড়। বাঁয়ে রাস্তা চলে গেছে। মোরামের।

ডালটনগঞ্জ, ডাইনে লাতেহার। ব্রিজের একটু আগেই বাঁ দিকে কেচ্‌কীর কুটুমুর মোড়ে বসার বাঁধানো জায়গা আছে। কী একটা গাছও আছে। তখন গরমে লক্ষ করার উপায় ছিল না। পায়ের তলা মাথা সব যেন জ্বলতে লাগল। গরম বড় তাড়াতাড়িই পড়ে গেছে এবার। দোকানে গিয়ে জল চেয়ে খেলাম। তারপর চা ও পান। ঐ মোড়ে মিনিট পনেরো বসে দেহাতিদের নানা রকম কথা শুনতে শুনতে কেটে গেল। গ্রাম-গঞ্জের যে কোনো পথের সমাহারেই কিছুক্ষণ বসে থাকলে দেশ ও কাল সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়, অবশ্য যদি ভাষাটা জানা থাকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পানও যখন শুকিয়ে এসেছে মুখে তখন দেখা গেল বাবলু আসছে। হাত নাড়াতে জিপ দাঁড়াল। আবার চা খাওয়া হল এক প্রস্ত।

ড্রাইভারের নাম গণেশ রাম। বেঁটেখাটো, চালাক চেহারার মানুষ। কিন্তু বিধাতা তাকে গড়বার সময় ঘাড়টা গড়তে ভুলে গেছেন। কাঁধ থেকেই মাথাটা উঠেছে।

রমেনবাবু কোথায় ?

আমি শুধোলাম।

রমেনদা আসছেন। আপনার জন্যে সব বাজার টাজার করে। বাবলু বলল।

বেতলায় গিয়ে আমার স্যুটকেস আর ব্রিফকেস তুলে নিয়ে রওনা হওয়া গেল কেঁড়-এর দিকে।

মোহনের সবকটি জিপ এবং গাড়িই সবসময়ই শোরুম কন্ডিশানে থাকে। গাড়ির ব্যাপারে এমন শৌখীন লোক ভারতবর্ষে খুব কমই আছে। কিন্তু এই পেট্রল জিপটির অবস্থা দেখলাম অতি শোচনীয়। সিট যেন ছুঁচোয় খাবলে খেয়েছে। পায়ের কাছে ম্যাট নেই। স্টিয়ারিং আড়াই-পাক ফলস্। অর্থাৎ কোথাও মোড় নিতে হলে তার কিছুক্ষণ আগে থেকেই বাঁই বাঁই করে স্টিয়ারিং কাটাতে হবে।

বেতলা থেকে আমিই চালিয়ে গেলাম। জঙ্গলে জিপ চালানো হাঁটারই মতো আমার একটি প্রিয়তম শখ।

বললাম, ব্যাপার কি বাবলু ? এটা তো মোহনের জিপ বলে মনে হচ্ছে না। এ মোহনের জিপ হতেই পারে না।

বাবলু বলল, না লালাদা জিপটা মোহনেরই হচ্ছে। তবে ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে একে ইলেক্শন ডিউটিতে পাঠানো হয়ছিল। আসার পর এখনও ঠিক করে বানানো হয়নি।

এই ড্রাইভারকেও পাঠিয়েছিলে জিপের সঙ্গে ? মিস্টার গণেশ রামকে ?

ব্যাপারটা তাইই হচ্ছে।

তাহলে পার্লামেন্টের ইলেকশনই ওর ঘাড় খেয়ে নিয়েছে। বিধাতার দোষ নেই।

ব্যাপারটা অনেকটা সেরকমই হচ্ছে।

বাবলু একটু যেন ভেবে-টেবে বলল।

বাংলোয় পৌঁছে দেখা গেল চৌকিদার রামলগন সব একেবারে ফিট্‌ফাট করে রেখেছে। আসলে ছিপাদোহর থেকে মুসলিম, মোহনের মেটম্যানেজার, আগেই এসে সব বন্দোবস্ত করেছে। আগে রান্না করার জন্যে জুম্মান (কোয়েলের কাছের) বা লালটু পান্ডে (কোজাগরের লালটু পান্ডে) আসত। ওরা এখন কেউই নেই। মুসলিম-এর দূরসম্পর্কের শালা, একটি অল্পবয়সী ছেলেই রান্না করবে। তার নাম তওহিদ। জল তোলার জন্যে আছে ছোটু। আর মি. গণেশ রাম থাকবে সবসময় জিপ নিয়ে। যাতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার মবিলিটি অক্ষুণ্ণ থাকে।

বাবলু এসেই মুরগির ঝোল আর ভাতের অর্ডার করে দিল। অ্যাপোলজেটিকালী বলল, মোহন তো আজই রাতে এসে যাবে। দুপুরে একটু অসুবিধে হবে আপনার।

কেন ?

ডালটনগঞ্জে ভোদ্‌কা পাওয়া যায় না।

খেতেই হবে এমন কি কথা ?

আপনারা এলেই আমরা একটু এনজয় করতে পারি নইলে তো শালা দিনভর রাতভর জঙ্গলে জঙ্গলে। সেইই আর কি !

ভোদ্‌কা তো আছে। খাও। স্কচও আছে। কাল তো একটু খেলে।

আমি বললাম।

দাঁড়ান। দাঁড়ান। রমেনদা আসুক।

রমেনবাবু একটু পরই আরেক ডিজেলের জিপ নিয়ে এসে হাজির। এটিকে দেখে মোহনের জিপ বলে চেনা যায়। সামান-টামান নামল। রমেনবাবু অনেক নছল্লা করে শেষকালে ভোদ্‌কা একটু এবং হুইস্কিও একটু খেলেন। তারপর সকলে মিলে লাঞ্চ।

বিকেলে ছিপাদোহরে কাজ ছিল ওদের। আমি বললাম, তোমরা জিপে চলে যাও। আমি হেঁটেই পৌঁছব। মাইল চারেক তো রাস্তা। এর আগেও বহুবার গেছি।

ওরা হাঁ হাঁ করে উঠল।

রমেনবাবু বললেন, কোনো ব্যাপারই নেই। আপনি লালাদা, বহুতই কনফিউজড্‌ হচ্ছেন। কলকাতায়ই তো থাকেন আজকাল। আগের মতো ঘোরেন আর কোথায় ? এয়ার-কন্ডিশানড সব সময়। সবে গরম পড়েছে এখানে। পালামুর গরম। এমন পট্‌কা দেবে না ! জঙ্গল্‌মে মঙ্গল না হয়ে বিলকুল অমঙ্গল হয়ে যাবে।

যা ভাবছ তা নয়।

আমি বললাম।

অফিসে কাজের জন্যে এবং বাইরের আওয়াজের জন্যে না চালিয়ে উপায় নেই। কিন্তু গাড়িতে বা বেডরুমে শুধু লাগানোই আছে। কালেভদ্রেই চালাই।

বয়স তো হচ্ছে রে বাবা ! নাকি চিরদিনই নওজোয়ান।

রমেনবাবু হঠাৎ করে বললেন।

তা কেন। নওজোয়ান শুধু রমেন বোসই থাকবে।

বেশ ! আমার কি ! যা খুশি করুন ! শেষে শঙ্কে গেলে এই ল্যাংড়া রমেন বোসেরই জান কয়লা হবে।

বাবলু রাজী হল সঙ্গে হাঁটতে। তবে কাঁচা রাস্তার মোড় অবধিই শুধু। বলল, তার বেশি হাঁটা ইমপসিবল্‌। পাগলরা এরকম করে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রমেনবাবু বললেন, মরবি শালা তুইই মর। পায়ে হেঁটে সিগারেটের দোকানে পর্যন্ত যাস না; মোহন বিশ্বাসের গাড়ি চড়ে পারলে তো পাইখানাতেও যাস আর তুই শালা এই রোদে হাঁটবি এতটা? তোর না ডায়াবেটিস,?

যত্ত সব ফালতু কথা।

বাবলু চটে গিয়ে বলল। জানেন লালাদা রমেনদা এই সব রটিয়ে বেড়াচ্ছে যাতে আমার বিয়ে না হয়। অসুখ-ফসুকের আমি কেয়ার করি না। পেট গড়বড় হলেই বাজারে গিয়ে জমিয়ে পরোটা আর কষামাংস খাই। আর জ্বর হলেই গুলি।

গুলি মানে? ট্যাবলেট? আমি শুধোলাম বাবলুকে।

রমেনবাবু মাঝে পড়ে বললেন, আরে না না। তাহলে আর বলছি কি! গুলি মানে, সিন্ধির গুলি। এমনিতেই তো গুলের রাজা তার উপর সিন্ধির গুলি। আমাদের জান কয়লা।

বাবলু রমেনবাবুর কথায় কোনো ইম্পর্ট্যান্স না দিয়ে বলল, চায়ের সঙ্গে কি খাবেন লালাদা?

কী খাব? এইই তো ভাত খেলাম!

দুটি করে বিস্কিট অন্তত।

তা দাও।

আলাদা পটে চা, চিনি, দুধ সব সাজিয়ে তওহি চা নিয়ে এল বারান্দায়।

সামনেই কতগুলো জ্যাকারান্ডা গাছ। ফুল ফুটেছে; অস্ফুটে। মস্ত দুটো বহেড়া গাছ ছিল হাতাতে। তার একটি আছে। অন্যটি কাটা গেছে। বাংলোর প্রায় গা-ঘেঁষেই অন্য একটি ছোট্ট বাংলো উঠছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের তত্ত্বাবধানে।

এত জায়গা থাকতে হাতার মধ্যে দ্বিতীয় বাংলোটি যে কেন এই বাংলোর ঘাড়ের উপরই করতে হল তা কে জানে? সৌন্দর্যবোধ এবং প্রাইভিসি-বোধ সবসময় আশা করা যায় না। সকলের কাছ থেকে তো নয়ই। সাহেবরা এইসব বাংলো বানিয়ে গেছিলেন জায়গা নির্বাচন করে, বাংলোর হাতাতে গাছ লাগিয়ে, পুরো ব্যাপারটা প্রত্যেকটি জায়গায় যত্ন করে লে-আউট করে। বর্তমানে সব জায়গাতেই দেখি দমাদ্দম ইঁট-কংক্রিটের বাড়ি হয়ে যায়। প্রকৃতি, তার পরিবেশ, তা নিয়ে কেউই মাথা ঘামান না। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার বন-বাংলোগুলিতে কতগুলি নতুন গাছ লাগানো হয়েছে গত ত্রিশ বছরে তা আমার জানতে ইচ্ছে করে। যেখানেই যাই, দেখি, সাহেবদের লাগিয়ে যাওয়া গাছ মরে যাচ্ছে। ফুল ফোটে না। উলটে ফটাফট গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। কেউই ভাবেন না। চোখ খুলে তাকান না। ভারী কষ্ট হয়। Emerson-এর সেই বহু পুরোনো কবিতাটি মনে পড়ে যায়, যার কথা বহু জায়গায় লিখেওছি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বোল্ড অ্যান্ড দি এঞ্জিনীয়র হু ফেলস্ দ্যা উড্
নট দ্যা ফ্লাওয়ার দে প্লাক্ অ্যান্ড নো ইট নট, অ্যান্ড
ওন্ট দেয়ার বটানী ইজ ল্যাটিন নেমস্

চা খাওয়ার পর রমেনবাবু ডিজেলের জিপে গিয়ে বসলেন।

বললেন, কাঁচা রাস্তার মোড়ে অপেক্ষা করবি আমি এগিয়ে গিয়ে ছিপাদোহরের পথে। দেখিস বাবলু। তুই শেষে হাঁটতে গিয়ে টেঁসে-গেলে আমি কিন্তু সৎকার করতে পারব না।

বাবলু বলল, ভাবছ রমেনদা। তুমিই আগে যাবে। বয়সের গাছপাথর তো নেই। আমি তো ইয়াং। ব্যাচেলার।

আরে ব্যাচেলার তো আমিও। তাতে কি? ব্যাচেলাররা কি বুড়ো হয় না। অচ্ছা কনফিউজড্ হচ্ছে দেখি এ।

গুট্-গুট-গুট-গুট শব্দ করে ডিজেলের জিপ এগিয়ে গেল।

বাঃ। বেলা পড়ে আসছে। কেঁড় গ্রামের সীমানা পেরিয়ে যেতেই ভাল লাগতে লাগল খুব। একটা চড়াই মতো আছে। চড়াইটা উঠেই বাঁদিকে ফরেস্ট রোড বেরিয়ে গেছে একটা। কাঁচা। এই পথে জুম্মানের ছেলে পুন্নোয়ার সঙ্গে হাঁটতে যেতাম, শীতকালে ছিলাম যখন এখানে এসে কয়েক বছর আগে একা। 'হাতী' বলে 'দেশ'-এর পুজো সংখ্যাতে একটি গল্প লিখেছিলাম এই বাংলোরই পটভূমিতে। তখন অনেক আমলকী ছিল বনে বনে। ঐ বনের মধ্যে চলে-যাওয়া ঐ কাঁচা পথটি বড় বড় আমলকী গাছে ভর্তি। সম্বর হরিণও খেতে আসত আমলকী। একটা নালাও ছিল। সেইখানেই লাল তিতুলি দেখেছিলাম। 'কোজাগরের' লাল-তিতুলির ব্যাপারটা তখনই মাথায় আসে।

বনের মধ্যের আদিমতার গভীরেই অতিপ্রাকৃত কিছু থাকে। আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু এরা করে। ওরা, বন-জঙ্গলের মানি, মুহুরী, পারশনাথ আর বুলাকিরা। যারা জঙ্গলেই থাকে তাদের অনেক কিছুই বিশ্বাস করতে হয়। আমাদের মতো শহুরে লোকেদের কাছে যা ঠাট্টার ওদের কাছে তা নয়। এটা হৃদয় দিয়ে বোঝার ব্যাপার। যুক্তি বা তর্কের এক্তিয়ার সব জায়গাতে খাটে না।

পথের দুধারে বেল গাছ। ছোট ছোট বেল ধরেছে। শিশু, শাল, সেগুন, পন্নন, পঁইসার, চিলবিল; ঢেণ্ডা গাছগুলোর সাদা কাণ্ড আর শাখাপ্রশাখা চাঁদ উঠলে কী সুন্দর দেখাবে তাইই ভাবছিলাম। টিয়ার ঝাঁক চলেছে দ্রুত বেগে: বুলবুলি, মুনিয়া, র‍্যাকেট টেইলড ড্রঙ্গো, থ্রাশার; ব্যবলার। সন্ধে হয়ে আসছে। কত পাখি। পাখিরা সব তৈরি হচ্ছে রাতের জন্যে।

বাবলুর হাঁটার অভ্যেস একেবারেই নেই। হাঁফাচ্ছিল: তার মধ্যে আবার একটা সিগরেট ধরাল।

মানা করলাম। বললাম, কখনও হাঁটতে হাঁটতে বা চড়াই উঠতে উঠতে খেয়ো না। পারলে, একেবারেই ছেড়ে দাও।

www.BanglaBook.org

আপনাকে তো আজকাল পাইপ খেতে দেখি না। বাবলু উল্টে বলল, আমার কথায় কর্ণপাত না করে।

ছেড়ে দিয়েছি তো। বেলভিউতে ছিলাম পাঁচ বছর আগে দিন পনেরো। ডাক্তার বক্সী বললেন, ইস্‌কিমিয়া অ্যানজাইনা। পারবেন স্মোকিং ছাড়তে?

না পারার কি?

বেলভিউ থেকে ফিরে আর পাইপ খাইনি। বাইশ বছরের অভ্যেস।

একেবারে খান না? লেহ্ লট্‌কা। আপনি মাইরি ভগবান!

তারপরই বলল, তার বদলে অন্য কিছু?

অন্য কি? পান খাই এখন। জনগণের নেশা। জর্দাও।

যাঃ চলে। সে তো আরও খারাপ হল। ফ্রম্ দ্যা ফ্রাইং প্যান টু দ্যা ওভেন্। লেহ্ লট্‌কা।

তা যা বলেছ। এটিকে ছাড়া দরকার। তোমার বৌদি আর আমার মেয়েরা বড়ই রাগারাগি করে।

করুক না। সব ছেড়ে দিলে পুরুষ বাঁচে। আজকাল হুইস্কি খান না?

মাঝে মধ্যে খাই। রোজ নয়। এটাও ছেড়ে দেব ভাবছি।

লেহ্ লট্‌কা। তালে তো আপনার রক্ষিতা রাখতে হবে মাইরি লালাদা। সে তো বিশেষই ঝামেলার। যা করে যাচ্ছেন করে যান। ফট্ করে ছেড়ে দিলেই টেঁসে যাবেন। গেল না, সেই আমদের ডি. এস. পি. সিনহা সাহেব। বুঝলেন কী না লালাদা, যার হচ্ছে যেমন গড়ন। সেই গড়ন-পেটন মতোই চলা উচিত। যে মোটা সে মোটা, যে রোগা সে রোগা। যে মাল খায়, সে খায়। যে হাঁটে আপনার মতো সে হাঁটে। আমি যদি হঠাৎ একদিনে ছিপাদোহরে হেঁটে যাই তো ওখানে আমার ডেডবডিই না পড়বে গিয়ে ধপ্পাস্ করে। লেহ্ লট্‌কা।

বললাম, সেটা ঠিক। হঠাৎ কিছু না করাই ভাল।

হঠাৎ বাবলু দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, এই যে দেখুন লালাদা গত সপ্তাহের বুধবার ঠিক এইখানে বাঘটাকে দেখেছিলাম।

লেপার্ড না টাইগার?

টাইগার। তালে আর বলছি কি? বললাম না আপনাকে লাহিড়ী সায়েবের বাচ্চার কথা? সেই বাচ্চাদেরই একটা। কেয়া পেল্লায় চেহারা। কে বলবে যে বাচ্চা নাকি তার মায়ের সঙ্গে, বোনেদের সঙ্গেও ইয়ে করে? কোনো বাছবিচার নেই। রিয়্যাল বাস্টোত শালারা।

অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বললাম, সেটা ঠিক। লাহিড়ী সাহেব ঠিকই বলেছেন। মানুষ ছাড়া কোনো জানোয়ারেরই এ সব নেই। ইয়ে-টিয়ের ব্যাপারে।

লেহ্ লট্‌কা।

বাবলু জেনুইনলি অবাক হওয়া গলায় বলল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর একটু এগিয়েই ডানদিকে একটা নালা দেখিয়ে বলল, মনে আছে লালাদা ? এই জায়গাটা ?

কি ? না তো ?

ঐদিকে তাকাতে গিয়েই আমার চাঁদে চোখ পড়ে গেল। অষ্টমীর চাঁদের সূর্য যাওয়া অবধি যেন তর সইছে না। শালবনের মাথায় মেলে ধরেছে রুপোর থালা। আর ঠিক সেই সময়ই পশ্চিমাকাশে লাফ দিয়ে উঠল ধ্রুবতারা একটা মস্ত শিমুলের মাথা ছুঁয়ে।

মনে মনে বললাম, বাঃ।

মনে নেই ?—বাবলু বলল আবার।

না।

এইখানেই সেবার সেই মস্ত গাই-বাইসনটাকে দেখে সরজুনারায়ণ বলেছিল না, দুধ দুইবে ? কত সের দুধ দেবে কে জানে ? বলেনি ? হিঃ। হিঃ।

ওহো !

মোহন বিয়ে করায় বেচারা একটু অসুবিধেয় পড়ে গেছে মনে হচ্ছে। চেহারাই দেখায় না। স্বাভাবিক।

দূর থেকে দেখা গেল জিপটা দাঁড়িয়ে আছে। রমেনবাবু তার পাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। রমেনবাবুর জিপের ড্রাইভার সিংও নেমে দাঁড়িয়ে আছে।

কাছে পৌঁছতেই রমেনবাবু বললেন, আপনার মাথায় পোকা আছে লালাদা।

বললাম, আছে।

বাবলুকে বললেন, তোর যদি কিছু হয় তাহলে আমি কিন্তু রাত-বিরেতে ডাক্তারের কাছে যেতে পারব না।

থামো তো রমেনদা। বড়া বকোয়াস হচ্ছে। আমার মা-বোন সকলে তো বেঁচে আছে না কি ? তোমার ভরসাতেই আছি শুধু ?

বাবলুর বাড়ি মোহনের বাড়ির পাশেই। ছোটবেলা থেকেই জানাশোনা। পড়শি। দোস্তও।

রমেনবাবু বললেন, নে, বেশি বকবক না করে পান বের করে খা একটা। মুখ তো শুকিয়ে গেছে। লালাদাকেও দে।

আমার কিন্তু মুখ শুকোয়নি।

না হলেও, খান তো পান।

বাবলু বলল, পিলাপাত্তি জর্দা নেই কিন্তু। কালা পাত্তি।

ওতেই হবে। বললাম, আমি।

পান মুখে দিয়ে জর্দা ফেলে আমরা যখন ছিপাদোহরের কাঁচা রাস্তাতে এগোলাম তখন সন্ধে হয়ে এসেছে। একটু যেতেই ড্রাইভার সিং বলল, বাবু আসছেন। রিয়ারভিউ মিররে ও দেখে থাকবে মোহনের গাড়িকে। দেখেই,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জিপ, দাঁড় করিয়ে দিল। পিছন থেকে একটা কালো এয়ারকন্ডিশনড ফিয়াট এসে দাঁড়াল। কিষুণ নামল গাড়ি থেকে। মোহন নয়। এখন কিষুণের অলিভ-গ্রিন রঙা পোশাক। মাথায় চুল লাদা। উন্নত নাসা, প্রশস্ত কপাল। দরজা খুলে বলল পরর্‌নাম হুজোর। বাবু কেঁমে ইন্তেজার কর রহা হ্যায়।

তারপর বাবলুকে বলল, আপ ছিপাদোরসে মুসলিমকে লেতে আইয়ে বাবলুবাবু। বাবু বলিন্।

আমি বললাম, তুমি ফিরে যাও কিষুণ। রাস্তা খুবই খারাপ। আমরা ছিপাদোহর হয়ে কেঁড়-এ যাচ্ছি।

মুসলিম পাঁচ বছর থেকে আমাকে একটা বাঁশের লাঠি দেবে বলে আসছে। আজকে সেটাকে নিয়ে তবে ছাড়ব। সকালে অবশ্য বলে গেছিল যে বানিয়ে রেখেছে।

ছিপাদোহর থেকে ঘুরে যখন কেঁড়-এ এলাম তখন চাঁদের আলোয় ভরে গেছে চারদিক। বংলোর বারান্দার সামনে নিচে জ্যাকারান্ডা গাছগুলোর তলাতে মোহন বসে আছে। চা খাচ্ছে। সঙ্গে শ্যামল সরকার। এখানে আগে বাঁশের ও কাঠের ব্যবসা করত নাকি। আলাপ করিয়ে দিল মোহন। এখন দমদমে কাঠ-চেরাই কল করেছেন। ভাল ব্যবসা করছেন। মোহন সকলকেই খাতির করে। কিন্তু নিজে মদ খায় না। পান খায় না। নেশার মধ্য ফাইভ-ফাইভ-ফাইভ সিগারেট আর গাড়ি। আমাকে পাঠিয়েছিল এয়ার পোর্টে সাদা ফিয়াট। আজ এসেছে কালো ফিয়াটে। কিষুণ বলল, তিনটে মারুতি, আর তিনটে কন্টেসা নিয়েছে নতুন। আরো অনেক ফিয়াট, অ্যাম্বাসাডার এবং জিপ তো আছেই। ওর পার্সোনাল জিপও এয়ার-কন্ডিশনড। গাড়ি পাগল একেবারে।

মোহন বলল, লালাদা আপনার জন্যে একটা চিভাস-রিগ্যাল এনেছি। এদের দেবেন না। এটা আপনার।

তারপর বলল, কি বাবলু? গাড়িতে একটা জনিওয়াকার রেড লেবেল আছে, এনে শুরু করো।

আমি বললাম, আমার কাছে এখনও আছে। সেটা শেষ করুক ওরা। আমার শরীরটা ভাল লাগছে না।

কি করে লাগবে?

রমেনবাবু বললেন। তারপর মোহনকে রিপোর্ট করলেন, আজ সকালে চার মাইল রোদে কুটুমুর মোড় অবধি আর বিকেলে ছিপাদোহরের মোড় অবধি হাঁটা। একদিনে সহ্য হয়? অভ্যেস থাকলে তাও কথা ছিল। একটু রইয়ে সইয়ে না করবেন!

ওরা ওদের ইন্তেজাম করে নিল।

মোহন বলল, কাল একটু দিল্লি যাচ্ছি লালাদা। আপনি থাকতে থাকতেই ফিরে আসব। ব্যাঙ্কক থেকে একটা রয়্যাল স্যালুট নিয়ে এসে-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছিসাম। আপনাকে পাঠিয়ে দেব কাল।

বললাম, তা দিও। কিন্তু রয়্যাল স্যালুটটা নিয়ে যাব সঙ্গে করে। কলকাতায় কোনো বিশেষ অকেশনে খাব। একি এখানে নষ্ট করা যায়?

মোহন বলল, আপনার যা খুশি করবেন। পাঠিয়ে দেব।

এমন আতিথেয়তা মোহনই করতে পারে। রয়্যাল স্যালুট ব্যাঙ্কক এয়ারপোর্টের ডিউটি-ফ্রি শপ্-এ কত নিয়েছিল জানি না। কলকাতার দোকানে পাওয়া যায় না। কোনো জায়গা থেকে জোগাড় হলে বারোশ থেকে পনেরোশ টাকা দাম। তাও খাঁটি কিনা তার স্থিরতা নেই।

আমার শরীরটা ভাল লাগছিল না। ওরা যখন চলে গেল রাত নটা নাগাদ তখন আরো খারাপ লাগতে লাগল। মুরগির রোস্ট আর রুটি করেছিল তওহি। খেতে ইচ্ছে করল না। একটুকরো রুটি খেলাম একটু মুরগি দিয়ে। গা গোলাচ্ছিল।

রামলগনকে বললাম ড্রয়িং-কাম-ডাইনিং রুমে শুতে রাতে। যদি কোনো দরকার হয়। তারপর বাইরের বারান্দাতে চেয়ার নিয়ে বসে রইলাম অনেকক্ষণ। চাঁদনী রাত বলে কেঁড় গ্রামের ঘরগুলির সামনে অনেকে চৌপাই পেতে বসে আছে। মাদল বাজাচ্ছে কারা। বাংলোর বারান্দা থেকে অনেকটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে বাংলোর পেছন দিকটা। আসলে একটা পাহাড়ের মাথাতেই বাংলোটা বানিয়েছিলেন সাহেবরা। গাছগুলো কোন উর্বর ফরেস্ট অফিসারের বুদ্ধিতে লাগান হয়েছে জানি না। তবে একগাদা অল্পবয়সী পেয়ারা গাছ সামনেটাকে ঝুপড়ি করে রেখেছে একেবারে। পুবের ঘরের গা থেকে দুটি ঝাঁকড়া কাঁঠাল গাছ। বাংলোর সামনেটা আর পুব দিকটা ঘুপচি হয়ে গেছে। এখন পশ্চিমেও নতুন বাংলো উঠেছে। লোকে শহরের ভিড় থেকে এসে যে চারদিকে একটু খোলা প্রকৃতি দেখবে তারও উপায় রইল না।

মনে পড়ে গেল আমারও। সে অনেক দিনের কথা। তখন মোহনের বাড়িতে সূর্যবাবুর গতায়াত ছিল। আরও অনেকের। মোহনও ব্যাচেলর ছিল। ব্যাচেলরদের অনেক স্বাধীনতা। এদের দলেরই ছিল মোহন—এই কিছুদিন আগেও দেখেছি বাংলোর পশ্চিমের লাগোয়া জমিতে মিসেস অ্যান্ রাইটের একটি ক্যারাভান পড়েছিল অনেকদিন। তাঁবুও ফেলতেন প্রতি বছর শীতকালে। বিদেশী ট্যুরিস্টদের নিয়ে আসতেন। ভাল ব্যবসা ছিল। গত বছর পুজোর ঠিক পরই মধ্যপ্রদেশের কান্হাতে গিয়ে দেখি তাঁর ল্যান্ড রোভার হাঁলো নদী পেরিয়ে আসছে। ড্রাইভারকে জিগ্যেস করে অনুমান যে ঠিক তা বোঝা গেল। কান্হা-কিস্লিতেই এখন ডেরা করেছেন উনি।

মিসেস অ্যান্ রাইট আর তাঁর স্বামী মি. বব রাইট, যখন তিনি অ্যান্ড্রুইউল কোম্পানিতে ছিলেন; তখন প্রায় প্রতিবছরেই এই অঞ্চলে শিকারে আসতেন মোহনের বাবার অতিথি হয়ে। বিভিন্ন বাংলোয় থাকতেন। মিসেস রাইট-এর সঙ্গে জন বলে একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ভদ্রলোককেও একবার দেখেছিলাম মনে পড়ে। শুনতে পাই মিসেস রাইট্ এখন ওয়ার্ল্ড

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ড-এর একজন হর্তাকর্তা। মি. বব রাইট টালিগঞ্জ ক্লাবের রেসিডেন্ট ম্যানেজার বা ঐরকম কিছু। ওঁরা কয়েক বছর আগেও থাকতেন আমাদের বালিগঞ্জ পার্ক-এর ফ্ল্যাটের পাশের বাড়িটিতে। এখন চা-বাগানের মালিক কানোড়িয়ারা কিনে নিয়েছেন সে বাড়ি।

দূরের প্রান্তরে হট্টিটি— হুট্-টি-টি-টি-হুট্ করে একলা টিটি পাখি ডাকছে। ছম্‌ছম করছে বনজ্যোৎস্না। একটা কোটরা হরিণ ছিপাদোহরের দিকের পথ থেকে ঘাউ ঘাউ করে ডেকে উঠল। কে জানে লাহিড়ী সাহেবের কোনো বাচ্চার সঙ্গে দেখা হল কী না তার?

মহুয়ার গন্ধ ভাসছে হাওয়ায়। বিকেলে হেঁটে যাওয়ার সময় করৌঞ্জের গন্ধ পেয়েছিলাম। ছিপাদোহরের পথে আছে। হাওয়ায় হঠাৎ হঠাৎ তাদের গন্ধও ভেসে আসছে।

সবই ভাল। শরীরটা ক্রমশ বেশি খারাপ লাগছে। বমি বমি পাচ্ছে। পেটে একটা ব্যথা। জ্বর জ্বর ভাব। তারপরই পেটের গোলমাল।

ঘরে গিয়ে শুলাম বটে পশ্চিমের ঘরে, কিন্তু সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা আর জ্বর। দুপুরে যখন চৌপাইয়ে গা এলিয়ে দিলাম, রামলগন তখনই একবার গা-হাত-পা দেবে দিয়ে গেছে। বলেছিল, বেত্‌লা যাবে রাতে, সেখানে পার্টি আছে। ফরেস্টারবাবু রিটায়ার করছেন, তাঁর ফেয়ারওয়েল পার্টি। দুটি টাকা চাই বাস ভাড়া। ওকে পাঁচ টাকা দিয়েছিলাম। রমেনবাবু শুনে বলেছিলেন ও সবসময় মহুয়া খেয়ে চুর হয়ে থাকে ওকে হুট্-হাট্ টাকা একদম দেবেন না। যা দেবার, যাবার সময় দেবেন। রামলগন মানুষটার মুখটাতে একধরনের জংলী সারল্য আছে। পূর্ব আফ্রিকার সেরেঙ্গেটির মধ্যে ডুটু সাফারি লজ-এ একজন নিগ্রো বেয়ারাকে দেখেছিলাম, তার নাকে দড়ি-দিয়ে-বাঁধা চশমা। মুখে, দেবসুলভ নির্লিপ্তি ও প্রশান্তি। দারিদ্র্য তাকে সহস্র আঙুলে অকটোপাসের মতো জড়িয়ে থেকেও একটুও ছুঁতে পারেনি। তার কথা আফ্রিকার ভ্রমণ-কাহিনী 'পঞ্চম প্রবাসে' লিখেওছি। আমাদের রামলগনও অনেকটা সেরকম। অন্তত মুখের ভাবে। রামলগনের গড়নটাও নিগ্রোদেরই মতো। দুটি সুগঠিত হাত নেমে গেছে হাঁটুর নিচ অবধি। অলিভগ্রিন রঙের একটি ট্রাউজার এবং গোলাপি গেঞ্জি পরনে। কেউ দিয়ে গেছিল হয়তো। একবার ডাকলেই মাটি ফুঁড়ে হাজির। খিদমদ্‌গার একেই বলে!

রামলগন রাতে পার্টি না করতে গেলেই ভাল হত। সারা শরীরে যন্ত্রণা, হাতের তেলোতে পায়ের পাতায় আগুন। জ্বর। শীত। কম করে দশবার বাথরুমে যেতে হল। রাত যখন ভোর হয় হয় তখন ঘুমোলাম একটু। পশ্চিমের ঘর, রোদ আসে দেরিতে। ঘুম ভাঙাল রামলগনই এসে।

বলল, হুজৌর, চায়ে লাউ?

কোনোরকমে চোখ খুলে মাথা নাড়লাম।

রামলগন অনেকক্ষণ চোখের দিকে চেয়ে রইল। দরদের সঙ্গে বলল,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তবিয়ৎ গড়বড়া গিয়া হুজৌর। ম্যায় চায়ে লেকে আভ্‌ভি আয়া। ঔর দাবু দেতা হ্যায় আকে।

রামলগন যে কী যত্ন করে গা-হাত-পা টিপে দিল কী বলব। চা খেলাম। মুখ বিস্বাদ। তবে গায়ের ব্যথা যেন কমল একটু।

এ বারের আসাটা হয়তো শুভক্ষণে হয়নি। কী জানি কী আছে কপালে বাকি কটি দিনে।

কেঁড় ১।৪।৮৫

তওহি এসে বলল, নাস্তা কেয়া বনাউ হজৌর?

কুছ্ নেহী।

কুছো নেহী?

নহী।

দোপহরকে খানা?

আভভি বাতানা নহী শকতা। তবিয়ৎ বহত্ই খারাপ হ্যায়।

মাঠ্‌ঠা মাঙ্গাউ হজৌর? মাহাতোকে ঘর সে?

মাঙ্গাও। লাস্যি বানা দেনা মাঠ্‌ঠা দে কর্।

গণেশরাম ড্রাইভার চলে গেল পায়ে হেঁটে মাঠ্‌ঠা আনতে। রাতে একবার আমার ঘরে ঢুকে বলেছিল হামলোগোকা বাবু যেইসে গার্জিয়ান হ্যায় হামলোগোকা। আপ্‌ভি ঐসিহি গার্জেনহি হ্যায়।

তখন ওর মুখে মহুয়ার গন্ধ পেয়েছিলাম। মাঠ্‌ঠা জোগাড়ে ওর উৎসাহ দেখে সন্দেহ হল ও তারই সঙ্গে মহুয়াও জোগাড় করবে।

আমার মনের ভাব বুঝেই তওহি সসম্ভ্রমে বলল, বাবু গণেশরামের সঙ্গে বাবু জগজীবন রাম এর কী রকম আত্মীয়তা আছে যেন লতায় পাতায়।

হবে। নাও হতে পারে। নামকরা লোকের এত আত্মীয় ও "ভেরী গুড ফ্রেন্ড অফ মাইন" বেরিয়ে পড়ে যে, নামী লোকেদের পক্ষে তাদের নব্বুই ভাগকেই চেনা সম্ভব হয় না। "এইটাই ঘটনা" বীরেনদার ভাষায়।

মুখ চোখ ধুয়ে আমি বারান্দাতে এসে বসলাম ইজিচেয়ারে। রাজমিস্ত্রি আর কামিনরা কাজে এসে গেছে। নতুন বাংলো বানাচ্ছে তারা। ফরেস্টার, সুদর্শন, বাবু রাজিন্দর সিং রোজ কল্ করছেন।

www.BanglaBook.org

সুরাতীয়া ? জী হুজৌর।
লল্য়াইয়া ? জী হুজৌর।
রুক্মানিয়া ? জী হুজৌর।
ইতোয়ারিন্ ? জী হুজৌর।
বিস্পাতিয়া ? জী হুজৌর।
মুন্নী ? জী হুজৌর।

মেয়েগুলো মোটুসী পাখির মতো রিনরিনে স্বরে জবাব দিচ্ছে। কেউ মাটি বয়ে আনছে, ভরাট করতে ভিত। কেউ বা আনছে ইঁট। কেউ সিমেন্টের থক্থকে মশলা। কথা বলছে, খুনসুটি করছে, গানও করছে মধ্যে মধ্যে। নতুন বাংলো বেড়ে উঠছে দেখতে দেখতে। শশিকলার মতো। ঘর, বাথরুম, বারান্দা। এর পরের বার এলে আর পশ্চিমে কিছুই দেখা যাবে না এই বাংলোর পশ্চিমের ঘর থেকে।

ঝিরঝিরে হাওয়া ছেড়েছে একটা। মিষ্টি। মহুয়ার গন্ধ মাখা। প্রতিটি মহুয়া গাছতলায় অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে এবং বুড়িদের ভিড়।

'বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া আসে মৃদুমন্দ।
আনে আমার মনের কোণে সেই চরণের ছন্দ॥
স্বপ্নশেষের বাতায়নে হঠাৎ-আসা ক্ষণে ক্ষণে।
আধো-ঘুমের প্রান্ত-ছোঁওয়া, বকুলমালার গন্ধ॥
বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া…'

বৈশাখের আর তো কদিন বাকি। চৈত্র শেষের হাওয়া আর বৈশাখের ভোরের হাওয়া একই রকম। কী যে এক আমেজ, রাতের স্নিগ্ধতা, ভোরের পাখির ডাক আর বনের গন্ধ-মেশা এই হাওয়ার মতো ঘুমপাড়ানী কোনো ওষুধ বুঝি আর নেই। রাত-জাগা আমি তাই বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে ঘুমিয়েই পড়লাম।

পুবের রোদ আস্তে আস্তে ছড়িয়ে যাচ্ছে সব দিকে। সূর্য, প্রতি সকালের মতো শূন্য সাঁতরে উপরে উঠছে। মুখে রোদ এসে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে রামলগনের খসখসে পায়ের আওয়াজ শুনলাম বারান্দার মেঝেতে।

হুজৌর।

চোখ খুলে দেখি মাঠ্ঠা দিয়ে বানানো লস্যি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রামলগন। তার পেছনে পাটভাঙা পায়জামা পাঞ্জাবি পরা বাড়-হাপিস্ গণেশরাম।

গণেশরাম চোখ কুতকুত করে বলল, দাবাইয়ে মাঙ্গাউ হুজৌর ?

কাঁহাসে ?

গাড়ীসে। নেহী তো ছিপাদোহরসে ? আপে অর্ডার কিজিয়েগা তো ডালটনগঞ্জহি চল্ দেগা আভ্ভি, জিপোয়া তো হ্যায়িই হ্যায় পড়া।

ভেবে বললাম, রমেনবাবু বাবলুবাবু তো আহি যায়গা জারা বাদ। উঠ্ঠো তুম্ কাহে যায়েগা।

www.BanglaBook.org

যেইসা কহিয়েগা।

উনলোগোকো আনে দেও।

যেইসা কহিয়েগা হজৌর।

লস্যির গ্লাস খালি করে দেওয়ার পর নিয়ে গেল গ্লাস রামলগন।

গণেশরাম বলল, আপ শোচ লীজিয়ে গার্জেনহী হ্যায় হামলোগোকা।

আবারও গন্ধ পেলাম ওর মুখে।

মোহন জানতে পেলে চাকরি চলে যাবে বেচারার। তবে দোষ কি? ও তো ছুটিতেই আছে বলতে গেলে আমারই মতো। আমরা যদি ছুটিছাটাতে একটু মজা করি তাহলে ওদের দোষ দিয়ে লাভ কি?

বারান্দায় রোদ এসে পড়েছে। সকালবেলার মিষ্টি ভাবটাও আর নেই। একটু পর সূর্য মধ্যগগনে এলে পশ্চিমের ঘর গরম হয়ে যাবে। দুপুর ও বিকেলটা ঠাণ্ডা থাকে পুবের ঘর। তাইই পুবের ঘরে এসে শুলাম। পাশাপাশি দুটো খাটে বিছানা লাগানোই ছিল। শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রামলগন এসে বলল, দাব্ দে হজৌর?

দাবো।

আঃ। কী আরাম! সারা গায়ে হাত পায়ে কী যে ব্যথা। বড় ভাল গা হাত পা টেপে রামলগন আমার লক্ষ্মণেরই মতো। সত্যি কথা বলতে কি লক্ষ্মণের চেয়েও ভাল টেপে রামলগন। খারাপ লাগে অন্য কোনো মানুষকে দিয়ে পা টেপাতে। টেপা শেষ হলে উঠে; যে টেপে তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে ইচ্ছা করে। কিন্তু আমরাই শেষ প্রজন্ম এবং এই রামলগন লক্ষ্মণ এরাও শেষ প্রজন্ম; শুধুমাত্র ভালোবাসার জোরেই কাউকে গা-পা টিপতে বলি এবং অন্য পক্ষ তাঁদের সম্মানের বিন্দুমাত্র হানি না ঘটিয়েই স্বাভাবিকভাবেই সেই অনুরোধ রাখে। অথবা অনুরোধের অপেক্ষা না রেখে নিজেদের ভালোবাসা বা শ্রদ্ধার তাগিদেই তা করে।

"রাজা সবারে দেন মান, সে মান আপনি ফিরে পান।" যে মান দিতে জানে অন্যকে, তাকে কেউই অপমান করে না। ব্যাপারটা যুক্তি বা তর্কের নয়, অনুভবের; আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গীর।

এই বাবদে মনোজের তুলনা নেই। সিঙ্গুরের মনোজ চ্যাটার্জী। পূর্ণ পাধার শাগরেদ। পূর্ণ কোল্ড স্টোরেজের মালিক। কোটিপতি লোক। মনোজও তার ডিরেক্টর। সেও কোটিপতি না হলেও লাখপতি তো বটেই। ব্রাহ্মণ-সন্তান। গ্রাজুয়েট। যখনই আমি নিজে গাড়ি চালিয়ে হঠাৎ নিরুদ্দেশের যাত্রায় বেরিয়ে পড়ি মনোজ একদিনের নোটিশেই সঙ্গী হয়। গাড়িও দারুণ চালায়। গাড়ি চালানোর ব্যাপারে খুবই খুঁতখুঁতানি আমার। সত্যিকারের ভাল ড্রাইভার না হলে তার গাড়িতে চড়ে সুখ হয় না আমার। নিজের হাতের গাড়িতে তো হাত ছোঁয়াতেই দিই না অন্যকে। মনোজ আর পূর্ণ দুজনেই চমৎকার গাড়ি চালায়। তবে গাড়ি চালানো কাকে বলে তা শিখতে হয় মোহন বিশ্বাসের কাছে। গাড়ির উপর কন্ট্রোল অনেকেরই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আছে। র‍্যালিতে চ্যাম্পিয়নও হন অনেকে—যেমন আমার দুই ভাই। কিন্তু রাস্তা বুঝে, পাঠা এবং মানুষ উভয়ের প্রাণকেই সমান মর্যাদা দিয়ে, গাড়ির স্বাস্থ্যের প্রতি সুনজর রেখে ঠিক গিয়ারে গাড়ি চালাতে বেশি লোককে দেখি না। পুরনো দিনের লোক বলেই হয়তো প্রত্যেক কোম্পানির গাড়ির ম্যানুয়ালে যে স্পিড যে গিয়ারের জন্যে নির্দিষ্ট আছে তা মেনে আমি কপিবুক-ড্রাইভিং-এ বিশ্বাস করি। আমার গাড়ি-বিশেষজ্ঞ চ্যাম্পিয়ান ভাইয়েরা মুলা ও বাবুয়া আমাকে নিয়ে হাসে। ঋতুও হাসে। হাসাটা অন্যায়ও নয়। কারণ গাড়ি খারাপ হলে তার পেছনে 'আব্রাকাডাব্রা' বলে তিনবার লাথি মারা ছাড়া আর কিছুমাত্রই করতে পারি না। কোনো কারণে শর্ট-সার্কিট হয়ে হর্ন একটানা বাজতে থাকলে আমি বনেট খুলে লাফাতে থাকি। আমার দ্বারা এসব কঠিন ব্যাপার-স্যাপার কিছুমাত্রও হয় না। তাছাড়া গাড়ির টায়ার বদলানো, ছিঁড়ে-যাওয়া ফ্যানবেল্ট লাগানো, এসব আমার কাছে অতি মানডেন্ কাজ বলে মনে হয়। ঠাট্টা বিদ্রূপ গালাগালি সবই সই। তবু, আমি ওসব করতে রাজী নই। আমার হাতে স্টিয়ারিং থাকলে ওসব অঘটন ঘটেই না। ঘটলেও রাত-বিরেতে, জঙ্গলে-পাহাড়েও ঠিক সময় মতো ওসব করবার লোক জুটেই যায়। ঈশ্বর সহায় আমার, কার পরোয়া করি?

কোন কথা থেকে কোন কথায় এসে গেলাম। মনোজের কথা মনে পড়েছিল এই জন্যে যে সেই শিক্ষিত ব্রাহ্মণ সন্তান দাদাজ্ঞানে আমাকে যখন তখনই সহিস যেমন ঘোড়াকে দলাই মলাই করে তেমন করে দলাই মলাই করে। রামলগনেরই মতো ভাল পারে ও। এই ঋণ, কৃতজ্ঞতা; স্বীকার না করলেই হয়। মনোজ মহৎ বলেই খুশি হয়ে এমন করতে পারে। শিক্ষার মিথ্যা অহমিকা যাদের আছে তাদের পক্ষে নিজের দাদা তো দূরস্থান, বাবার পায়েও হাত দিতে লজ্জা হয় দেখি। এমন শিক্ষিততেই দেশ ছেয়ে গেছে আজকাল।

পুবের ঘরে শুয়ে আছি। রমেনবাবু ও বাবলুদের আসতে এখনও অনেকই দেরী। কাঁঠাল গাছের ঘন গভীর পাতার আড়ালে বসে বুলবুলি শিস দিচ্ছে ফিসফিস করে। এমন সময় রামলগন এসে বলল, রামধানীয়া চাচা এসেছে আপনি এসেছেন শুনে।

ধড়মড় করে উঠে বসলাম খাটে। বুড়ো আরও বুড়ো হয়ে গেছে। মুখের রঙটা লালচে। দাঁড়ি গোঁফ রেখেছে। মাথায় গামছার পাগড়ি। রোদে হেঁটে এসেছে, কষ্ট হচ্ছে। রামলগনকে বললাম, তওহিককে বলো একটু চা করে দেবে চাচাকে আর বিস্কিট। এর কথা আমি 'কোজাগর'-এ লিখেছি। যদিও আসল নামটি চাচার অন্য। থাকেও কেঁড় থেকে অনেক দূরে। ফরেস্ট গার্ড-টার্ড কারো মুখে শুনে থাকবে আমার আসার কথা।

বললাম, একটু গান টান হবে না চাচা?

বুড়ো হাসল।

বুড়োরা সত্যি সত্যিই বুড়ো হলে শিশুর মতো সুন্দর হয়ে যায়। সব

www.BanglaBook.org

লোভ, কামনা, বাসনা, সব তাপ জ্বালা মরে গিয়ে মুখে কিছুক্ষণ আগের সকালবেলার স্নিগ্ধতা ফুটে ওঠে। বুড়োবুড়ীদের মুখে শিশুর মুখেরই মতো আমার চুমু খেতে ইচ্ছে করে।

চাচা হাসল।

কী গান?

সারহুল্-এর গান শোনাও।

সারহুল্।

বলে, বুড়ো ঘরের খোলা দরজা দিয়ে বাইরের হাতা, জঙ্গল, পাহাড়, উপত্যকার দিকে চেয়ে থাকল। মনে হল, তার দুটি চোখ শক্তিশালী ক্যামেরার মতো অনেক ফেলে-আসা বছরের, তার কৈশোরের, যৌবনের, সারহুল উৎসব-গুলিকে 'জুম-ইন্' করে নিয়ে এল মস্তিষ্কের মধ্যে। তার পাকা মহুল ফুলের মতো মুখে এক ধরনের প্রচ্ছন্ন, স্মৃতিধৌত হাসির ছবি ভেসে এসে মুখের ফ্রেমে আটকে গেল।

বুড়ো শুরু করল, প্রথমে বিড় বিড় করে, পরে জোরে।

অযোধ্যামে রামজী জনম্ লেল্
ঔর তিনোলোক আনন্দ হ্যায়
গান্ দেখ্লি কপিল গায়, সোনে রুপে চাঁওয়ার ঢুলে
রাম লছন ভাইয়া দুয়ো ভাই সঙ্গহেরে বেহলে বিহান
সীতা রাম রাম
কিষুণজী খেল্লে আহের···

বাঃ বাঃ। আমি বললাম। এখনও গলা কী সুন্দর তোমার।

আমি বললাম। শরীরের গ্লানির কথা ভুলে গিয়ে।

বুড়ো হাসল। বুড়োকে চুমু খেতে ইচ্ছে করল।

আরেকটা হোক।

কাহে কারণ ছলা আওয়ালে
কাহে কারণ ঘুর্ গিয়া···

অর্থাৎ, কী কারণে আসছিলে গো মরদ এদিকে, আর কী কারণেই বা ঘুরে চলে গেলে?

ছেলে বলল, বলব কী আর:

সাঁওরো কারণে ছেলা আওয়ে
ঔর তিরিয়া কারণ ঘুর্ গিয়া

অন্য একটি সুন্দরী মেয়েকে দেখেই তো এদিকে আসছিলাম কিন্তু তার কাছেই যেয়ে দেখি নিজের বৌ।

পালা। পালা।

হেসে উঠলাম আমি। পেটে লাগল হঠাৎ। ব্যথা হচ্ছে একটা। নাভির চারপাশে-যখন ব্যথাটা হচ্ছে তখন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। তবুও ভাল লাগল এই গান শুনে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আরো একটা হোক।

পেটে হাত দিয়েই আমি বললাম।

বুড়ো গাইল :

ঈ খোরিয়া ছোড়ে না, দুলারুয়া
দুশমন বৈরি হামার

মানে হচ্ছে, ছোঁড়াটা আমার পথ ছাড়ে না, আমার ভারী শত্রু হল তো এ।

ছেলেটা বলল :

'আইরে রে তোর লাগি সাঁওর হত্‌লী পরাণ
ছেলাওয়া'লাগে বাঁধা তলোয়ার

মানে এর নাইই বা জানালাম। অনুমান করে নিতে হবে, যদি এই ডাইরি কেউ পড়েন, তাঁকে। সব কিছু মুখে বলতে নেই, বলা উচিতও নয়।

আমার অবস্থা দেখে বুড়ো বলল, আমি গিয়ে চা খাই। তোমার জন্যে গাড়ু থেকে ওঝা আনব নাকি? এর আগেও তো এরকম হয়েছিল একবার মনে পড়ে না? চাঁদের দিনে এমন হয়ই। তোমার কানের ফুটো দিয়ে নাকের ফুটো দিয়ে চোখের তারল্যর মধ্যে দিয়ে চাঁদ ঢুকে গেছিল মাথাময়। হাড়ের মধ্যেও চাঁদ। এই চৈতি-চাঁদে জিন্‌-পরীদের মায়া থাকে। একা ফাঁকা জায়গায় বসেছিলে কি রাতে?

বুড়োকে উত্তর দিলাম না।

বুড়ো রামলগনকে ডেকে বলল, বাবুর পেটে কাড়ুয়া তেল আর জল মিশিয়ে ভাল করে মালিশ করো আর ঠাণ্ডা গামছা চেপে দাও পেটের উপর।

আমি বলতে গেলাম, চাঁদ নয় চাচা, সূর্য ঢুকেছে। সূর্য ঢুকলে বড় জ্বালা। লক্ষণ সবই হিট-স্ট্রোকের। একবার প্রথম যৌবনে হাজারীবাগের জঙ্গলে হয়েছিল।

রামধানীয়া চাচা চলে গেল রামলগনের সঙ্গে। বাবুর্চিখানায় চা-টা খেল। আমি ঘোরের মধ্যে ছিলাম। ব্যথাটা যখন ওঠে তখন হুঁশ থাকে না একেবারে। পেট থেকে বুকের বাঁ দিকে উঠে আসতে থাকে। কিছুক্ষণ পর রামলগন বাটি করে কাড়ুয়ার তেল আর জল মিশিয়ে আমাকে চিৎ করে শুতে বলে পেটে মালিশ করতে লাগল। একটুক্ষণ পরই আরাম লাগতে লাগল। ব্যথাও কমতে লাগল। রামলগন বলল, আপকো ধূপ লাগ্‌ গ্যয়া। পেটমে সুরজ ঘুষ গ্যয়া।

কোঁকাতে কোঁকাতে বললাম, হোগা।

কী ঢুকেছে সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা এইই যে, কষ্ট হচ্ছে ভীষণ। হাত পা জ্বালা করছে। কিছু খাওয়ার কথা মনে হলেই বমি পাচ্ছে।

এমন সময় বাইরে ডিজেলের জিপের শব্দ হল।

সুমনবাবু বললেন, লালাদা। এই যে আপনার রয়্যাল স্যালুট। মোহন পাঠিয়েছে। নিয়ে যাওয়ার জন্যে। আর একটা জন হেগ্‌। এখানে যদি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লাগে। আর আইস বক্স-এ বিয়ার, সোডা, ক্যাম্পাকোলা সব নিয়ে এসেছি। ভোদ্‌কা ফোদ্‌কা এখানে পাওয়া যায় না। দোকানি নামই শোনেনি। এখানে শুধু রাম, বিয়ার আর হুইস্কি।

এত কথা বলার পরও আমার জবাব না পেয়ে বললেন, হলটা কী?

হালত্‌ খরাব হজৌরকা।

রামলগন বলল।

রমেনবাবু কাছে এসে কপালে হাত দিলেন। তারপর চেয়ার টেনে পাশে বসে বললেন, দেখলেন তো! আমি আপনাকে বললুম, প্রথম দিনে এত বেশি জঙ্গল ভালবাসবেন না। আপনি বললেন, কোনো ব্যাপার নেই। দেখলেন তো কী ব্যাপার হল! এখন যে কদিন থাকেন যদি শুয়ে থাকেন তাহলে কেমন হবে? আপনারও মজা হবে না আমাদেরও গ্যাঞ্জাম্‌ হবে না। দিলেন সব মাটি করে।

আমি চুপ করেই রইলাম। হয়তো রমেনবাবুই ঠিক। কিন্তু হয়ে গেছে যা হবার।

পেটে খুব ব্যথা?

হুঁ।

কি খেয়েছেন?

কিছু না।

নাস্তা?

লস্যি খেয়েছি।

কাল ডালটনগঞ্জ থেকে ভাল দই নিয়ে আসব। টক দই অবশ্য। মেট্রোজেল খাবেন? পকেটেই আছে। জেলুসেল এম-পি-এস? খেয়ে নিন চারটে। ব্যথাট্যাথা সব সেরে যাবে।

আপনি সবসময় এগুলো খান না কি?

আমি? আমি ওসবের মধ্যে নেই।

বলে, ডান হাতে লাঠি ধরে বাঁ হাত নাড়লেন রমেনবাবু।

তারপর বললেন, এ সব হল বাবলু ব্যাটার জন্যে। পেট খারাপের মধ্যে কষা মাংস আর রুটি খাবে, হবে না? আমি এসব অ্যালোপ্যাথির মধ্যে নেই। সকাল বিকেল দু-চামচ চ্যবনপ্রাশ খাই। শীতকালে মধু দিয়ে খাই। কোনো গড়বড় সড়বর হলে আমি আমার কবরেজকে দেখাই। বুড়ো কবরেজ আছে তিওয়ারিজি। ফাস্ট কেলাশ! এখনও শরীরে ঘোড়ার মতো বল ধরি, বুঝলেন কী-না লালাদা!

তা ঘোড়া ছোটে কোথায়?

মিনমিন করে বললাম আমি।

ফোক্‌লা দাঁতে হেসে উঠলেন রমেনবাবু। চোখের কোণেও হাসি ঝিলিক মেরে গেল। বললেন, সে সব কথা বলার জন্যে নয়। সব ঘোড়ারই গোপন টাঁড় থাকে ছোটাছুটির জন্যে। সে সব সেই ঘোড়া আর টাঁড়ই জানে। কোনো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্যাপার নেই। আপনাকে বলতেও পারি। কিন্তু ভয় হয়, কখন কলমের মুখে কী বেরিয়ে যায়। বুঝলেন কী না, লেখকদের কলম হচ্ছে গিয়ে কুলখ-কলাই খাওয়া পেনিস্। কখন যে বেগে ধারা বয়ে যাবে কোন্ শালা বলতে পারে? আপনারা হচ্ছেন গিয়ে হাইলি ডেঞ্জারাস্ মাল। আপনাদের সঙ্গে বহুত বুঝে শুনে বাত্-চিত্ করা ভাল।

আমি উপমা শুনে ঐ যন্ত্রণার মধ্যেও হেসে ফেললাম।

বললাম, কলকাতায় ফিরে অন্য লেখকদের আপনার উপমার কথা বলব।

তা বলবেন। কোনো ব্যাপারই নেই। রমেন বোস-এর ভয়ডর বলে ব্যাপার নেই কোনো। কোনোই ব্যাপার নেই। তা খাবেন কি দুপুরে?

কিছু না।

সে কি? না খেয়ে থাকলে এই গরমে প্যাহেলয়ানদেরও অসুখ করে আর আপনি তো কোন ছার।

ইচ্ছে নেই খাবার।

তা বললে হবে কেন। আপনার জন্যে একটু গলা ভাত আর সেদ্ধ দিতে বলি। এখানে এই সময়টা তরিতরকারীর আকাল যায়। আলু, পটল, আর ঢ্যাঁড়স সিদ্ধ করতে বলি?

আপনারা?

আমাদের জন্যে ডিমের কারী করে দিতে বলছি। ডাল, ভাজা, আর ভাত।

রমেনবাবু উঠে গেলেন তওহিকে ফরমাস দিতে।

একটা জিপের শব্দ শুনলাম। বাবলু এল। বুঝলাম। তারপর রমেনবাবুর সঙ্গে এসে ঘরে ঢুকল।

বলল, লেহ লট্কা।

আমি হাসলাম।

বাবলু বলল, এক্ষুণি লাহিড়ী সাহেব আসছেন। বেত্লাতে দেখা হল। আসছেন আসলে এই নতুন কটেজ বানানোর তদারকি করতে। আপনার সঙ্গেও আলাপ করে যাবেন।

বললাম, কথা বলার মতোই যে অবস্থা নেই।

দু-চারটে কথা বলবেন। রাঁচীর ছেলে হচ্ছেন। খুব ভালবাসেন নিজের কাজ। এই তো কাল রাতে এক গ্রামে হরিণ মারার খবর শুনে সারারাত নিজে জিপ নিয়ে দৌড়োদৌড়ি করে সবার কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে এলেন।

কত বছর জেল হবে?

তা পনেরো বছর করে। এখন আইনকানুন বেজায় কড়া।

হুঁ। আমি বললাম।

এই তো সেদিন আমাদের এক বন্ধু ট্রাক ড্রাইভারের নিজের দোষেই···তার বিরুদ্ধেও মামলা ঝুলে রয়েছে। বেল্ও পায়নি সে। ভাল উকিল দিয়েছিলাম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমরা, তা সত্ত্বেও।

কি হয়েছিল ?

আরে, সইদুপ্ ঘাটের কাছে একটা মোড় যেই নিয়েছে সামনে এক ক্যালানে লেপার্ড। লেহ লট্‌কা। শালা, পালালে পালা। তা না যেন টাইগার প্রজেক্টের লেপার্ড বলে ফরেস্ট ডিপার্ট-এর সব রাস্তাও তারা কিনে রেখেছে।

তারপর কি হল ?

হবে আবার কি ? লোড-ট্রাক, একদিকে খাদ, একদিকে পাহাড় তার মধ্যে গদাই-লস্করী চালে চলা লেপার্ড, যা হবার তাইই হল।

চাপা দিল ?

চাপা ড্রাইভার দেয়নি। লেপার্ডটার বোধহয় কোমরে বাত টাত থেকে থাকবে। মজা টেপাবার জন্যেই তিনি পোজ মেরে দাঁড়িয়ে পড়লেন আর লেগে গেল ডানদিকের বাম্পারে। কেৎরে পড়ে গিয়েই এক লাফে পার।

ট্রাকের মাথায় যে কুলীরা ছিল তাদের মুখে খবরটা ছড়িয়ে গেল। ব্যাস্। পরের দিন লাহিড়ী সাহেব ঠুকে দিলেন কেস। সে তো ওঁর কর্তব্য। এমনিতে চমৎকার লোক। খুব ফ্রাঙ্ক আছেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জানিয়েও দিলেন। কোনো লুকো-চাপা নেই। বললেন, ড্রাইভারদের বলবেন, সাবধানে আস্তে গাড়ি চালাতে।

বললাম, ঠিক আছে।

লাহিড়ী সাহেবকে বললাম, আপনার ছেলেমেয়েদেরও বলবেন একটু সাবধানে রাস্তা পার হতে। মানুষের বাচ্চাদের মা-বাবাও তো একটু শাসন করেন। আপনি কিছুই বলবেন না আপনার পোষ্যদের তার আর কি হবে। ইচ্ছে করে কি কেউ বাঘের পোঁদে লাগে স্যার ?

লাহিড়ী সাহেব কি বললেন ?

হেসে বললাম।

কি বলবেন ? হাসলেন। মানুষটি খুব ভাল। পুজোর পর থেকে সারা রাত জিপ নিয়ে ঘুরে ঘুরে হাতি যাতে গ্রামের মানুষের ফসল না খায় তাইই দেখেন। এরকম গেম-ওয়ার্ডেন আগে কেউই দেখেনি। সব বস্তির লোকেরা সেই কথাই বলে। অনেস্ট হচ্ছেন সেন্ট পার্সেন্ট। জবরদস্ত নওজোয়ান।

কথা শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি পেট্রল-জিপের আওয়াজ হল হাতার মধ্যে।

ঐ যে এলেন লাহিড়ী সাহেব।

ঐ কটেজের কাজকর্ম তদারকি সেরে ভিতরে এলেন লাহিড়ী সাহেব। বারান্দায় বসলেন। আমিও উঠে গিয়ে বারান্দায় বসলাম।

নমস্কার।

লাহিড়ী সাহেব বললেন—নমস্কার। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম। কারণ আছে।

কি কারণ ?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেতলাতে যত ট্যুরিস্ট আসেন, তার বেশিই বাঙালি। আমরা একটা কোশ্চেনেয়র তাঁদের প্রত্যেককে হ্যান্ড-আউট করেছিলাম। তাঁদের মধ্যে নাইন্টী পার্সেন্ট উত্তরে লিখেছেন যে আপনার বই এবং বিশেষ করে 'কোয়েলের কাছে' পড়েই তাঁরা এখানে এসেছেন।

আমার পেটব্যথা সেরে গেল এই কথা শুনে। জানি না, এই সব ট্যুরিস্টদের চিনিও না আমি। কিন্তু কৃতজ্ঞতায়, ভাল লাগায়; মন নুয়ে এল। এর চেয়ে বড় পুরস্কার আমার মতো নগণ্য একজন লেখক, আর কীই বা পেতে পারেন? যার কোনো স্ট্রিং-পুলিং-এর ক্ষমতা নেই, এদেশীয় সাহিত্য পুরস্কারের পেছনে যে সব নেপথ্য নাটক অনুষ্ঠিত হয় সেই নাটকের বা যাত্রার বন্দোবস্ত করার মতো ক্ষমতা এবং প্রবৃত্তিও নেই; তার তো এই পুরস্কারই একমাত্র পুরস্কার। পাঠকদের হৃদয়ের পুরস্কার। এ ছাড়া, এর চেয়ে বড় প্রার্থনা আমার অন্তত আর নেই। আনন্দে চোখ জ্বালা করতে লাগল আমার।

কথা ঘুরিয়ে বললাম, লাহিড়ী ভাই, তুমি বয়েসে অনেক ছোট, তোমাকে তুমিই বলছি, তোমার পুরো নাম কি?

সঙ্গম লাহিড়ী।

সঙ্গম? বাঃ চমৎকার নাম তো!

একটা সবুজ-রঙা শার্ট আর সবুজ-কর্ডুরয়ের একটি ট্রাউজার পরেছিল লাহিড়ী। ফর্সা নাক, খুব যে লম্বা তা নয়, নাকটি একটু চাপা। বিহারেই স্থায়ীভাবে বসবাসকারী বাঙালি। কথাতে যশোবন্ত বোস্-এর মতো বা মোহন বিশ্বাসেরই মতো টান আছে। আমরা পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা স্বীকার করি আর নাই করি, বাঙালীদেরই মধ্যে আজও যা কিছুই ভাল আছে তার বেশিটাই আছে প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে।

পেটের ব্যথাটা বসতেই বাড়ে। লাহিড়ী রক্ষা করল। বলল, আপনার তো গরম লেগে গেছে যা শুনছি। যবের ছাতুর শরবত খান। এক্ষুণি ঠিক হয়ে যাবে।

যবের ছাতু?

হ্যাঁ, আমাদের ডিপার্টমেন্টের স্টোরেই রাখা থাকে গরমের দিনে। বলেই, হাঁক দিল, রামলগন।

রামলগন এলে বলল, স্টোর খুলে যবের ছাতুর শরবত করে দাও সাহেবকে। আমাকেও দাও। চার গ্লাস লানা।

চার গ্লাস কি হবে?

দু-গ্লাস আমি। দু-গ্লাস আপনি। গরমটা এবার বড়ই তাড়াতাড়ি পড়ে গেল। এবার মে জুন-এ কী যে অবস্থা হবে কে জানে?

বললাম, তোমার বাচ্চা হওয়ার গল্প শুনি। শুনলাম, ভোজ খাওয়াতেও হয়েছে তোমাকে?

হ্যাঁ। দেখুন না ছাড়ল না। এখানে বলে 'ছট্টি', মানে আমাদের ষষ্ঠী

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর কি। বাচ্চাদের মঙ্গলের জন্যে করতে হল। ফরেস্ট গার্ডরা সকলে খুব খেল।

বাঃ। শুনেই ভাল লাগছে। তোমরা যে টোটালি ইনভল্‌ভড্ হয়ে রয়েছো এইটেই বড় কথা।

লাহিড়ী বলল, যে গার্ড বাঘিনীটাকে ওয়াচ করছিল সে একদিন এসে খবর দিল, সাব, বাঘিনী যেখানে শুয়েছিল সেখানে রক্ত দেখেছি। আপনি তো জানেন, বাঘ বা বাঘিনী শুয়ে থাকলে সে জায়গাতে তার ছাপ পড়েই। কিন্তু রক্তর কথা শুনে আমার তো মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল। গুলি করল কি কেউ? বেতলা রেঞ্জ-এর মধ্যে? দৌড়লাম তক্ষুণি জিপ নিয়ে। ভাল করে রক্তটা পরীক্ষা করে দেখি, নাঃ। কালচে রঙা রক্ত। আপনি একসময় শিকার করতেন, আপনি জানবেন গুলি খাওয়া বাঘের রক্তর রঙ কেমন।

তারপর?

বুঝলাম যে, বাঘিনী হিট-এ এসেছে। অনুমান যে ঠিক তা বুঝলাম তারপর কয়েকদিন তুমুল হাকাহাকি দেখে। তারপরই ট্র্যাকাররা, মানে আমরা ফরেস্ট গার্ডরা, রিপোর্ট দিল যে বাঘিনী জুড়ি পেয়েছে।

কতদিন ছিল পেয়ারএ?

তা প্রায় মাসখানেক। বাঘিনীর কন্‌সিভ্ করতে বাঘের সঙ্গে বার চল্লিশেক কপ্যুলেট করা দরকার। মাসখানেক পর বাঘ চলে গেল বাঘিনীকে ছেড়ে।

তারপর?

তারপর জেস্টেশান পিরিয়ড শেষ হয়ে এলে আমি ফিল্ড ডিরেক্টরকে রোজই একই রিপোর্ট পাঠাতে লাগলাম ওয়্যারলেসে। বাঘিনী ভাল্লির গুহা থেকে নেমে এসে জল খায় আবার গিয়ে ভাল্লিতে শুয়ে থাকে।

চ্যাটার্জি সাহেব আমার বস্ রোজই একই রিপোর্ট পেয়ে বিরক্ত হয়ে যান। স্বাভাবিক।

তারপর একদিন বাচ্চা দিল বাঘিনী গুহাতে।

এই সময় বাঘ এসে বাচ্চা খেয়ে যাবে এমন ভয়ও থাকে। আপনি তো জানবেনই। তাছাড়া স্টার্ভেশানে মারা যাবার ভয়ও থাকে। তাই তখন থেকে আমরা বেইট দেওয়া আরম্ভ করলাম ভাল্লির কাছাকাছি। চোখ ফোটার আগ অবধি বাঘিনী খাবার নিয়ে গিয়ে খাওয়ায় বাচ্চাদের। বেইট-এর দরকার তখনই তো বেশি।

কি বেইট দিতে?

কাঁড়া, বয়েল। এমনি চলতে লাগল কয়েক মাস।

তারপর?

তারপর একদিন আমি নিজে দেখলাম, ঢিজুর গাছের উপরের মাচা থেকে বাঘিনী আর তার চার বাচ্চাকে। গুল্লাগুল্লা, সুন্টুনী-মুন্টনী। এখন তো তারা বড়ই হয়ে গেছে। তবে বাঘিনী ছেড়ে যায়নি তাদের এখনও পুরো-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারি। যখন মা ও বাচ্চারা আলাদা হয়ে যাবে প্রত্যেক বাঘ ও বাঘিনী যখন তাদের নিজের নিজের এলাকা চিহ্নিত করে নিয়ে নিজের নিজের ছোট রাজ্যে রাজপুত্র আর রাজকন্যার মতো বাস করতে লাগবে, তখন আবার অন্য গল্প শুরু হবে।

গল্প মানে তারা আবার জুড়ি বাঁধবে অল্প কদিনের মধ্যে। তারপর আবারও এই সার্কল ঘুরে আসবে এইই তো।

রাইট। আপনি তো জানেনই।

মা, অন্য পুরুষ না পেলে হয়তো ছেলের সঙ্গেই মিলিত হবে। ভাই, বোনের সঙ্গে, বাবা মেয়ের সঙ্গে, পলিগ্যামীর পূর্ণ পরাকাষ্ঠা।

ঠিক।

তাহলে তো কয়েক বছরের মধ্যে বেতলা এবং চারপাশে বাঘের সংখ্যা সত্যিই বেড়ে যাবে।

উৎসাহের সঙ্গে বললাম আমি।

ন্যাশনাল পার্ক হওয়ার পরেও প্রতিবছর এসেছি একাধিকবার, বাঘ কিন্তু একবারও দেখতে পাইনি। এবার তাহলে তোমার আর চ্যাটার্জি সাহেবের আমলে পালমুতেও মধ্যপ্রদেশের কানহা বা বান্ধবগড় বা উত্তর প্রদেশের করবেট পার্ক-এরই মতো নিশ্চিত বাঘ দেখা যাবে?

লাহিড়ী সাহেব হাসল।

বলল, আমরা কিন্তু ট্যুরিস্টদের বেশি এনকারেজ করব না বাঘ দেখতে। বাঘেদের প্রাইভেসি ডিসটার্বড হয় যে তাহলে। ইন ফ্যাক্ট, যখন বাঘিনী ভাল্লিতে বাচ্চা দিল বেতলা পার্ক-এর মধ্যে ঐ পথটিকে 'আন্ডার রিপেয়ার' বোর্ড টাঙিয়ে বন্ধই করে দিয়েছিলাম যাতে কোনো ট্যুরিস্টদের গাড়ি ওদিকে না যেতে পারে।

ন্যাচারালি। কানহাতে লাওলেকর সাহেব ফিল্ড ডিরেক্টর আর অমর সিং পারিহার সাহেবের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। আসলে, আলাপ হয়েছিল, মুক্কীর আই-টি-ডি-সি লজ-এ। সেখানে মধ্যপ্রদেশ ট্যুরিজম-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর বাগচী সাহেবও ছিলেন। ওঁরাও এই কথাই বলছিলেন। টাইগার প্রজেক্টগুলো এখনও জেস্টেশন পিরিয়ড পার হয়নি। তাই প্রজেক্টের ডিরেক্টররা এক্ষুণি ট্যুরিজম-এর ব্যাপারটাকে পুরো গুরুত্ব দিতে ভয় পাচ্ছেন। বাঘ যখন বেড়ে যাবে তখন তো লাভ হবে ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টেরই।

তা ঠিক।

সুন্দরবন সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?

লাহিড়ী সাহেব শুধোল।

পৃথিবীর সবচেয়ে আনক্যানী, ইরী, গা-ছম্‌ছম, ভয়াবহ জঙ্গল।

হেসে বললাম আমি।

প্রণবেশ সান্যাল খুব ভাল কাজ করছেন ওখানে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শুনেছি। গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না তো! সুন্দরবনে গেছি কম করে বার কুড়ি। টাইগার প্রজেক্ট হওয়ার আগে। এক একবারে তিন চার পাঁচদিন করে থেকেওছি। মায়া আইল্যান্ড, লোথিয়ান আইল্যান্ড, ভাঙ্গাদুনি আইল্যান্ড, ছোট বালি, বড় বালি, ছোট চামটা, বড় চামটা সে সব স্মৃতিতে আছে। টাইগার-প্রজেক্ট হওয়ার পরে পশ্চিমবঙ্গের বনবিভাগ কোনোদিনও ডাকেনি। যাওয়াও হয়নি। আমাকে ডাকেননি অথচ অনেকেই নিমন্ত্রিত হয়ে প্রায়ই যান শুনি।

একটু চুপ করে থেকে লাহিড়ী বলল, আফ্রিকার জঙ্গল কেমন লাগল আপনার?

বাবলু বলল, একটু বিয়ার-সিয়ার হবে কি লালাদা?

বললাম, পাগল হয়েছে? তোমরা খাও।

রমেনবাবু বললেন, আমি নয়। নো ডে-টাইম ড্রিংকিং। তুই খা। তোর জন্যে জেলুসেলও এনেছি। খেয়ে মর্।

বাবলু বলল, লেহ লট্‌কা। এই রকম সব ফার্স্ট ক্লাস ইন্টারেস্টিং আলোচনা চলেছে, এর মধ্যেই তো বিয়ার চলার কথা। আমি নিয়ে আসছি তালে আমার জন্যে। লাহিড়ী সাহেব?

থ্যাংক উ্য। আমি এখানে 'অন ডিউটিতে' এসেছি।

তারপর? বলুন গুহ সাহেব।

আফ্রিকার সব জঙ্গলে তো যাইনি। ইস্ট-আফ্রিকার কেনিয়া আর তানজানিয়াতেই গেছিলাম। কিলিম্যানজারো, লেক মানিয়ারা, গোরোংগোরো ক্র্যাটার, সেরেঙ্গেটির প্লেইনস্ এইই সব। মাসাইমারা, রুআহা, সাভো আমাদের দেশের জঙ্গল অনেক বেশি সুন্দর। কত রহস্য এখানে। এমন দেশ তো হয় না। দেশের সাধারণ মানুষও! শুধু রাজনৈতিক দল আর নেতারা যদি মানুষ হত তাহলে এই দেশ, এই জঙ্গল পাহাড়, এই বন্য প্রাণীদের এমন অবস্থা হত না। আজকে তোমরা বাঘিনীর বাচ্চা হওয়ায় 'ছুট্ট' করছ। আমি জানি, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পর ফরেন-এক্সচেঞ্জ রোজগারের নামে গভর্নমেন্ট কত শত শিকার কোম্পানি গড়তে অনুমতি দিয়েছিলেন রীতিমত অর্গানাইজড কিলিং। ওদের টার্মস্ ছিল পাঁচ দশ হাজার, এমন কি পনেরো কুড়ি হাজার ডলার পর্যন্ত। "জাস্ট—টু প্রডুাস্ আ টাইগার উইদিন শুটেবল্ ডিসট্যান্স"। বাঘ মরেছে বিস্তর, অথচ আহত বাঘকেও শেষ করতে হয়েছে। তোমরা যদি বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ এবং অন্যান্য সব রাজ্যের ফরেস্ট বাংলোগুলোর রেজিস্টার চেক করো, ক্যাম্পের হিসাব ছেড়ে দিয়েই বলছি তাহলেও মরা বাঘের সংখ্যা দেখে আঁৎকে উঠবে। যদি সে সব রেজিস্টার এখনও থেকে থাকে। এমন চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ার ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসেই বিরল। ভাবলেও দুঃখ হয়। ব্রিটিশ আমলে শিকার তো হত। আইন-কানুনের ভয় ছিল। স্বাধীনতার পরের ক'বছরে যে পাপ হল তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে

www.BanglaBook.org

এখন সারা দেশেই শিকার একেবারে বন্ধ করে দিতে হল। তবুও, টাইগার-প্রজেক্টের কথা ছাড়ো, অন্য এ সব জায়গাতে পোচিং তো হচ্ছেই। সবাইই জানে।

শিকার জিনিসটাই খারাপ।

লাহিড়ী সাহেব বলল।

আমি তা বলব না। আমরা যখন কিশোর ছিলাম, যুবক ছিলাম তখন শিকার একটা পৌরুষের প্রতীক ছিল। বিশেষভাবে, বিপজ্জনক শিকার। দলবদ্ধ ম্যাসাকার নয়। একা শিকারির শিকার। পায়ে হেঁটে যাঁরা শিকার না করেছেন কোনো সময়ে, সে তিতির বনমুরগিই হোক আর বাঘই হোক, তাঁরা জঙ্গলকে জানবেন কি করে? ভালোবাসা তো বই পড়ে আর গাড়ি চড়ে ন্যাশনাল পার্কে ঘুরে বেড়ালেই হয় না। জঙ্গলের ভালোবাসা সহস্র নারীর ভালোবাসার চেয়েও অনেক দামি। অনেক মূল্য দিয়ে তা পেতে হয়। তবে, এ প্রসঙ্গ থাক। কী আমি তোমাকে বলতে চাইছি তা বোঝাতে আলাদা প্রবন্ধের বই লিখতে হয়। আজকালকার হঠাৎ গজানো হাজার হাজার ওয়াইল্ড-লাইফ এন্থুসিয়াস্ট আর প্রটেকটর দেখে আনন্দ যেমন হয়, দুঃখও হয় তেমন একধরনের। ওয়াইল্ড লাইফে কোনো ইনস্ট্যান্ট ব্যাপার নেই। করবেট-এর মতো, সালিম আলীর মতো, এম. কৃষ্ণানের মতো, সারাজীবনের সাধনার, ভালোবাসার ব্যাপার এটা। অত সহজ নয়। কয়েকবার কটি ভাল ছবি তুলে নিয়ে গেলাম সেইই সব নয়। তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে কী আমি বলতে চাইছি। তাতেই জঙ্গলের অথরিটি বনে যায় না কেউ।

আপনি? আপনি কি?

লাহিড়ী সাহেব হেসে আমাকে চার্জ করল।

হেসে ফেললাম আমিও।

বললাম, আমার কিছুমাত্রও দাবি নেই এই বাবদে। আমি কেউই না, কিছুই না। আমি কিছুমাত্র জ্ঞানের দাবিই করি না। পাণ্ডিত্যেরও না। কারো সঙ্গেই প্রতিযোগিতা নেই কোনো আমার। একমাত্র দাবি এইই যে, জঙ্গলকে ভালোবাসি। জঙ্গলের প্রাণীদের ভালোবাসি। যখন শিকার করতাম, (পনেরো বছর করি না) তখনও ভালোবাসতাম। কথাটা বোঝাতে পারব না এক্ষুণি। আনন্দ এইটুকুই যে, আমার আন্তরিক ভালোবাসাটা আমি লক্ষ লক্ষ বাঙালির মনে সঞ্চারিত করতে পেরেছি। আজকে যেসব কিশোর-কিশোরী যুবক-যুবতী জঙ্গলকে ভালোবাসছে, বার বার জঙ্গলে আসছে তাদের মধ্যে অন্তত কয়েকজন হয়তো আমার লেখা পড়েই জঙ্গলকে ভালো-বাসতে শিখেছে। এই অনুমান যদি সত্যি হয় তাহলেই আমার অনেক পাওয়া হল। ওয়ার্লড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ড, কী ভারতবর্ষের বিভিন্ন ন্যাশনাল পার্ক আর টাইগার প্রজেক্টের কর্তারা আমাকে শিরোপা দিলেন, না উপেক্ষা করলেন তাতে আমার বিন্দুমাত্রও এসে যায় না। আমার আনন্দ আমারই থাকবে। কেড়ে নেয় তা আমার কাছ থেকে, এমন সম্মান অথবা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অপমানও কিছু আছে বলে জানি না।

অন্য জঙ্গলের কথা আমি জানি না, তবে পালামৌর বেতলা ন্যাশনাল পার্ক আপনার কাছে কৃতজ্ঞ আছে, থাকবেও।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, এবার যবের ছাতু খান।

হয়তো আমার মুখ বন্ধ করানোর জন্যেই যবের ছাতু গেলাতে চাইল। হয়তো বয়স হচ্ছে বলেই কথা বলতে আরম্ভ করলে, বিশেষ করে বন-জঙ্গল এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে নিজের কথাও, থামতে দেরী হয়।

এটা লক্ষণ হিসেবে খারাপ।

খুবই খারাপ।

সবুজ রঙা চার গ্লাস শরবৎ, দেখতে দুধহীন সিদ্ধির শরবৎ-এর মতো, যবের ছাতুর শরবৎ নিয়ে এসে দাঁড়াল রামলগন।

লাহিড়ী সাহেব বলল, খেয়ে নিন পর পর দু-গ্লাস।

বলে নিজেও চুমুক দিল।

ভাবলাম, কী জানি? এপ্রিলের পয়লাতে এপ্রিল ফুল বানাচ্ছে না তো আমায়?

তারপর দেখলাম, না, নিজেও চুমুক দিল গ্লাসে এবং পর পর দু-গ্লাস খেয়ে টকাস টকাস করে গ্লাস নামিয়ে রাখল টেবলে।

আমিও ওর দেখাদেখি খেলাম।

লাহিড়ী সাহেব বলল, জানেন তো। আপনাদের কলকাতায় যত রিকশাওয়ালা ঠেলাওয়ালা গরমে বেঁচে থাকে তারা সকলেই এই এই যবের ছাতু খেয়েই বাঁচে। তাদের কিসস্যু হয় না। তাইই তো পালামৌর গরমে জান বাঁচানোর জন্যে আমরা প্রত্যেক বাংলোতেই যবের ছাতুর স্টক রাখি। মে থেকে তো লু চলা শুরু হবে। মাথায় গামছা জড়িয়ে, শরীরের সব ফুটো-ফাটা ঢেকে তবে বেরুনো তখন।

রমেনবাবু বললেন, কোনোই ব্যাপার নেই। আমার কিসস্যু হয় না। আমি হলুম গিয়ে স্যানফোরাইজড্।

কোনোই সন্দেহ নেই। আমি বললাম। তোমার তুলনা তুমি হে।

লাহিড়ী সাহেব বলল, আজকে উঠব দাদা। পরে আসব আবার। ভাল লাগল খুউব।

আমারও। তোমার মতো ইয়াং, হ্যান্ডসাম, ডেডিকেটেড গেম্-ওয়ার্ডেন দেশে অনেক হোক। তোমার মতো কাউকে নিয়ে একটি উপন্যাস লিখব। কোনোদিন।

কী রকম?

ধরো, কলকাতা থেকে একজন সুন্দরী মেয়ে এল বেতলা ন্যাশনাল পার্কে। তোমার সঙ্গে আলাপ হল। তারপর প্রেম হয়ে গেল। প্রেম যেমন করে হয়, হিট স্ট্রোকের মতো; বোঝা যায় না। দারুণ ভাল উপন্যাস হবে।

লাহিড়ী সাহেব হাসল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলল, থ্যাঙ্ক উ্য দাদা। এখানে তো এমনিই অনেক সুন্দরীই আসেন। ভাগ্যিস কেউ চেনেন না আমাকে। আপনি পাবলিসিটি দিলে তো সত্যিই মুশকিল হয়ে যাবে।

বিয়ের নেমতন্নটা করতে ভুলো না আর যাইই করো।

হাসল লাহিড়ী সাহেব। তারপর আরেকবার কটেজের কাজ তদারকি করে ফরেস্টার রাজিন্দর সিং সাহেবের সঙ্গে কথা বলে, জিপে বসে চোখ জ্বালা করা গরমে লাল ধুলো উড়িয়ে জিপ চালিয়ে চলে গেল।

ওর চলে যাওয়া জিপের দিকে চেয়ে আমার মনে হল, শহরের জীবন নয়, কালার টিভি আর ভি. সি. আর-এর লোভ নয়, যে মেয়ে জীবনের মানে বোঝে, গভীরতা আছে যার মনে, তেমন কোনো মেয়ে যদি এখানে বেড়াতে আসে শহর থেকে, তবে সত্যিই সে সঙ্গম লাহিড়ীর প্রেমে পড়বে।

আমি, বয়স্ক পুরুষ হয়েও যখন পড়লাম।

২/৪/৮৫

সারা রাত ঠিক সেই রকমই অবস্থা। এক ফোঁটা ঘুমুতে পারলাম না। গায়ে হাতে পায়ে অসম্ভব জ্বালা। রাতে রামলগনের শোওয়ার কথা ছিল মধ্যের হলঘরে। কিন্তু তখনও আসেনি।

রাত কত কে জানে? বাইরের দিকের দরজাটা এখনও বন্ধ করিনি। কাকজ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে পালমৌর বন পাহাড়।

ফরেস্ট করপোরেশান হয়ে যাওয়ায় ছিপাদোহর জায়গাটা এখন নির্জীব ঘুমন্ত এক জংলী গ্রাম হয়ে গেছে। এবার গিয়ে মন খারাপ হয়ে গেল। সবসময় গমগম করত। বিভিন্ন ঠিকাদারদের ট্রাক আর জিপের সমারোহ, আই-পি-পি, রোহটাস্ ইন্ডাস্ট্রিজ-এর জিপ, ব্যাঙ্কের অফিসারদের আনা-গোনা, ট্রাকের উপরের ঢোলাই-করা বাঁশ ও কাঠের উপরে বসে-থাকা আদিবাসী, কুলি ও রেজাদের সম্মিলিত বিলীয়মান দুলুনীধরা গান, এ সবই এখন অনুপস্থিত। কেঁড় বাংলোর পথ দিয়ে নার্ভসের বাস ছাড়া এখন সারাদিনে সামান্য সংখ্যক জিপ ও ট্রাকই যায়।

পুজোর সময় থেকে অবশ্য বাঙালি টুরিস্টদের ভিড় লেগে থাকবে। বলতে গেলে, পুজো থেকে সরস্বতী পুজো অবধি। গাড়িতে, রিজার্ভ-করা বাসে, অনেক মানুষই আসবেন, কলকাতার বাস-ট্রামের-ডিজেলের আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কারখানার ধুঁয়োয় দম-বন্ধ মানুষেরা দলে দলে। নতুন প্রাণ ফুসফুসে পুরে নিয়ে চলে যাবেন।

জঙ্গলে আসবেন, আসেন হয়তো অনেক মানুষই আজকাল কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনেকেই হয়তো একটু বেশিদিন থাকলে জঙ্গলকে সত্যি সত্যিই নিজেদের জীবনের মধ্যেই একফালি সবুজ মাঠের মতো সঙ্গে করে বয়ে নিয়ে যেতে পারতেন। ইনস্ট্যান্ট কফি খেতে ভাল, কনডাকটেড ট্যুরে তীর্থ বা বেড়াবার জায়গাতে যাওয়া আরামদায়ক; কিন্তু জঙ্গল ইনস্ট্যান্টলি দেখার জিনিস নয়। কনডাকটেড্ ট্যুরেও তেমন মজা হয় না। এখানে আসতে হয় একদম একা, নয়ত মনোমত দু-একজন সঙ্গী নিয়ে। যাঁদের কথা বলার চেয়ে, শোনার তাগিদ বেশি।

মনটা বড়ই খারাপ লাগছে। এসে অবধি প্রথম দিন ছাড়া আর বাংলো থেকে বেরোতেই পারলাম না। হয় বিছানায় শুয়ে আছি, নয় মাঝে মাঝে ইজিচেয়ারে বসে আছি। বেশিক্ষণ বসে থাকলেই পেটে একটা খিঁচ্ ধরছে। অন্য সমস্ত উপসর্গ তো আছেই। রাতে কিছু খাইওনি। রুটি মুখে দিতে বমি আসছে। আলু পটলের একটু সব্জী করেছিল। তেল বা ঘিয়ের গন্ধে বমি আসছিল। তওহি শিক্ষানবিশি বাবুর্চি। স্যুপ-ট্যুপ এখনও ভাল করতে শেখেনি। তাই চারখানি বিস্কিট ও একটি সন্দেশ খেয়েছিলাম জল দিয়ে।

বাইরে চাঁদের আলো ক্রমশই জোর হচ্ছে। পিউ-কাঁহা ডাকছে থেকে থেকে। মহুয়ার গন্ধে বাতাস ভারী।

বিছানা থেকে উঠে, পায়ে চটিটা গলিয়ে বালিশের তলা থেকে হাতঘড়িটা বের করে টর্চ জেবলে সময় দেখলাম। রাত এগারোটা। কিন্তু মনে হচ্ছে রাত দুটো। চারিদিক নিস্তব্ধ। শুধু রাতচরা পাখির ডাক আর হাওয়ায়-ঝরা পাতাদের ঝরণার মতো বয়ে যাবার নিরন্তর শব্দ।

বাইরে এসে দাঁড়ালাম। ডানদিকের মস্ত বহেড়া গাছটা কেটে ফেলেছে। গুঁড়িটা পড়ে আছে হাতীর মতো। লাহিড়ী সাহেব বলছিল যে, বহেড়া গাছটার বাইরেটাই অত বিশাল ছিল, মধ্যেটা নাকি একেবারেই ফোঁপরা হয়ে গেছিল। কে জানে? হয়তো হবে। নইলে কাটবেই বা কেন? ও বলছিল, না কাটলে কোনোদিন ঝড়ে বা এমনিতেই এই বাংলোর উপরে পড়ে বাংলোটাকেই নাকি নষ্ট করে দিত।

দিতও হয়তো।

গাছেদের বেলা নিয়ম অন্য।

অথচ কত মানুষ যে ফল, বা অর্থ, বা আয়তনের বিরাটত্ব নিয়ে জাঁক করে দাঁড়িয়ে থাকে কোনো লার্জেস্ট লিভিং ম্যামালেরই মতো চিরদিন। মানুষ-জঙ্গলের মধ্যে তাদের দেখে বোঝার উপায়ই থাকে না যে, তাদের ভিতরও একেবারে ফোঁপরা। তাদের কেটে ফেলাই যে মানুষের সমাজের পক্ষে মঙ্গলের এমন কথা বলারও কেউই থাকে না। ফলে, ভিতরে ভিতরে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফোঁপরা-ধরা অথচ বাইরে জাঁক-ভরা মানুষের ভিড়ে সুস্থ এবং স্বাভাবিক ভাবে বাস করা পর্যন্ত যায় না এখানে। ফোঁপরা মানুষের আবার একে অন্যকে ক্রমান্বয়ে ফোঁপরাই করে চলে এবং শেষে দলে ভারী হয়ে হাতধরাধরি করে থাকে ভিড় করে। সুস্থ, স্বাভাবিক, সতেজ গাছেদের বাধা দেবে বলেই।

যাইই হোক, এই বহেড়া গাছটার জন্যে আমার খুবই দুঃখ হচ্ছিল। শেষবার শীতে যখন এসেছিলাম তখনও গাছটা দাঁড়িয়েছিল। অন্য বহেড়াটার নিচে রাতের বেলা কোটরা হরিণ আসবে, যখন বহেড়া ফলবে।

এই গাছটাকে তারা এসে আর খুঁজে পাবে না।

লাহিড়ী সাহেব বলেছিল, আগামীকাল এসে নাকি জ্যাকারান্ডা গাছও কাটিয়ে দিয়ে যাবে। মোটে থাকবে একটা। ওতেও নাকি সার কিছু নেই। ফোঁপরা হয়ে গেছে।

যে গাছের মধ্যে গাছত্ব নেই, মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব নেই, তাদের কেটে ফেলাই উচিত হয়তো। তবুও লাহিড়ী সাহেবকে বলতে ইচ্ছে করছিল, আমি যে কদিন থাকি সে কদিন না হয় ওরাও থাকলই। ফিকে বেগুনী ফুলও ফুটেছে। কিন্তু পাণ্ডুর। রুগী যদি পাণ্ডুর, রক্তশূন্য হয়ে যায় তাকে কি বাঁচানো যায় না কোনোক্রমেই? কেটে ফেলাই, মেরে ফেলাই কি একমাত্র পথ?

শিক্ষিত ফরেস্ট অফিসারেরা সত্যিই শিক্ষিত আজকাল। দেরাদুন এবং অন্যান্য জায়গাতে ট্রেনিং নেন। পরীক্ষা দিয়ে, কঠিন প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষায় পাশ করে তবেই চাকরিতে ঢোকেন। দেশের প্রায় সমস্ত প্রদেশের জঙ্গলেই তাঁদের ঘুরিয়ে নিয়ে আসা হয় অভিজ্ঞতার জন্যে। ওঁরা নিশ্চয়ই আমার চেয়ে ভালই জানেন এসব। আজকাল প্রফেশনালিজম্-এরই যুগ। অ্যামেচারদের দিন শেষ হয়ে গেছে অনেকই আগে। এই নতুন প্রজন্মের উৎসাহী, বন ও বন্য প্রাণীকে সত্যি সত্যি দরদের সঙ্গে ভালোবাসতে জানা, শিক্ষিত বনসেবকদের দেখলে খুবই আনন্দ হয়। পারলে এঁরাই এই বিরাট সুন্দর দেশের বন-জঙ্গল আর বন্য প্রাণীকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন। আর এঁরা যদি যথেষ্ট সচেতন ও উৎসর্গীকৃত প্রাণ না হন তাহলে সবই নষ্ট হয়ে যাবে। তরুণদের উপর আমার অনেকই আশা। এবং ন্যায্য কারণেই। মনে হয়, এঁরা অনেক কিছুই করতে পারার যোগ্যতা ও ইচ্ছা রাখেন।

সব বুঝেও তবুও বহেড়া গাছটা আর জ্যাকারান্ডা গাছ দুটোর জন্যে আমার মন খারাপ লাগতে লাগল। একটা গাছ বড় হয়ে উঠতে কত বছর লাগে! বহেড়া গাছটার বয়স হয়তো আমার ঠাকুর্দার বয়সের চেয়েও বেশি। যদি তিনি বেঁচে থাকতেন। কত কি দেখেছে গাছটা এক জীবনে! কত প্রেম কত বিরহ, কত ঔদার্য, কত বঞ্চনা! বেঁচে ছিল কত যুগ, কিন্তু সব শেষ হতে লাগে মাত্র দু-এক ঘণ্টা। কুড়ুলের পর কুড়ুল। অথবা বড় করাত।

'হাতী' বলে যে গল্পটি লিখেছিলাম এই বাংলোটিকেই মনে মনে পটভূমি

www.BanglaBook.org

করে, তাতে এই ডানদিকের বহেড়া গাছটির, যদিও এখন ভূতলশায়ী ; এক বিশেষ ভূমিকা ছিল।

জ্যাকারান্ডা গাছ দুটির কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। চাঁদের আলোয়, হাওয়া-লাগা ফুলগুলো দুলে দুলে মাথা নাড়াল। ভালোবাসার কুকুর মানুষকে দেখে যেমন কান নাড়ায়, আমি ওদের গায়ে হাত বোলালাম। বললাম, আবার দেখা হবে কখনও, কোথাও। কে জানে ? হয়তো মন্দাকিনী নদীর ধারেই। কে বলতে পারে ? হয়তো রম্ভা অপ্সরাদের নাচ দেখব গান শুনব তোমারই ফুল-বিছানো গালচেতেতে বসে। বিদায় জ্যাকারান্ডারা। বিদায় ! কালকে, তোমরা যখন মরে পড়ে থাকবে, এ-জন অন্তত নীরবে কাঁদবে তোমাদের জন্যে।

বাংলোটার চারদিক দুবার পায়চারি করলাম। ব্যথাটা বাড়ছে। রামলগন এখনও কি খাচ্ছে ?

বাওর্চিখানার দিকে এগোলাম। গিয়ে দেখি, ছেলেমানুষ তওহি খেয়ে-দেয়ে চাদর মুড়ে চাঁদের আলোয় বাওর্চিখানার বারান্দায় অঘোরে ঘুমোচ্ছে এবং তারই পায়ের কাছে, বারান্দার উপরে চারটি মহুয়ার বোতল গড়াগড়ি যাচ্ছে এবং তার পাশে রামলগন এবং বাবু গণেশ রাম। তাঁরাও গড়াগড়ি যাচ্ছেন।

গেটে তালা পড়ে গেছে। তার চাবি রামলগনের কাছে। জিপ গ্যারেজে। অবশ্য খোলা গ্যারাজ। কিন্তু জিপের চাবি বাবু গণেশ রাম-এর কাছে। তাঁরা দুজনেই এখন ইন্দ্রলোকে অবস্থান করছেন। নাকের ডাকের আওয়াজে বুনো শুয়োরও নির্ঘাৎ হার্টফেল করবে। যে ব্যক্তি, আমার মতো মাঝে-মধ্যে নিজেও কিঞ্চিৎ নেশা-ভাঙ করে থাকে, তার পক্ষে এই তুরীয় অবস্থা থেকে এদের নামিয়ে এনে পাপ কাজ করার মতো নিষ্ঠুরতা সে ব্যক্তির থাকাটা নীচতা। আমারও ছিল না। তাই নিজগুণে ওদের দুজনকেই ক্ষমা করে দিয়ে বাংলোর তালা-দেওয়া গেটের পাশে মানুষ চলাচল করার জন্যে যে সামান্য ফাঁক আছে তা দিয়ে গলে বাইরে বেরোলাম।

পথে এসে পড়ে, ছিপাদোহরের দিকে কিছুটা এসে, চড়াইটা চড়েই বাঁদিকের কাঁচা পথটাতে ঢুকে গেলাম।

আহা ! ব্যথাট্যাথা সব সেরে গেল।

ছেলেবেলায় যখন প্রথম 'আরণ্যক' পড়ি তখন যেমন মাসখানেক এক ঘোরের মধ্যে ছিলাম, সেইরকম ঘোরের মধ্যেই যেন পুনঃপ্রবিষ্ট হলাম। সত্যি ! মহাসিখাপুরের পাহাড়, লবটুলিয়া ছইহার, নাড়া বইহার, সরস্বতীকুন্ড, সরযূপ্রসাদ, রাজা দোবরু পান্না, কুন্তী প্রত্যেকটি চরিত্র যেন স্মৃতিতে গাঁথা হয়ে গেছে। বিভূতিভূষণ তো মুখ্যত পূর্ণিয়া আর সাঁওতাল জঙ্গলই দেখেছিলেন। আমি তো কত প্রদেশের কত জঙ্গল দেখলাম। শুধু দেশেরই নয়, সারা পৃথিবীর কত জঙ্গলেই তো পা রাখলাম। যে 'চাঁদের পাহাড়' তিনি আফ্রিকাতে না গিয়েই লিখেছিলেন, সেই চাঁদের পাহাড়ের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেশ আফ্রিকাতে পর্যন্ত গেলাম। সেখানে রুয়েঞ্জারি রেঞ্জে সত্যিই চাঁদের পাহাড়, 'মাউনটেইন অফ দ্য মুন' বলে একটি পাহাড় আছে। রহস্যময়। রহস্য-পিপাসুকে সত্যিই তো হাতছানি দেয়। কিন্তু গিয়ে টিয়ে, পায়ে এত দেশের ধুলো মেখেও লাভ কি হল? ছেলেবেলার কল্পনার জগতের মহালিখাপুরের পাহাড়, লবটুলিয়া ছইহার আর নাড়া বইহারকে দেশ-বিদেশের কোনো অরণ্যই এখন পর্যন্ত ম্লান করতে পারল না। ছাড়িয়ে যেতে পারল না সৌন্দর্যে। সরস্বতীকুণ্ডে সরযূপ্রসাদে যে স্পাইডার লিলি ফুটত তার মতো স্পাইডার লিলি কোথাওই খুঁজে পেলাম না সাত সমুদ্র পেরিয়েও। বুনো মোষেদের দেবতা 'টাড়বারো'কে সারা পৃথিবীর বুনো মোষের আস্তানা ঢুঁড়েও তো হদিস করতে পারলাম না।

কে জানে? সাহিত্য বোধহয় একেই বলে। যা বাস্তবকে, আমাদের ধূলিমলিন দৈনন্দিন জীবনকে, দূরের দিগন্তে হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে যায়, মরীচিকার মতো সুন্দর অথচ প্রাণদাত্রী জলেরই মতো সত্য কিছুর জন্যে পাগল করে ঘুরিয়ে মারে, প্রৌঢ়ত্বে এসেও যা মানুষকে শিশুই করে রাখে তার স্মৃতিতে, তাকেই বোধহয় সত্যিকারের সাহিত্য বলে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'র হোসেন মিঞা। নুট হামসন-এর 'গ্রোথ অফ দ্যা সয়েলে'র সেই মানুষটি, যার নাম এক্ষুণি মনে পড়ছে না, যে শুধুই সোনার খনির আশা জাগিয়ে দিয়ে যায় সকলের মনে, যে মানুষের এগিয়ে যাবার প্রবৃত্তিকে জাগরূক রাখে, মানুষকে আশাবাদী, মাথা-উঁচু এবং নিত্যনূতন আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ করে, করে নিত্যনূতন জয়যাত্রায়; সেই সব চরিত্রই বোধহয় সার্থক সৃষ্টি।

আমি তো শুধু পাতাই ভরাই। পাতা। আমার মতো পাতা-ভরানো লেখকরা পাতাবাহারই। সুন্দর ফুলবাহী তরু নয়। ফুলই না ফোটাবার ক্ষমতা যদি থাকল, তবে আর শিল্পী কিসে হলাম। শিল্পী হওয়া কি সোজা অত?

পথটা এঁকে বেঁকে চলে গেছে। চৈত্রর নবমীর চাঁদ: পথটাকে, মৃত-দেহের উপরের কোরাধুতির মতো সাদা দেখাচ্ছে। সাদা পুরো নয়, অফ্-হোয়াইট্।

এখানে, কেন যেন, হাওয়া নেই। বনের মধ্যে কোনো কিছু ঘটার আগে যেমন এক স্তব্ধ নৈঃশব্দ্য জেগে থাকে কিছু পরেই প্রচণ্ড শব্দময়তার সঙ্গে তা বিদীর্ণ হবে বলে; তেমনই এক স্তব্ধতা।

একা হেঁটে চলেছি। পায়ে হাওয়াইন্ চপ্পল। ছায়া পড়েছে দু-পাশের গাছগাছালির পথের উপর। মনে হচ্ছে ডোরাকাটা সাদাটে, অস্বাভাবিক লম্বা একটা রাশিয়ান বাঘ শুয়ে আছে, সামনে। পথটা ডানদিকে হঠাৎই বাঁক নিয়েছে। সেই বাঁকের মুখে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে একটা কোট্‌রা হরিণ ডেকে উঠেই দৌড়ে আমার দিকে আসতে গেল। এবং তার ঠিক পেছনে পেছনেই একদল মুন্নীকোঁয়া। জংলী কুকুরের দল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাঁদিকের জঙ্গলের পরেই একটি মাঠ। কখনও হয়তো কিয়ার ফলিং হয়ে থাকবে। বর্ষার পর ঘাস গজাবে এই মাঠে। কিন্তু চৈত্রশেষে এখন টাঁড়ের মতো দেখাচ্ছে। মাঠের চারপাশ ঘিরে বড় বড় আমলকী গাছ। দেখতে দেখতে চোখের নিমেষে কোট্‌রাটাকে ধরে ফেলল অলিম্পিক-স্প্রিন্টারের মতো-ঝড়ের মতো দৌড়ে যাওয়া জংলী কুকুরের দল। চকাচক্ চকাচক্ শব্দ হতে লাগল। পাহাড়ের ঢাল থেকে হায়! হায়! করে ব্যাক্ ব্যাক্ ব্যাক্ ধ্বনিতে কোট্‌রাটার সঙ্গী সমস্ত জঙ্গলে এই সর্বনাশা কুকুরের আগমনের খবর ঘোষণা করতে করতে যত জোরে পারে নিরাপদ দূরত্বে ছুটে চলে যেতে লাগল পাথর পাতা, ঝোপ-ঝাড়, এবং তার প্রেমকে মাড়িয়ে।

আমি যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন দেখলাম যে ছোট ছোট শিং দুটি আর মেরুদণ্ডটি পড়ে আছে শুধু। আর জংলী কুকুরের দল মুখে কুঁই কুঁই কুঁই আওয়াজ করতে করতে তীরবেগে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে। হয়তো অন্য কোনো শিকারের সন্ধানে।

এই বুনো কুকুরের দলটা যতবড়, লাহিড়ী সাহেবের ছেলে মেয়েরা অক্ষত থাকলে হয়। এই কুকুরের দলের হাত থেকে বাঘেরও নিস্তার নেই। কালই লাহিড়ী সাহেবকে খবরটা পাঠাতে হবে সাতসকালে। বুনো কুকুর প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখে ঠিকই, তবু টাইগার প্রজেক্টের মধ্যে এতবড় কুকুরের দল এবং অনভিজ্ঞ, সবে-বড়-হওয়া বাঘের বাচ্চাদের সহাবস্থান করাটা প্রজেক্টের কর্তাদের ঘুমের পক্ষেও অনুকূল নয়।

দলটা নিশ্চয়ই নতুন এসেছে।

ওড়িশার খন্দমাল্-এ, খন্দদের দেশে, যাদের কাছে গিয়ে থেকে 'পারিধী' উপন্যাস লিখেছিলাম, তাদের মধ্যে 'মেরিয়া' বলে একরকমের প্রথা ছিল বহুদিন আগে। মেরিয়া-বলি বলত। জীবন্ত মানুষ, যাকে বলির জন্যে চিহ্নিত করা হত, সেই পলায়মান মানুষের গা থেকে খুবলে খুবলে মাংস কেটে নেওয়া হত। সে সব বহুদিন আগের কথা। এই বুনোকুকুরদের খাবার প্রকৃতিটিও সেরকম। ভাবলে মনে হয় নিষ্ঠুর খুব। এরা কেনই বা এমন দলবদ্ধভাবে অন্য জানোয়ারদের আক্রমণ করে খাবে? মনে হয়, অতি জঘন্য ব্যাপার। কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে যা-কিছুই ঘটে, তার পেছনেই সুনির্দিষ্ট কারণ থাকে।

এই বুনো কুকুররা প্রকৃতির বন্য প্রাণীদের ভারসাম্য বজায় রাখে। জলের মধ্যে বোয়াল ও চিতল মাছ যেমন অন্য মাছ খেয়ে খায়, তেমন তারা মাছেদের সবসময় দৌড় করিয়েও বেড়ায়। তাদের ওপরও এই ভারসাম্য বজায় রাখার দায়িত্ব যেমন বর্তেছে বুনো কুকুরদের উপরও তাইই।

আরো আধমাইলটাক হেঁটে গেলাম। চৈত্র রাতের চাঁদে-টান-করে-ওঠা উদ্‌লা গায়ের বনের গায়ের গন্ধ মাতাল করে দিচ্ছে। এই পৃথিবীতে এমন সুগন্ধি, নগ্না কোনো শ্বেতাঙ্গিনী নারী আছে বলেও আমার বিশ্বাস হয় না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এমন রহস্য, এমন কারোঞ্জ আর মহুয়ার বাস, ধবধবে সাদা স্বর্গের উদ্যানের স্বর্গীয় নারীর মতো দীঘল উরুর ঢাঙটা গাছেদের গায়ে গায়ে লেগে দাঁড়িয়ে থাকার সৌন্দর্য দেখে মনে হয় এ পৃথিবীর সৌন্দর্য নয়।

পাগলা কোকিল ডাকছে প্রাণের কেন্দ্র থেকে কু দিয়ে দিয়ে। পিউ-কাঁহা, পিউ-কাঁহা বলে তার হারিয়ে যাওয়া পিয়ার খোঁজে পাগল হওয়া ব্রেইনফিভার পাখি পাহাড়ের পর পাহাড় চাঁদের আকাশে সাঁতরে যাচ্ছে। পাহাড়ের কাছে সাদা চাঁদের শাড়ির কালো আঁচলের মতো যেখানে ছায়া জমেছে রহস্যময় হয়ে, সেখানে টিটি পাখি ডেকে ফিরছে হট্টি-টি-টি টি-টি-টি-হুট্—হট্টি-টি-টি টি-টি-টি-হুট্ করে।

এমন এমন রাতেই বোধহয় জিন-পরীরা খেলে বেড়ায় বনে বনে। অতি-প্রাকৃত সব ব্যাপার-স্যাপার ঘটে। রামধানীরা চাচার মতে, এমন এমন রাতেই মানুষ-মানুষীর হাড়ের মধ্যে চাঁদ ঢুকে যায় পরে দুর্দান্ত কামেলা বাধাবে বলে।

কে জানে?

মানুষ এত কিছু জেনেছে। চাঁদে হেঁটে বেড়াচ্ছে। মহাকাশ চষে ফেলছে। আজকের মানুষের মতো দিগ্বিজয়ী প্রাণী আর কোথায়? তবুও মনে হয়, সবই কি জেনেছে মানুষ? যাইই সে জানল, বা করল, সবই কি তার উর্বর মস্তিষ্কের উদ্ভাবন? কে জানে? ভবিষ্যৎই জীবনের মানুষের জানার সঠিক পরিধি এবং তাৎপর্য হয়তো কেটে দেবে গণ্ডীও, লক্ষ্মণ যেমন সীতার চারপাশে কেটে দিয়েছিল মায়ামৃগ ছুঁতে সাবধান করে দিয়ে। এই পৃথিবীর সব নব্য মানুষও বুঝি আজ সীতা হয়ে গেছে। আর বিজ্ঞান; মায়ামৃগ। মায়ামৃগের পেছনে যে রাবণ আছে, বিজ্ঞানের রাবণ, যা কিছু অমঙ্গলের মূর্ত-প্রতিমূর্ত তা জানতে এখনও দেরী আছে মানুষের। জানবে যেদিন, সেদিন হা রাম! হা লক্ষ্মণ! করে চেঁচিয়ে মরবে সে। বলবে, কী সুখেই না ছিলাম! কী ছিল না এই সুন্দর ধরিত্রীতে সাত্যকারের সুখে বাস করার জন্যে? সবই তো ছিল। সেদিন বিজ্ঞানের দম্ভে উদ্ধত গর্বিত মানুষকে তার রোবোটের জটায়ু কিছুতেই বাঁচাতে পারবে না।

আমি জর্জ ওরওয়েল নই যে, লিখে যাব কি কি ঘটবে দুহাজার পঁচাশি খ্রীস্টাব্দে। আমি একজন অশিক্ষিত, অসার্থক লেখক, প্রাকৃত জন, প্রাচীনতায় ধূসর আমার ভাবনা চিন্তা। তবুও 'কোজাগর'-এর আদিবাসী শিকারি কাড়ুয়ারই মতো আমি অথবা আমার বিশ্বাসী আত্মার পক্ষে দু হাজার পঁচাশি খ্রীস্টাব্দের মানুষকে জিগ্যেস করতে খুবই ইচ্ছে করবে, কি গো? উন্নত, আরামী, সবজান্তা মানুষ? যেখানে এই বিজ্ঞানের ডানায় ভর করে তোমরা যেতে চেয়েছিলে, সেখানে কি পৌঁছতে পারলে?

এমন এমন রাতে একা বনে, কোনো রিপুতাড়িত হয়ে নয়; সব রিপুবাস ছেড়ে আদিম মানুষের প্রথম দিনের মন নিয়ে ঘুরে বেড়ালে অনেক কথাই মনে ভিড় করে আসে। যেসব কথা প্রকাশ করলে অন্য সভ্য, সুবেশ মানুষেরা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাগল বলবে আমায়। হয়ত গায়ে থুথু দেবে। বলবে, অদূরদৃষ্টির দাঁড়কাক আমি। তাইই মনের কথা মনেই রাখি। হাসি। একা একা। ভাসি, চাঁদের বনে বনে।

আমার চাঁদে এখনও চরকা-বুড়ি বসে চরকা কাটে। আমার মন এখনও ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর আর লালকমল নীলকমলের গল্প শুনতে চায়। সেই ছেলে-বেলার 'ঠাকুরমার ঝুলি' আর 'তালপাতার ভেঁপু' আর 'পাগলা দাশু', 'রাজকাহিনী', 'চাঁদের পাহাড়' আর 'মরণের ডঙ্কা বাজের' দেশেই চির দিন যে কেন রয়ে গেলাম না, কেন যে বড় হতে গেলাম, কেন যে মৃত্যুর দরজায় এসে এত তাড়াতাড়ি দাঁড়ালাম ; তা ভাবলেই বুকের মধ্যে বড়ই কষ্ট হয়।

কী জানি, আমি এই বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের মানুষ হয়েও এত প্রাচীন পন্থী কেন ? এর কারণ বোধ হয় এইই যে, সত্যিই আমার শিক্ষা, আধুনিকতা পায়নি। এই কম্প্যুটার আর স্পেস্ এজ-এর যুগেও আমি পুরোপুরি প্রাকৃতই রয়ে গেছি।

সেদিন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হলুদ পাতা' বলে একটি এযাবৎ অপ্রকাশিত উপন্যাস পড়ছিলাম। বোধহয় বছর কয়েক আগের আনন্দ-বাজারের পূজা সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। পড়ে, সত্যিই চমকে উঠে-ছিলাম। গ্রামের স্কুলে বিভূতিভূষণ শিক্ষকতা করতেন। অথচ নীরদ সি. চৌধুরীও বন্ধু ছিলেন। তাঁর সমসময়ের তুলনায় তিনি যে কত আধুনিক ছিলেন তা এই কটি লাইন মনে করলেই চম্‌কে উঠতে হয়।

উনি লিখছেন :

"ভগবানকে ধন্যবাদ, সে তরুণ যুগের মানুষ, সে ফোরটিনথ্ সেঞ্চুরি বা ফিফটিনথ্ সেঞ্চুরিতে বাংলার বালক হয়ে জন্মায়নি।···তাহলে হয়ত ক্ষীণদৃষ্টি অন্নদার মন হত—কালীকীর্তন লিখত। পণ্ডিত হলে একাদশী তত্ত্ব আলোচনা করে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বই লিখত বা তিথি একপাদমাত্র থাকলে সেদিন পার্বণশ্রাদ্ধ হবে কিনা সারাজীবন এই দুরূহ, গভীর বিষয়ের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে যত্নবান হত।

সে জন্মেছে বিংশ শতাব্দীর বাংলায় যার সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর মানুষের না ভাবগত না চিন্তাগত কোনো যোগই নেই, একমাত্র বংশগত ছাড়া। এই বিংশ শতাব্দীর তরুণ মানুষের জীবনের আউটলুক্ সম্পূর্ণ হবে, এমন এক রেস জন্মাবে, যারা আইনস্টাইনের রিলেটিভিটিতে, রাদারফোর্ডের, ওলিভার লজ-এর, জগদীশ বসুর বিজ্ঞানে, রবীন্দ্রনাথের কবিতার (প্রভাবে) মানুষ হবে। পূর্বযুগের কবিকে তারাই আরো ভালো করে অ্যাপ্রিসিয়েট করবে—কারণ জগতের আউটলুক বদলেছে। তাদের ঊ্যানিভার্স-এর সীমা দশলক্ষ আলোকবৎসর দূরের গ্লোবুলার ক্লাসটার থেকে পৃথ্বিপার্শ্বের প্রাণবান লতা কি সামুদ্রিক উদ্ভিদ কিংবা আনুবীক্ষণিক প্রোটোমেনিফেরা অবধি বিস্তৃত —তারও বাহিরে মৃত্যুপারের দেশকে তারা চিনেছে।"

বিভূতিভূষণ আধুনিক ছিলেন নিঃসন্দেহে। কিন্তু তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী,

www.BanglaBook.org

"পূর্বযুগের কবিকে তারাই আরো ভালো করে অ্যাপ্রিসিয়েট করবে" ফলল না। সমসময়ের মানুষরা বড় দাম্ভিক। প্রকৃত সজ্ঞ বলেই হয়তো তারা অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন এবং দুর্বিনীতও।

এই প্রজন্মর কাছ থেকে তিনি যা আশা করেছিলেন তা সত্যি হয়নি।

এর লজ্জা তাঁর নয় ; এই সবজান্তা যুগের সর্বজ্ঞ মানুষদেরই।

আরও কিছুটা হেঁটে গেলাম। ব্যথাটা আবার ফিরে এল। আস্তে আস্তে জোর হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অসহ্য হয়ে উঠবে। চাঁদের বনে একলা পাগলের অভিসার সহ্য হল না শরীরের।

বাংলোর পথে ফিরে চললাম।

কেঁড়

৩।১।৮৫

সকালে চান করে বাথরুম থেকে বেরিয়েছি এমন সময় একটি ঘোরতম নীল রঙের অ্যাম্বাসাডার গাড়ি এসে ঢুকল বাংলোর হাতায়।

দেখি শংকরদা, মানে শংকর ব্যানার্জি, জুবিলি বোদি, শংকরদার বোন ইরা এবং ইরার স্বামী ত্রিদিব (মুখার্জী) এবং তাদের ছেলে বুম্বা এসে হাজির।

শংকরদাদের লাইমস্টোনের কোয়ারী আছে ম্যাকলাস্কিগঞ্জ-এর আগের স্টেশন রায়তে। অন্য নানা ব্যবসাও আছে। শাহু জৈন গ্রুপের একটি কোম্পানির ডিরেকটার ছিলেন যখন উনি তখন ওঁর গেস্ট হাউসে গিয়ে অনেক বছর আগে একবার পুজোর সময় ছিলাম ঋতু ও মালিনীকে নিয়ে মুসৌরীতে। তখন মোহিনী জন্মায়নি।

ত্রিদিবেরও বাড়ি আছে ম্যাকলাস্কিগঞ্জে। আমার বাড়ি যখন ছিল তখন ওর সঙ্গে এক বিশেষ সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। ভারী ভাল মানুষটি। এমন আত্মিক সৌন্দর্যসম্পন্ন মানুষ বড় একটা দেখি না আজকাল। খাঁটি মানুষ। লোভহীন, জাগতিক, উচ্চাশাহীন, দম্ভহীন মানুষ।

ওঁরা এসেছেন রাচী হয়ে বেত-লা। তিনদিন থেকে, ম্যাকলাস্কি যাবেন।

বললেন তুমিও চলো।

এইখানেই গেড়ে বসেছি। শরীরও পুরোপুরি বিদ্রোহ করেছে। তাই একেবারে নট-নড়ন-চড়ন নট কিছু।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রমেনবাবু আর বাবলুও ততক্ষণে এসে হাজির। আমি তাদের অতিথি। এবং শংকরদারা, আমি এখানে আছি শুনেই দেখা করতে এসেছেন। তাইই ওঁরা আমার অতিথি। রাতে এখানে খাবার জন্যে ওঁদের নেমতন্ন করে দিলেন রমেনবাবুরা। মোহন এবং মোহনের নন্দী ভৃঙ্গীদের কোনো বিকল্প হয় না, হবে না।

শংকরদা নিজের গাড়ি আনেননি। বললেন, ট্যাক্সির চারখানি টায়ারেরই যা অবস্থা, তারা তাদের মানে মানে গড়িয়ে গড়িয়ে ম্যাকলাস্কি অবধি গিয়ে পৌঁছতে পারলেই যথেষ্ট। রাতে জঙ্গলের পথে এই ট্যাক্সি নিয়ে আসতেই সাহস হয় না।

জিপ্ তো বাংলোতেই ছিল এবং বাবু গণেশ রামও। রমেনবাবু বললেন, কোনো ব্যাপারই নেই। আপনাদের বেত-লা থেকে নিয়ে আসা এবং ফেরৎ দেওয়ার চার্জ আমার।

ওঁরা চা খেয়ে চলে যাবার পরই বাবলু ও রমেনবাবু ঠিক করলেন যে, শ্যামলদেরও বলে দেবেন তাহলে, রাতে খেতে।

বাবলু নাকি ফারস্ট-ক্লাস কুকও।

রমেনবাবু বললেন।

তওহি জোগাড় দেবে এবং বাবলু রাঁধবে।

নেমন্তন্নর কথা হতে হতেই আবার যন্ত্রণাটা শুরু হল। নেতন্তন্ন করা হল, বাবলুবাবু রান্না করবেন আর আমা-হেন ভোজনরসিক তা থেকে বাদ যাবে এই কথা ভেবেই বোধহয় পেট প্রতিবাদ করে উঠল।

একেবারে কেঁদে ফেলার মতো অবস্থা।

বাবু গণেশ রাম বললেন, আমার জান্-চিন্ একজন ডাগদার সাহেব আছেন তাঁকে পাকড়ে নিয়ে আসছি।

কোথাকার ডাক্তার?

রমেনবাবু শুধোলেন।

সে ভালুমারের। আপনারা তাকে চিনবেন না।

বাবু গণেশ রাম ভারিক্কী চালে বললে।

সে কি? ডাক্তার আনলে ডালটনগঞ্জ থেকেই নিয়ে আসছি। কোন্ আনজান্ ডাক্তারকে আনতে যাবে তুমি? ছিপাদোহরেই তো ডাক্তার আছেন।

আমি নিজে থোড়াই যাব। বাসে করে খাত্ ভেজে দিচ্ছি! তুরন্ত্ চলে আসবে ডগদর সাব। ডগদর দুনিয়ার কোন্ জায়গায় নেই? কিন্তু প্রথমে ছোট ডগদর দিয়ে আরম্ভ করুন। বলেই দু হাতের তেলো বুকের কাছে এনে দেখালো আগে এতটুকু, পরে আর একটু বড়; তারও পরে আরও বড়।

বাবুর মতলব বিশেষ সুবিধের মনে হল না। ও এই ডাক্তারের পর ডাক্তার চাপিয়েই মারবার মতলব করছে বোধহয় আমাকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মারলে, অবশ্য রমেনবাবু ও বাবলুও মারতে পারেন ছারপোকার মত। জঙ্গলে একজন মানুষকে মেরে দিতে কি? ছুরি বন্দুক ছাড়াও সহজেই মারা যায়। বাবলুর রাগও আছে আমার ওপর প্রচণ্ড। রাগের কারণটা সকলকে বলাও যেত। কিন্তু তার নিজেরই বিশেষ আপত্তি থাকায় সেটা বলা যাচ্ছে না। মোহন এবং রমেনবাবু অবশ্য জানেন।

আর রমেনবাবুও তো চেকারড্-কেরিয়ারের মানুষই হচ্ছেন। ওঁর ক্রেডিটে দু-চারখানি খুন-টুন না থাকলেই চরিত্রটিকে জোলো-জোলো মনে হবে বরং।

ওঁরা যখনই আসছেন, তখনই হেসে হেসে কথা বলছি, গল্প করছি; তাই ওঁরা হয়ত আমার অবস্থাটা যে ঠিক কতখানি খারাপ তা বুঝে উঠতে পারছেন না। তাছাড়া ওষুধপত্র তো প্রথমদিন থেকেই চলছে। হিট্ স্ট্রোক, স্টম্যাক আপসেট ইত্যাদির সিম্‌টম্‌স রমেনবাবু মারফৎ শুনে ডালটনগঞ্জ-এর কম্পাউন্ডারবাবু রোজই ওষুধ দিচ্ছেন। সেই ওষুধ পকেট ভর্তি করে নিয়ে আসছেন ওঁরা। রোগী আঠারো মাইল দূরের বন-বাংলোয়। কম্পাউন্ডার ডালটনগঞ্জে। লিয়াজো অফিসার মেসার্স রমেন বোস এবং বাবলু কর। এমতাবস্থায় অসুখ যেমন দ্রুতগতিতে সারার কথা তেমনই সারছে। শনৈঃ শনৈঃ।

কোনোই ব্যাপার নেই।

বুঝলেন কী না!

রমেনবাবু উবাচঃ।

ওঁরা তো দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে চলে গেলেন তারপর। বললেন, ছিপাদোহরে কাজ সেরে বিকেলের আগে আগেই ফিরে আসবেন। এসে বাবলু তার পায়জামা পাঞ্জাবি ছেড়ে লুঙি-গেঞ্জি পরে নিয়ে বাওয়ার্চি বনে যাবে। আর তওহি খিদ্‌মদ্‌গারী করবে। রমেনবাবু জন-হেইগের বোতলও নিয়ে এসেছেন, মোহনের বিদায়কালীন নির্দেশমতো অতিথিদের জন্যে।

আমার জন্যে যে চিভাস্-রিগ্যালটি মোহন পাঠিয়েছিল, তার সোনালি বাক্সটি করুণ চোখে তাকিয়ে থাকত আমার দিকে।

প্রতিদিন সন্ধে লাগলেই আমি রমেনবাবু আর বাবলুকে বলতাম, আমার বলেই কি আমার? সংসারে আমরা কতকিছুই তো আমার বলে জানি, তার কতটুকুই বা সত্যি সত্যি আমার? এ তো তোমাদেরই জিনিস। আমার তো এখন এসব পানীয় এবং যে-কোনো খাওয়ার দেখলেই বমি উঠে আসতে চাইছে। তোমরাই খাও।

রমেনবাবু বলেছেন: কোনোই ব্যাপার নেই। তাতে কি? আপনি খাবেন না, আমরা খাই কি করে? এ একটা কথা হল? কোনোই ব্যাপার নেই।

বাবলু বলেছে: লেহ্ লট্‌কা! তা কি হয় না কি? অজীব্ কথা বলছেন আপনি লালাদা মাইরি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি বলেছি, না হলেই নয়। তোমরা আমার দেখাশোনা করতে আসছ দুবেলা আর আমার নাম করে মোহন কিনেছে বলেই আমি স্বর্গে নিয়ে যাব এই সোনালি বাক্সে মোড়া অমৃত সঙ্গে করে? তা বলে, রয়্যাল স্যালুটটা দিচ্ছি না। ওটা কলকাতায় ফিরে বিশেষ অকেশানে খোলা হবে। চিভাস্‌টাই খাও তোমরা।

এই দ্যাখো তো রমেনদা! লালাদা কী যে ঝামেলা লাগায় না মাইরি।

বলে, বাবলু বোতলটা এনে বারান্দার টেবলে রাখল।

'আররে, এ রামলগন' বলে জোরে হাঁক ছাড়ল।

জল ও আইস-বক্স থেকে বরফের ইন্তেজামও হল।

সামান্য খাব কিন্তু। অতি সামান্য!

সামান্যই তো খাবে। অত ঢং-ঢাং কিসের?

লে-মাইরি। যত ভাল কথা বলো, তবু লালাদা সে কথা টেঁড়িয়ে নেবে মাইরি। মহা ঝামেলিতেই পড়া গেল গো রমেনদা।

ঝামেলি, বলে ঝামেলি!

রমেনবাবু বললেন।

তারপর বললেন, তুইই বা এমন পরপর করছিস কেন? লালাদারই তো ব্যাপার! কোনো ব্যাপারই নেই।

আমার এইটুকুই সান্ত্বনা যে ভাল জিনিস, ভাল পরিবেশে, ভাল লোকরাই সদ্ব্যবহার করছেন।

ওরা দুপুরের খাওয়া দাওয়া করে চলে যাবার পর পুবের ঘরের চৌপাইয়ে একটু চোখ বুঁজেছি। রামলগন একটু আগেই পেটে তেলজল মালিশ করে একটা নতুন কায়দা করেছিল। আইস-বক্সের ঠাণ্ডা জলে তোয়ালে ভিজিয়ে এনে পেটে চেপে ধরে বলেছে, হ্যাঁ। আভ্‌ভি সমঝা?

হতচকিত হয়ে বলেছিলাম, ক্যারে? ক্যা সমঝা?

আপ্‌কো পেট্‌কে অন্দর কোঈ খতরনাগ গরম জানোয়ার ঘুস গয়া। উও কুছ রেদ বাদ বাদ শর্‌ উঠাতা। যব উঠাতা ম্যায় ঠাণ্ডা তোয়ালিয়াসে উস্‌কো শর্‌ দাব্‌ দেতা হ্যায়। আভ্‌ভি বিল্‌কুল্‌ টাইট রহেগা। কুছ্‌ টাইমকা লিয়ে।

বেশ তন্দ্রামতো এসেছে। কাঁটাল পাতার ছায়ায় বসে ঘুঘু ডাকছে ঘুঘুর-র-র, ঘুরর-র-র-র, এমন সময় হঠাৎ খটাখট খটাখট খটাখট করে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। ঘোড়াটা প্রায় বাংলোর বারান্দাতেই উঠে পড়ে এমনই অবস্থা। কে এল? 'কোয়েলের কাছে'র যশোয়ন্ত?'

চমকে চোখ চাইতেই বাবু গণেশ রাম এবং ঘোড়া একই সঙ্গে চিঁহি-হ-হ্‌ আর হিঁ হিঁ করে ডেকে উঠল।

বাবু গণেশ রাম সিমেন্টের বারান্দায় নাগরা ঠকঠকিয়ে এসে বললেন, আয়া ডগদর সাব।

ডগদর-এর চেহারা দেখেই তো আমার অবস্থা সঙ্গীন। চার ফিট দু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইঞ্চি উচ্চতায়, প্রস্থে ছ ফিট হবেন বেড় নিলে, ওজন দু স্টোন প্রায়।

পেটে অচানক্ এক চাপড় মেরে বললেন : তক্‌লিফ্ ক্যা ?

তক্‌লিফ্ যা না ছিল, পেটের উপরের ঐ চাপড়ে তা দশগুণ বেড়ে গেল।

ডগ্‌দর সাহেব পায়ের পাতা থেকে মাথার চুল অবধি সব পরীক্ষা করলেন। যত্রতত্র টেপাটেপি করলেন। আমার অ্যাপেন্ডিসাইটিস্ অপারেশনের সময়ও এমন হেনস্থা হয়নি।

ডগ্‌দর সাহেব বললেন, এক চুরন্ দে কর্ যা রহা হ্যায়। সন্ধ্যা সাম্ উও মধ্‌মে মারকে ডাটকে পী লিজীয়েগা। পেট উসকো জারা খরাব হোগা। মালুম হোগা কি আপনে ঘোড়েকে টাট্টি খা রহা হ্যায়। ঐসেহি বদবু ভি হ্যায়। মগর বিমার ফর্—র্—র্ ইলাজ হো যায়েগা। বিলকুল।

ঔর···?

বাবু গণেশ রাম হাত জোর করে শুধোল।

ঔর ইয়ে তেল দেকে যা রহা হ্যায়। বনফুল্‌কি তেল। ইয়ে তেল পূরী বদনমে, সমঝে না ; পায়ের কা নিচ্‌সে লেকর শর্‌কে চাঁদি তক্ লাগাইয়ে। দিনরাতমে চার মর্‌তবে। দেখিয়ে, কেয়া আরাম আতা হ্যায়।

পেটেও লাগাব ?

আমার লোকাল গার্জেনদের অনুপস্থিতিতে ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করলাম।

জরুর। পূরী বদন্‌মে যাঁহা যাঁহা জলন্ অনুভূত্ হো রহ্যা হ্যায় সব্‌হি জাগেমে মালিশ কিজিয়ে। দেখিয়েগা তেল অন্দর ঔর বিমারী বাহার। একদম্ স্যাথেসাথ। আপ যৈসে মারীজকো সকল্ দিখ্‌কেই তো পাত্তা চল্ গ্যায়া না বিমারী ক্যা হ্যায়। মগর হাঁ। ইলাজ পূরী হোনেমে দো দিন লাগেগী। অ্যায়সী জল্‌দী-বাজী কা কামমে ডগ্‌ডর ঘন্‌শ্যাম্ কা নেহীনা বিসওয়াস্ হ্যায়।

ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, ডগ্‌ডর ঘন্‌শ্যাম্ কওন্ হ্যায় ?

অজীব্ আদমী হেঁ আপ।

ডাক্তার বললেন।

বাবু গণেশ রাম জিভ এবং মুখ একই সঙ্গে ভেঙিয়ে ডাক্তারের পেছন থেকে প্রচণ্ড হরকৎ করে আমাকে বুঝিয়ে দিল যে, সমুখে যিনি দাঁড়িয়ে তিনিই ঘনশ্যাম।

ফিস্ আপ্‌কি ? ডগ্‌দর সাব ?

বে-ফিক্কর রহিয়ে। বাবলুবাবু হামারা জান্ হি না লে লেগা আপসে ফিস্ লেনেসে। আপনে, শুনা বাঙ্গালকা বড়া রাইটার হেঁ। ফিলিম্‌উলিম্ বনা না দো চার ?

বললাম, বড়া রাইটার নেহী। পশ্চিম বঙ্গাল্‌কা মামুলী সী রাইটার হুঁ। ফিলিম্‌কি লায়েক কিতাবে হাম্‌সে আতা নেহি। ফিলিম্ উলিম্

www.BanglaBook.org

হুয়া। মগর প্রিফ ইক্-দো।

সমুক গ্যয়া। আপকি স্টাইল জারা দুসরা কিসিম্কি হ্যায়। ফিল্মকি লায়েক নেহি। মেরী বিবিনে বহত্ই পড়্তি।

বাংলা ?

হ্যা জী। নহী তো ক্যা ?

বাঃ। বড়া খুশ হুয়া শুনকর।

আপলোগোকি সত্যজিৎ রে ভি তো হিঁয়া আয়েথে। ইস বাংলোমে থী সিম্মি। নহী, শর্মিলা টেগোর। ছিপাদোহরমে ভি শুটিং হুয়া থা। কেচাকি মে।

জী হাঁ। ম্যায় জানতা হুঁ। সবহি তো মোহনবাবুকাই কিয়া হুয়া ইন্তেজাম থা। ছিপাদোহরমে মোহন নে রে-সাবকে জনমদিন মে বড়া শানদার পার্টি দিয়ে থে।

আররে সাহাব মোহন বাবুকি বাতে ছোড়্ দিজিয়ে। মেরী বিবি কহতি হ্যায় কি উনোনে কোই দুসরা জামানীকে আদমী লাগ্তা হ্যায়, উনকো খান-খরিয়াৎ, রাহান-সাহান, চাল-চলন দিখ্কে। যো জমানা চলা গায়ে, উও খলিল খাঁকো ফাক্তা-উড়ানা-ওয়ালে জমানেকে কোঈ নবাব-উবাব প্যায়দা হোকে ফিন্ ওয়াপস লে আয়ে হেঁ ইস্ ধর্তি মে, অ্যাইসাহি লাগতা।

বললাম, হ্যা আইসেহি বহত আদমী নে কহতা ভি হ্যায় উন্হিকা বারেমে।

তব ম্যায় চলে। আপ্ পড়শু তক্ বিলকুল ঠিক্ হো যাইয়েগা।

ডগ্দার সাব চলে গেলেন। ঘোড়াটার জন্যে বড় কষ্ট হতে লাগল আমার। এই গরম, তার পরে এই লাশ। ডগ্দর সাব্-এর না-দেখা বিবির জন্যেও খুব কষ্ট হল। বেচ্চারী। আফটার অল্ বাংলা বইয়ের পাঠিকা বলে কথা।

উনি চলে গেলেই রামলগনকে লাগিয়ে দিল বাবু গণেশ রাম বনফুল তেল লাগাতে সারা গায়ে।

বিহারের সারন থেকে তৈরি হয়ে আসে এই তেল। জৌনপুর-দরিয়াপুর থেকে। তেলটার মধ্যে বোধহয় ওরিয়েন্টাল বাম্ জাতীয় কিছু মেশানো আছে। সারা শরীরে মালিশ করে দিতেই এবং হাওয়া লাগতেই ঠান্ডা ঠান্ডা লাগতে লাগল।

শিশুকালে শোনা কানন দেবীর গাওয়া গান কানে ভাসতে লাগল। "আমি বনফুল গো, ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে···আমি বনফুল গো।" বনফুল তেল মেখে কল্পনায় বনফুল গান শুনতে শুনতে কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীর আরামে ঘুমিয়ে পড়লাম।

কিছুক্ষণ পর ডিজেল জিপ-এর শব্দে ঘুম ভাঙল। ছিপাদোহর থেকে এম. ভি. বি. এস ডাক্তার সঙ্গে করে নিয়ে এলেন রমেনবাবু ও বাবলু। তিনি

www.BanglaBook.org

সব পরীক্ষা করে ওষুধ লিখে দিলেন অনেকই। জিপ সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল ডালটনগঞ্জ ওষুধ আনতে। অন্য জিপটি গেল তাঁকে ছিপাদোহরে পৌঁছে দিতে। এই ডগ্‌দর সাব বললেন, জল যত পারেন খান।

বললাম, খাব।

উনি চলে গেলে ডগ্‌দর ঘনশ্যামের কথা বললাম ওদের। ভালুমার থেকে এসেছিলেন ঘোড়ায় চড়ে।

ওরা বললেন, ঐ এসেই ছিলেন। এখন পথেই বসে আছেন পাথরের ওপর বাসের প্রতীক্ষায়। আমাদের এই জিপই পৌঁছে দেবে যে জিপ গেল; ডগ্‌দরসাবকে পৌঁছতে ছিপাদোহর পর্যন্ত।

সে কি? ঘোড়া?

ঘোড়া মরে গেছে হার্ট-ফেল করে। লেহ্ লট্‌কা। পথের পাশে পড়ে আছে। হেগে-মুতে একাকার করে!

বাবলু বলল। আমার হঠাৎই টোড়ির রামচন্দরবাবুর কথা মনে হল; মানে তাঁর ঘোড়াটার কথা। তার অবস্থাও ঘনশ্যাম ডাক্তারের ঘোড়ার মতো হবে একদিন।

আবারও ডগ্‌দর সাহেবের বাঙলা-সাহিত্যরসিকা বিবির কথা মনে হল তৎক্ষণাৎ। ভাবলাম, যেখানেই অধুনা বাংলা-সাহিত্য সেখানেই গণ্ডগোল।

"বনফুল তেল" দেখে বাবলু একটু মাথায় মেখে নিয়ে আরেকবার চান করে লুঙ্গি পরে ফেলল।

এই তেল তো টেকো লোকেরা টাকে চুল গজাবার জন্যে ব্যবহার করে বলেই জানতাম। এখন তো শুনছি ধন্বন্তরী। ছিপাদোহরে ডগ্‌দার সাব তো লাগাতে বারণ করেননি।

না। তা করেননি।

আমি যাই।

বলেই চলে গেল বাবলু রান্নার ইন্তেজাম করতে।

পুলাউ রাঁধলে উম্‌দা। সঙ্গে ডাল। এঁচড়ের তরকারী। বেগুন ভাজা। মুরগীর মাংস। টোম্যাটোর চাটনী। জন-হেইগ হুইস্কি। মেয়েদের জন্যে থাম্পস-আপ্। আর চাঁদের ফুটফুটে আলো। সাজাবার দরকার নেই কোন। বাইরেই টেবল সাজিয়ে বুফের বন্দোবস্ত করে দেবে বলল সকলে মিলে। বাবু গণেশরাম, তওহি, রামলগন, ছোটু এবং শ্যামলবাবু যে জিপে আসবেন তার ড্রাইভার "উদে"ও থাকবে।

সবই ভাল। যদি শরীরটা একটু সুস্থ বোধ করতাম।

ডালটনগঞ্জ থেকে ওষুধ আসতে আসতে আবার ঘণ্টা দুই ঘুমিয়ে নিলাম। এত ক্লান্তি আর গায়ে ব্যথা যে চৌপাই থেকে উঠতেই ইচ্ছে করে না। কী করে যে সারাটা দিন সারাটা সন্ধে কেটে যায় বুঝতেই পারি না। মাঝে মাঝে রামলগন গা হাত টিপে দিলে যা আরাম লাগে একটু। ব্যাসস্। খুবই করছে রামলগন আমার জন্যে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওষুধ এল যখন, তখন সন্ধে হয়েছে। আবারও ওষুধ! এ কদিনে কত যে কড়াকড়া ওষুধ খেলাম খালি পেটে! সকালে চা আর বিস্কিট। তারপরই মাঠা। তারপর সারাদিনের খাওয়া নেই। রান্না এবং আদরের ত্রুটি নেই কোনো। কিন্তু খাওয়ার দেখলেই বমি আসে।

মুসলিম্ এসেছিল ওদের সঙ্গে। রমেনবাবুকেই বলছিল যে, আজ এক রহস্যময় সাহেব আর মেমসাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছে কুলীদের। একটি প্রাইভেট গাড়িতে করে তারা হুলুক্ পাহাড়ের চুড়ো পর্যন্ত গেছিলেন। হুলুক্ পাহাড়ে কেউই 'কার' নিয়ে যেতে চান না এদিকের মানুষেরা। খুবই খাড়া আর উঁচু পথ। তবে, কার যেতে পারে না এমন নয়। সেই অল্পবয়সী সুন্দর ও সুন্দরী সাহেব-মেমসাহেব কিন্তু পাহাড়চুড়োতে উঠেই নেমে এসেছিলেন। থাকেননি ওখানে।

ওঁরা কারা?

মুসলিম্-এর ধারণা যে ঐ গাড়িটা সি-সি-এফ-এর। মানে, চিফ কন-সার্ভেটর অফ ফরেস্টস।

রমেনবাবু বললেন, সি-সি-এফ এলে পুরো ফরেস্ট ডিপার্টএ হল্লাই না হয়ে যেত। জিপে জিপে ভরে যেত হুলুক্ পাহাড়ের চুড়োতে।

তাহলে, কে হতে পারে?

মুসলিম্ এক রহস্যের মধ্যে পড়ে গেল।

বাবলু বলেছিল, বুঝেছি রমেনদা। এরা নিশ্চয়ই পালিত সাহেবের মেয়ে জামাই। মেমসাহেব তো সত্যিই মেমসাহেব হচ্ছেন? না কি মিথ্যে? রাঁচীর রাতু রোডের পালিত মেমসাহিব। যাঁর ছিপাদোহরের বাংলোতে সত্যজিৎ রায়ের ছবির শুটিং হয়েছিল।

মতলব?

মুসলিম্ অবাক গলায় শুধোল।

আররে! দিশি মেমসাহেব না বিলিতি মেমসাহেব?

মুসলিম্ বলল, তা কুলীরা বলতে পারল না। হাবভাব নাকি বিদিশিরই মতো।

রমেনবাবু বললেন, দূর। এঁরা নিশ্চয়ই ঐ বাঙালি ভদ্রলোকেরা হচ্ছেন। সেই যে লাহিড়ী সাহেব বলছিলেন না আমাদের পরশু। কিশোর চৌধুরী না কি নাম? মারুমারে বাড়ি করে থাকবেন নাকি ভদ্রলোক। জঙ্গলমে মঙ্গল। হাতীর উপরে কাজ করছেন ওঁরা।

আমি বললাম, সঙ্গম লাহিড়ীকে রাতে খেতে বলে দিলে না? বেচারা ব্যাচেলর! একা থাকে।

বাঃ। বলেছি বৈকি। এটুকুও নিজেরা করব না মনে করেন? কোনো ব্যাপারই নেই। লাহিড়ী সাহেব অবশ্যই আসবেন। সঙ্গে ফরেস্টার রাজিন্দর সিং সাহেবও আসবেন।

এখন ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। পূর্ণিমা যত এগিয়ে আসছে ততই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জোর হচ্ছে আলো। বাবলু কাজের ফাঁকে ফাঁকে এসে বারান্দার টেবিলে রাখা ঝিয়ারে চুমুক দিয়ে যাচ্ছে। আর রমেনবাবু বসে চিভাস্-রিগ্যাল খাচ্ছেন একটু একটু করে।

দরজাটা খুলে রেখে দরজার সামনেই ঘরের মধ্যে শুয়ে আছি আমি, বাইরের বানভাসি আকাশে চেয়ে। আজ লাহিড়ী সাহেবের লোকেরা এসে জ্যাকারান্ডা গাছ দুটোকে কেটে দিয়ে গেছে। গাছগুলো বারান্দার সামনেই শুয়ে আছে। চোখ পড়লেই খারাপ লাগছে। দুটি মৃতদেহ। এদের সৎকার পর্যন্ত হয় না। অথচ আমাদেরই মতো প্রাণ আছে এদেরও।

একে একে অতিথিরা সকলেই এসে গেলেন। আমি মুখ চোখ ধুয়ে নিয়ে বারান্দার ইজিচেয়ারে এসে বসলাম। জামাকাপড় বদলে।

বসলেই, ব্যথাটা শুরু হয়। তারপর আস্তে আস্তে জোর হয়। ওখানেই বসে টুকটাক গল্প করতে লাগলাম। জঙ্গলের মধ্যের বন-বাংলোয় মানুষদের নিমন্ত্রণ করে আসতে বলে নিজে শুয়ে থাকা যায় না। যতই শরীর খারাপ থাক না কেন। অবশ্য আমি কেউই নই। রমেনবাবু আর বাবলুই সব কিছু। ওরফে, মোহন বিশ্বাস। প্রিন্স অফ পালাম্যু।

ওদের হাসি, গল্প, গান সব যখন বেশ জমে উঠেছে, মিসেস ব্যানার্জী, মানে জুবিলী বৌদি গান গাইছেন, এমন সময় বাংলোর হাতাতে আরও একটি গাড়ির আওয়াজ। কার-এর আওয়াজ। জিপের নয়।

কে এল ? কে এল ?

ত্রিদিবের পরিচিত এক দম্পতি। বেতলা থেকে ত্রিদিবরা আমার কাছে এসেছে খবর পেয়ে চলে এসেছেন এখানে।

একটু পর ত্রিদিবই ওঁদের এনে আলাপ করিয়ে দিল। পাপড়ি ও কিশোর চৌধুরীর সঙ্গে। লাহিড়ী সাহেবও ছিলেন সেখানে।

বললাম, বাঃ। আমি যে স্বপ্ন চিরদিন দেখেই এলাম, তুমি সেই স্বপ্নই সত্যি করতে চলেছো কিশোর এই জীবনে। এবং এত অল্প বয়সে। কলকতা থেকে ওরা দুজন গাড়ি চালিয়ে এসে একেবারে নির্জনে দীর্ঘদিন এইভাবে কাটিয়ে যায়।

আবারও বললাম, বাঃ!

চাঁদের আলোই ছিল শুধু। ওদের ফর্সা মুখ দুটি দেখে মনে হল ওরা দুজনেই তিরিশের নিচে। সত্যিই খুব ভাল লাগল। পাপড়ির কৃতিত্ব, আমি বলব, কিশোরের চেয়েও বেশি। পাপড়ির যদি জঙ্গল ভাল না লাগত তবে কিশোর একলা হয়ে যেত। অনেকেই যেমন হয়ে যায় আস্তে আস্তে। প্রকৃতিকে একবার প্রেমিকা করলে অন্য কোনো প্রেমিকা মনে ধরে না। তারা থাকলেও অল্পক্ষণের। প্রকৃতির মতো এমন প্রতি মুহূর্তেই, সব ক্ষণেতেই সব ঋতুতেই ঋতুমতী, ভরন্ত, ফুলফলন্ত প্রেমিকা আর হয়ই না। প্রকৃতির সঙ্গে বেশির ভাগ প্রকৃতি প্রেমিকেরই স্ত্রী অথবা প্রেমিকার সতীনের সম্পর্ক।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিশোরের বোধহয় হাতীই বিশেষ ঔৎসুক্যের বিষয়। যা মনে হল। নইলে, মারুমারে তেরা বানাচ্ছে কেন? বলল, 'অ্যামঙ্গ দ্যা এলিফ্যান্টস্'-এর লেখক নাকি কলকাতায় এসেছিলেন। বইটি এক তরুণ দম্পতির লেখা। বইটি পড়েছিলাম, কয়েক বছর আগে। আয়ান এন্ড ওরিয়া ডগলাস হ্যামলটন্-এর লেখা। আয়ানের কথাই বলছিল কিশোর। কিশোরের সঙ্গে দেখাও হয়েছিল।

আমি বললাম, হাতী সম্বন্ধে এ দেশেও একজন আছেন, আমাদের লালজী। তাঁর কাছেও পাঠ নিতে পারো। ধৃতিকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী, উত্তরবঙ্গের পটা গুহ, কলকাতার আরেকজন, চঞ্চল সরকার এদের কাছ থেকেও অনেক জানতে পারো।

শিকার যাঁরা করেন বা এককালে করেছেন তাঁদের সম্বন্ধে একেবারেই বন্ধ-মন দেখলাম কিশোরের। বন্ধ-মন থাকাটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। সকলেরই কিছু-না-কিছু দেওয়ার আছে। কম বেশি, জানানোর আছে। তাই মন-বন্ধ করে রাখলে লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি। মনে হল, কথাবার্তায় বন-বিভাগের উপরও কিশোরের রাগ আছে। রাগ থাকা খারাপ নয়। তবে সব রাগের পেছনেই যুক্তি দিয়ে তাকে ট্যাকসই করা চাই। আশা করি কিশোরেরও যুক্তি আছে। ঐরকম মিশ্র-সঙ্গে তা বেশিক্ষণ কোনো বিশেষ টেক্‌নিক্যাল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যায় না। পরে হবে হয়ত, কলকাতায় ফিরে কখনও।

ওদের দুজনের সঙ্গেই কথা বলে যে কারণে সবচেয়ে ভাল লাগল তা হচ্ছে ওদের উৎসাহ। উৎসাহ, যৌবন এবং ওদের হাতে এখনও অঢেল সময় পড়ে আছে। এ সবের তো কোনো বিকল্প নেই। পূর্ব আফ্রিকার ডালা উপত্যকায় আয়ান এবং তার স্ত্রী ওরিয়া থাকত। হাতীর প্রেমই ওদের প্রেমের কারণ। বিয়ে করে, দুজনে ঐ হাতীদের মধ্যেই থাকত। যতদূর মনে পড়ছে বাচ্চাও বোধহয় ওদের ওখানেই হয়। একটি হাতীর দলকে লক্ষ্য করে ঐ বইটি দুজনে মিলে লিখেছিল। আমি যখন আফ্রিকার ঐ অঞ্চলে যাই, তার অনেক আগেই কাজ শেষ করে ফিরে এসেছিল ওরা।

কে জানে? একদিন পাপাড়িও হয়তো জয় অ্যাডাম্‌সনের মতো কোনো লেখা লিখতে পারবে! কে বলতে পারে? ওরা যদি সৎ হয় ওদের যৌবনের উচ্ছলতার বুড়বুড়ি যখন শান্ত হয়ে আসবে, চোখের দৃষ্টি যখন আরও স্বচ্ছ হবে ওরা হবে আরও সহনশীল, তখন ওরা আমাদের দেশের বন্য প্রাণীদের সংরক্ষণের ব্যাপারে ওদের কোনো স্থায়ী অবদান হয়তো রেখেও যেতে পারে। "মারুমারে" যে বাড়িটা বানিয়েছিল ওরা হাতীতে ইতিমধ্যেই তা ভেঙে দিয়ে গেছে একবার।

তারুণ্য আমার বড় প্রিয়। যা কেউই করে না, তাইই যারা করতে চায়; তারাও। সেই রাতে, পাপাড়ি আমার পাশের কাছে বসেছিল। বারান্দাতে চেয়ারের সামনে। কিশোর, সামনের চেয়ারে, বারান্দার নিচে, বাংলোর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাতার। চাঁদের আলোর মধ্যে বসে ওদের মনপ্রাণ খুলে আশীর্বাদ করলাম, যেন ওদের স্বপ্ন একদিন সত্যি হয়। এই দেশে, এই সময়; ওদের মতো অনেক যুবক-যুবতীর দরকার।

কলকাতায় ফিরে ওদের মুখদুটি দিনের আলোয় দেখতে হবে। চিনতেই পারব না হয়ত পরিচয় না দিলে। চাঁদের আলো যেমন খুউব ভাল তেমন আবার খারাপও পরিচিতদেরও অপরিচিত বলে ভুল হয় আর অপরিচিতদের পরিচিত বলে।

বাবলু কেমন রান্না করেছিল সে রাতে জানি না। তবে সকলেই আহা। আহা। করল।

পাপড়ি ও কিশোরকেও জোর করে খাইয়ে দিল বাবলু। ভালই হল। বেশিক্ষণ থাকতে পারল ওরা। কিন্তু কোন্ অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার থেকে এত লোককে যে খাওয়াল ও, তা বাবলুই জানে। তুক্-তাক্ কিছু জানে নিশ্চয়ই।

সকলে যেতে যেতে রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা। লাহিড়ী সাহেবের সঙ্গে ফরেস্টার রাজিন্দর সিংও এসেছিলেন। তবে উনি নিজের দলবলে ছিলেন অন্যত্র। খেয়েছিলেন যদিও।

ওদের সবাইকে সি-অফ্ করে ফিরে আসতেই ব্যথাটা আবার তীব্র হয়ে ফিরে এল। ওষুধ তো খাচ্ছি মুঠো মুঠো। খাবারের মধ্যেও কিছুই খাইনি আমি। বাবলু ভেজিটেবল্ স্টু আর গলা ভাত করছিল আমার জন্যে।

হৃদয়বান বিশ্বস্ত রামলগন এসে গা টিপতে লাগল। শুধোল, রাত বহত্ হুয়া হজৌর। দরওয়াজা বন্ধ কর দেগা?

আমি ডানদিকে কাৎ হয়ে শুয়ে চাঁদের বনের দিকে চেয়ে বললাম, না, থাক। আজ সারারাত খোলাই থাক। রমেনবাবুর এনে দেওয়া পাতলা জয়পুরী লেপ গায়ে দিয়েই না হয় শোব।

রামলগন বলল, না না তা হবে না। মহুয়ার সময়। চারধারে ভাল্লুক।

জানোয়ারের ভয় দেখাচ্ছ আমাকে? রামলগন?

না, না। জানোয়ারের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। জানোয়ার ছাড়াও এই চাঁদনী রাতে বনে বনে অনেক কিছু ঘোরে। যাদের দেখা যায় না। দরজা বন্ধ করে শুতে হবে হজৌর।

কী করে বোঝাব রামলগনকে?

এমন চাঁদের রাতে কত রাত নদীর বালিতে, পাথরে প্রান্তরে বন্দুক রাইফেল কোলবালিশ করে কাটিয়েছি। বিহারের বিভিন্ন জঙ্গলে গোপাল, সুব্রত, নাজিম সাহেব, শামীম, কাড়ুয়া, আলোয়া, যুগল, বিজা পুকার সাহেবের সঙ্গে, বাবার সঙ্গে। উড়িষ্যার চাঁদুবাবুদের সঙ্গে। আসামে আবু ছাত্তারের সঙ্গে। হ্যাঁ, ছাত্তার ছিল কুখ্যাত পোচার। ভীষণ রগচটা ছিল সে। একদিন জমি নিয়ে বিবাদে তার পাঁচজন না ছজন আত্মীয়কে গুলি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করে মেরে দিয়েছিল ছাত্তার। টাকা পয়সা পাঠিয়েও ওর ফাঁসী আটকাতে পারিনি।

যে দিন চলে গেছে, সে দিন গেছেই। বয়সের নিয়ম, কালের নিয়ম, সময়ের নিয়ম সকলকেই মানতে হয়। যে দিনে বা রাতে এ জীবনে আর ফেরা হবে না কখনও, এই সুগন্ধি রাতচরা পাখির ডাকে ছিদ্রিত রাতের বনের দিকে চেয়ে কল্পনায় অন্তত ফিরে যেতে চাই সেখানে। না রামলগন। বারণ কোরো না আমাকে। জঙ্গলের মধ্যে এলে, একা হয়ে গেলে কী দিনে কী রাতে, আমি বড় ভাল থাকি। একা থাকলে, শরীর মনের সব দুঃখ আমার অপনোদিত হয়ে যায়।

দুঃখ কোন্ মানুষের নেই? যার নেই, সে হয়তো এখনও মানুষই হয়ে ওঠেনি। মনুষ্যোচিত দুঃখ যদি কেউ ভুলতে চায়, তাকে আমি জঙ্গলে আসতে বলি।

বাবলু কিশোর-পাপড়িদের কথা ওঠায় ঠাট্টা করে বলেছিল বটে "জঙ্গলমে মঙ্গল।" কথাটা কিন্তু সত্যিই। প্রকৃতির সঙ্গর মতো নিত্য-মঙ্গলময়, নিভৃত, পরম প্রাপ্তি এই বিংশ শতাব্দীর মানুষের অন্য কিছুই নেই।

পুবের আকাশে দুম্বি পাহাড়ের চুড়োর উপর একটি আলো দেখা যায় তারার মতো। রামলগন শুয়ে-থাকা আমার কানের কাছে স্বগতোক্তির মতো বিড় বিড় করে কত অচেনা জায়গার কথাই বলে চলে। দুম্বি পাহাড়ের মাথায় ওয়্যারলেস্ স্টেশনের আলো। হয়ত টাইগার প্রজেক্টেরই হবে। ঐ পাহাড়ে পৌঁছতে হলে ডুংরী, জেরুয়া-জগ্‌তু গ্রাম, বাঁকি-পিঁপড়া, তুমার, কোপে, লাক্কা-কোপে, কত কী জায়গা সব নাকি পেরিয়ে যেতে হয়।

পৃথিবীর কত সমুদ্র পেরুলাম। কত দেশের মাটিতেই পা ফেললাম কিন্তু দেখা হয়নি এখনও কিছুই। তাছাড়া, অনেক কিছুই থাকে জীবনে, যা না দেখাই ভাল নিজের চোখে। এই রাত, এই মোহগ্রস্থতা, শারীরিক অসুস্থতা, তারই মধ্যে এই হরিজন মানুষটি, এই সরল দোসাদ রামলগন, যার TORSO আফ্রিকানদের মতো, যার মুখে গভীর বলিরেখা, অভিজ্ঞ, ভালোমানুষ দেশবাসী আমার, আমার ভাই; তার বিড়বিড়ানির মধ্যে দিয়ে আমাকে যে কল্পলোকে নিয়ে চলেছে হাত ধরে সেখানে যে শুধু মনে মনেই পৌঁছনো যায়।

সব জায়গা, সব নারীকে, শরীর দিয়ে ছুঁতেও নেই। কোনো কোনো স্থান থাকে, জেরুয়া-জগ্‌তু বা বাঁকি-পিঁপড়া গ্রামেরই মতো, কোনো কোনো নারী থাকে, যেখানে বা যাদের কখনও শারীরিকভাবে যাওয়ার বা পাওয়ার চেষ্টা করতে নেই। মানুষের জীবনে, প্রতিটি মানুষের জীবনেই, এই সব অশরীরী গন্তব্য, প্রেম, প্রার্থনাই শেষ পর্যন্ত তার পাথেয় হয়। অবলম্বনের মতো অবলম্বন। মন দিয়ে, কল্পনা দিয়ে যা পাওয়া যায়, তা কি শরীর দিয়ে কখনওই যায়?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যারা বোঝে এ কথা, তারাই বোঝে।
সব কথা তো সবার জন্যে নয়।

কেঁদুলি ৪।৫।৮৫

কেমন করে যে কেটে গেল দুটি দিন যেন টেরও পাওয়া গেল না।

একটা ঘোরের মধ্যে আছি। পরশু রাতে একটা ব্যাপার হয়েছিল। আমার পশ্চিমের ঘর আর মধ্যের হল-ঘরের দরজা ভেজিয়ে শুই। ভারী শালকাঠের বহু পুরোনো দরজা। তায় নতুন রঙ হয়েছে বলে বন্ধ হয় না। মাঝরাতে কে যেন জোরে ধাক্কা দিয়ে দড়াম করে দরজাটা খুলল, তারপর ঘরের মধ্যে তিনটি টেবিলের জিনিসপত্র ঘেঁটে কী যেন খুঁজল। সেই শব্দ পেলাম। তারপর আওয়াজটা সারা ঘর ঘুরে আমার খাটের কাছে এল, এসেই মিলিয়ে গেল।

বালিশের পাশ থেকে টর্চ তুলে নিয়ে জেবলেই বললাম, কে?

দেখলাম ভারী দরজা যেমন বন্ধ ছিল তেমনই আছে।

তখন মনে হল, প্রথম রাতেও এরকম শুনেছিলাম যেন। হলঘরে রোজই হয় গণেশরাম, নয় রামলগন শোয়। বাইরের সব দরজা বন্ধ থাকে। ছিটকিনি তোলা।

কে জানে? কে আসে? কি চায় সে? সে কি মৃত্যু? সে কি চোর? কি আছে আমার যে চুরি করবে? আমি যে সর্বস্বান্ত। যে আসে, সে কি পুরুষ না নারী? হাত পায়ের মল-এর শব্দ পাই, অস্পষ্ট। অথচ মেঝেতে তার পায়ের শব্দ পাই। জঙ্গল পাহাড়ের মানুষরা খালি পায়ে পাথুরে জায়গায় চলে বলে, সিমেন্টের উপরে তারা হাঁটলেই একটা ঘষা শব্দ হয়।

ভূত-প্রেতে বিশ্বাস নেই। বহুবার, বহু কুখ্যাত ভুতুড়ে বাংলোতে সেই শব্দটা শুনিনি।

ভূত দেখার জন্যে গিয়েও তাদের দেখা পাইনি। ভূতেরা বোধহয় অন্য ভূতকে দেখা দেয় না। পেত্নীর দেখাও পাইনি। জানি না, কে আসে গভীর রাতে অশরীরী? কেন আসে সে? কি চায় আমার কাছে?

আজ দুপুরে যখন অজ্ঞানের মতো ঘুমুচ্ছিলাম যখন নাকি পাপড়ি আর কিশোর এসেছিল। বিকেলে রামলগন কার্ড দিল ওদের। পেছনে লিখে গেছে "উই ওয়্যার পাসিং দিস ওয়ে, জাস্ট ড্রপড্ ইন টু এনকোয়্যার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাউট ইওর হেলথ।"

র মলগন ওদের কি বলল কে জানে?

অবশ্য কথা বলার মতো বা উঠে বসার মতো অবস্থা এখন আমার নেই।

বেলা পড়ে আসছিল। রামলগন তওহির কাছ থেকে চা আনতে গেল। চা টাই খাই, পাতলা করে সকাল বিকেল। দুধ কম, চিনি খুব কম দিয়ে।

কী একটা পাখি ডাকতে ডাকতে চলে গেল নৈঋত থেকে ঈশানে। কী পাখি? এর ডাক শুনিনি কখনও আগে। উঠে গিয়ে দেখব যে সে অবস্থাও নেই।

কত কিছুই যে অজানা, অদেখা আছে এখনও। প্রকৃতির এই গভীর রহস্য ও সৌন্দর্যের কতটুকুই বা উন্মোচিত হয়েছে আমার কাছে আজ অবধি। সামান্য; অতি সামান্য।

হাজার হাজার কিমি পথ পেরিয়ে কেমন করে ছোট্ট ছোট্ট পাখিরা পাহাড় সমুদ্র নদী পেরিয়ে যে প্রতি বছর শীতের দেশ থেকে আসে আবার পথ চিনে চলে যায় এ কথা ভাবলেও অবাক লাগে। শুধু, আসে যে তাইই নয়, যে হাঁস, যে বিলে নেমে গুগ্‌লী খেয়ে গেছিল, যে পাখি যে গাছের যে ডালে বসে গান গেয়েছিল, ঠিক সেই বিলে এবং সেই ডালে এসেই বসে তারা প্রতি বছর। ভাবলেও অবাক লাগে। হাজার হাজার মাইল পেরিয়ে। ম্যাপ নেই, চার্ট নেই, কম্পাস নেই, রাডার নেই, তবু ঠিক চলে আসে।

গ্রীকদের দেব-দেবীদের মধ্যে "নোমাসীন" বলে এক দেবী ছিলেন। তিনিই ছিলেন স্মৃতিশক্তির দেবী। উনি আবার সবরকম কলাবিদ্যারও জননী। নোমাসীনেরই দয়াতে, একটি ছোট্ট নাইটিঙ্গেল পাখির ছোট্ট মস্তিষ্কতেও সব-কিছু ছবির মতো আঁকা থাকে। শীতের সময় আফ্রিকা থেকে ঘুরে এসে সেই নাইটিঙ্গেলই ইউরোপে তার নিজের গাছে নিজেরই ডালে বসে আবার গলা ফুলিয়ে তার প্রাণের বন্ধুকে ডাকে। নোমাসীনের দয়াতে এই প্রতি বছরের পরিযায়ী পাখিদের মস্তিষ্কে, ওরা ওড়া শুরু করলেই স্বদেশে বা বিদেশে যেদিকে যাচ্ছে, সেই দিকের ছবি একের পর চোখের সামনে টেলিভিসনের পর্দার ছবির মতো সুন্দরভাবে ভেসে উঠতে থাকে। সেই সব ছবি মিলিয়ে মিলিয়ে ওরা উড়ে যেতে থাকে।

কোনো কোনো পাখির ডানাতে র‍্যাডারের মতো যন্ত্রও বসানো থাকে। গভীর অন্ধকারেও এরা অচেনা দেশের উপর দিয়ে ঠিকই উড়ে যায়।

পথ যিনি জীবের প্রাণ দিয়েছেন; তিনিই ঠিক করে রেখেছেন। আকাশের মধ্যে পথ, জলের মধ্যে পথ। সমুদ্রের মাছেরা কী করে পথ চিনে প্রতি বছর একই জায়গা থেকে অন্য একই জায়গায় যায় হাজার হাজার মাইল দূরে?

প্রতি বছর ইওরোপের সমুদ্র থেকে সারগেসো সমুদ্রে হাজার হাজার কিলোমিটার চলে যায় ঈল্ মাছেরা অ্যাটলান্টিক পেরিয়ে। দেখা গেছে, সমুদ্রের নিচে, বিভিন্ন গভীরতায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নানা তীব্র

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জলস্রোত বয়ে চলেছে একই পথ ধরে, একই দিক থেকে অন্য দিকে। এক সমুদ্র থেকে অন্য সমুদ্রে। এইগুলিই হচ্ছে সামুদ্রিক "হাইওয়ে"। জলের তলার প্রাণীদের।

গালফ্‌স্ট্রিমের মধ্যে দিয়ে আটশ মিটার মতো তলা দিয়ে প্রচণ্ড তীব্র গতির এক জলস্রোত বয়ে চলেছে। ঈল্‌ মাছগুলো এই স্রোতের কাছাকাছি এসে আটশ মিটার নেমে এই জলস্রোতের তোড়ের মধ্যে মিশে যায়, তারপর দিব্যি সেই স্রোতে গা ভাসিয়ে প্রচণ্ড বেগে হাজার হাজার নটিক্যাল কিমি. জলের মধ্যে পেরিয়ে এসে সারগোসা সমুদ্রে এসে পড়ে, অ্যাটলান্টিক পেরিয়ে।

কে জানে, জলের নিচের হাইওয়েগুলি কেমন দেখতে? জলের নিচেও পাহাড় আছে, বন আছে, ফুল আছে, ফুলের মধ্যে ফুল, নদীর মধ্যে নদী, লাল নীল সবুজ হলুদ কত রঙের উদ্ভিদ, কোরাল, মাছ, সমুদ্রের মধ্যে সমুদ্র, চৌমাথা, ট্রাফিক লাইট, কে জানে কত কী আছে। ভাবলেও অবাক লাগে সমুদ্রের বুকের ভিতরের এই সব হাইওয়ের কথা। মাছদের পথ চেনার ক্ষমতার কথা। মাছেরাও বাঘেদেরই মতো অনেক সময় গন্ধ ছড়িয়ে পথরেখা চিহ্নিত করে যায়। ছোট্ট ছোট্ট পাখিদের মস্তিষ্কে আধুনিকতম কম্প্যুটার-এর চেয়েও বেশি দক্ষ সব মেশিন কে বানিয়ে দিল যে, সে কথা ভেবেই অবাক লাগে।

মানুষ আমরা, নতুন নতুন আবিষ্কারকে, উদ্ভাবন বলে চেঁচিয়ে বেড়াচ্ছি। এ সবই তো ছিল। যিনি এই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, যিনি পাখির গলায় সুর দিয়েছেন, তার ডানায় দিয়েছেন রঙ, নারীকে করেছেন সুন্দর, নম্র, পরিপ্লুতির নিটোল যন্ত্র তাঁকে আবিষ্কার করে না কেউই; খোঁজে না, তাঁর জয়গান করে না।

আমার মস্তিষ্ক এখন এমনই অসংবদ্ধ যে কোনো কিছু বেশিক্ষণ চিন্তা পর্যন্ত করতে পারি না। চোখ বুঁজে আসে। চৌপাইয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। চৈত্রশেষের হাওয়া বাংলোর আঙিনাতে ঝরে পড়া শুকনো পাতা, খড়কুটো, জ্যাকারান্ডা ফুল, আমার অসুস্থ মস্তিষ্কের অসংলগ্ন স্মৃতি সব ঝাড় দিয়ে নিয়ে চলে যায় দমকে দমকে এসে। ঝর ঝর ঝর·····ঝর···ঝর·····ঝর···ঝর···

ঝরো ঝরো ঝরো ঝরো ঝরে রঙের ঝরণা
আয় আয় আয়, আয় সে রসের সুধায় হৃদয় ভর-না।
সেই মুক্ত বন্যাধারায় চিত্ত মৃত্যু আবেশ হারায়,
ও সেই রসের পরশ পেয়ে ধরা নিত্যনবীনবর্ণা॥

ঘুম। ঘুম। এই শব্দমঞ্জরী আর গন্ধমঞ্জরীর মধ্যেই যেন কোনোদিন চির ঘুমে ঢলে পড়তে পারি। হাসপাতালে বা বিছানাতে যেন মৃত্যু না হয় আমার।

এস্টারোস্ট্রেপ্, অ্যানজিপ্যাম, জেলুসিল, এম. পি. এস্; ইলেকট্রাল্; অ্যালকাসিট্রন্, যবের ছাতুর গেলাস-গেলাস শরবত, নুন দিয়ে; "বনফুলের"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তেল সর্বাঙ্গে, মাহাতোর বাড়ি থেকে বাবু গণেশ রাম-এর নিয়ে আসা প্রভাতী মাঠ্ঠা সবই চলছে সমানে। চলবে। স্ন্যাস্নিল। প্যানক্রিয়ন্। সাইমেটাইডিন্ এবং পলিক্রল। চলছে। চলবে।

শরীর ক্রমশ দুর্বল। রাত নিদ্রাহীন। সর্বাঙ্গে জ্বালা-যন্ত্রণা। তবু তো জঙ্গলে আছি। ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসে খাটুনির দিনগুলি শুধু এই চৈত্র শেষের বনের দিন কটির কথা ভেবেই পার করে দিয়েছি।

ম্যান প্রোপোজেস গড্ ডিসপোজেস্।

আজ সকালে বাবু গণেশ রাম আবারও বলেছে যে, পেটের "গ্যাসকিট্" এর জন্যেই এরকম হচ্ছে হজোর। সকালে বিকেলে গুনে গুনে বাহান্নটি ডন-বৈঠকী মারলেই বিমার আপনার উতার যাবে।

সকালে চা-টা খাই। দুটি বিস্কিট দিয়ে। সারা রাত ছটফট করি। কত হাজার বার যে পাশ বদল করি তার ইয়ত্তা নেই। তবুও বে-পাশী এখনও। মুখ ধুই। চা খাই। একটুক্ষণ বারান্দায় চেয়ারে বসি। মেয়েগুলো দূর দূর গ্রাম থেকে কাজ করতে আসে। হাসে। কলকল করে। ওদের দিকে চেয়ে বুঝি যে জীবন বা যৌবন বা দিন কারো জন্যেই বসে থাকে না। সাতনদীরার জলরেখার মতোই চল্কে চলে সকলেই। পথপাশে অসুস্থ আমি বসে আছি কি নেই তা কেই বা দেখে। কারো জন্যেই কেউই বসে থাকে না। যে থেমে রইল সেইই পড়ে রইল। তাকে ফেলে রেখে ঝরাপাতার মতো পায়ে মাড়িয়ে যৌবন, জীবন, দিন সব দ্রুতপায়ে দৌড়ে যাবে।

রামধানীয়া চাচা এসেছিল। ততক্ষণে ব্যথাটা আবার আরম্ভ হয়ে গেছে। রোজ রাতে ভাবি, কাল ভাল হয়ে যাব। গাড়ুর বাজারে গিয়ে পান খাব, মারুমারের বারান্দায় বসে বিয়ার খাব একটা, তারপর মহুয়াডার যাব, নয়ত রুদ হয়ে, বানারী হয়ে নেতারহাট। যদিও নেতারহাট এখন বাজার। জঙ্গলে জঙ্গলে হেঁটে বেড়াব।

নাঃ। প্রতি সকালে নতুন করে আশাভঙ্গ হয়।

রামধানীয়া চাচা আসাতে ঘরে গেলাম। পুবের ঘরে। পশ্চিমের ঘরে শুধু রাতেই শুই।

চাচার জন্যে চা আনতে বলে, বললাম, গান শোনাও চাচা।

শাদীর গান ধরল চাচা একটা।

রাজা ঘরে হাতী লো, লোহার ঘর ভাতিলো
সাইয়া ঘর সইতীন্ ভেল্ ভারী
মটর ত চালাতে বাবু থক্ গেল ক্যায়া
ত ঘরনী পছতাওয়ে…
কলম ত চলতে বাবু থক্ গেল ক্যায়া
এ ঘরনী পছতাওয়ে…

বাঃ। বাঃ। আমি বললাম, পেটে হাত দিয়ে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চৌপাইয়ে লম্বা হয়ে বললাম, আরও শোনাও, থামলে কেন চাচা ?

বিন্ পুরুখকে তিরিয়া বানা বৈঁচ কাক্ হ্যায়
মহুয়াপরে জানাম যারা সাওন যারা নেহি বিছন্ নেহি গেল ।

হাসলাম আমি । এই গানের কথাগুলি বেশ । একজন অপদার্থ পুরুষের গান, খেদোক্তিতে ভরা ।

রামলগনকে ডাকলাম চা আনতে চাচার জন্যে । রামলগন যেন উত্তরও দিল শুনলাম । এরই মধ্যে কী হয়ে গেল আমার । তীব্র যন্ত্রণায় জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম ।

জ্ঞান যখন ফিরল তখন দেখি একটি কালো অ্যাম্বাসাডর গাড়ির পিছনের সিটে আমি শুয়ে আছি । ঠাণ্ডা লাগছে । বুঝলাম, গাড়িটা এয়ার কণ্ডিশানড্ ।

রমেনবাবু বললেন, কী হল লালাদা ? জল খাবেন ?

আমি কোথায় ? বলেই নিজেই বুঝতে পারলাম যে, লাতেহারের কাছাকাছি এসেছি আমরা ।

কী হয়েছিল আমার ?

অজ্ঞান হয়ে গেছিলেন । গণেশ আর রামলগন তক্ষুণি আপনাকে নিয়ে আসে ডালটনগঞ্জে । মোহন কাল রাতেই ফিরেছিল দিল্লী থেকে । সঙ্গে সঙ্গে শহরের সবচেয়ে বড় ডাক্তারকে ডেকে দেখিয়েছিল । এবং আমাদের গালাগালিও করল এঁকেই আগে দেখাইনি কেন বলে ।

ডাক্তার ইনজেকশান্ও দিয়েছিল । নতুন ওষুধ । এখন ব্যাথা কেমন ?

কম । আবারও ওষুধ । কিন্তু খিদে পাচ্ছে না একটুও ।

পাবে কলকাতা ফিরলে । এবারের যাত্রাটাই অশুভ । কার মুখে দেখে বেরিয়েছিলেন ?

মনে নেই ।

প্লেনের টিকিট ? পাবে ? আমি উদ্বেগের সঙ্গে বললাম ।

হ্যাঁ হ্যাঁ । মোহন অলরেডি ফোন করে দিয়েছে আদিত্যকে রাঁচিতে । সব বন্দোবস্ত পাকা আছে । আমাকে মোহন বলেছে আপনাকে একেবারে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে তবে আমার ছুটি । আদিত্য কলকাতাতেও গৌরকে বলে দেবে ।

কে গৌর ?

আমাদের গৌর । গৌর মুস্তাফী । গাড়ি পাঠিয়ে দেবে এয়ারপোর্টে গুরুকে দিয়ে । কোনো অসুবিধা হবে না । বৌদিকে জানায়নি মোহন । অযথা চিন্তা করবেন । তাছাড়া আজই তো পৌঁছে যাবেন বাড়িতে, তখন নিজের ডাক্তার ডেকে যা চিকিৎসা করার করবেন ।

আমি উঠে বসলাম পেছনের সিটে । দেখি, গাড়ি চালাচ্ছে সামসের,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিষুণ নয়।

সামসের বলল, আভি ক্যায়সা লাগ রাহা হ্যায় হুজৌর ?

বললাম, আচ্ছা। মগর তুম গাড়ি ঠিকসে চালাও।

সামসের হাসল।

ও যদিও গাড়ি চালায় কিন্তু অনেক প্লেনও তার চেয়ে আস্তে চলে।

রমেনবাবু বললেন, না, না মোহনের ডিউটি করে করে এখন ও অনেকই আস্তে গাড়ি চালায়।

লাতেহার পেরিয়ে গেলাম। আবার জঙ্গল। কত পাতলা হয়ে গেছে জঙ্গল। ভবিষ্যৎ বলে থাকবে না কিছুমাত্র আর। বড় মন খারাপ লাগে।

বিকেলের মধ্যে রমেনবাবু আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন। আবার ডিজেলের ধোঁয়া, টেলিফোন, অফিস, আবার সেই একঘেয়ে ক্লান্তিকর জীবন। লেখা, রাত জেগে জেগে অফিসের পর। আবার নির্বাসন জঙ্গল থেকে।

এবারের মতো।

রমেনবাবু বললেন, এই নিন জল।

বলেই সামনের বড় ফ্লাস্ক থেকে ফ্রিজের জল গ্লাসে ঢেলে দিলেন।

বড় লজ্জা যদিও এঁদের কারো সঙ্গেই সম্পর্কটা আমার ফরম্যালিটির নয়। এদের ঋণ জীবনে শোধার নয়।

বললাম, এবারে খালি আপনাদের সকলকে জ্বালাতেই এসেছিলাম।

রমেনবাবু বললেন, কোনো ব্যাপারই নেই। আর আপনি নিজে যে একটুও ঘোরাফেরা করতে পারলেন না এবারে ? সেইটেই তো আমাদের দুঃখ।

গেলাসটা ফেরৎ দিতে দিতে ভাবছিলাম, এই মোহন বিশ্বাস, যার ভাল নাম আর. কে. বিশ্বাস। তাঁদের এবং রমেনবাবুদের সকলের কথা। মোহনের বাবা মুকুন্দলালবাবু মোহনের পুরো পরিবারের এবং রমেনবাবুদের সকলেরই আন্তরিক ভালোবাসায় ধন্য হতেই গত ত্রিশ বছর ধরে এই সব অঞ্চলে বছরে বহুবার করে এসেছি। কখনও একা, কখনও সদলে। মোহনের মেজকাকা ডা. ডি. এন. বিশ্বাস, আবিবাহিত, নিরামিষাশী। এখনও ডাক্তারী করেন। ছোটকাকা বি. এন. বিশ্বাস। তাঁর কাজ ছিল মুখ্যত ওড়িশায়। গেছিলাম একবার রামরাতে। তাঁর জঙ্গলে। মোহনের ছোট ভাই রতন, মাসতুতো ভাই শানটু—এঁরা সকলেই কী যে করেছেন আমার জন্যে তা সত্যি বলে বোঝানো যায় না। পালামুকে, ওঁরা যা আকলে, এমন করে জানার সুযোগ আমার কখনও হতো না।

তিরিশ বছর তো খুব সামান্য সময় নয়!

'কোয়েলের কাছে' বা 'কোজাগর' এবং এই পালামুর পটভূমিতে লেখা অসংখ্য গল্প সত্যিই কখনই লিখতে পারতাম না প্রথমদিন থেকে এঁদের সকলের এই সমাদর ও আন্তরিক আতিথেয়তা না থাকলে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এই ঋণ এ জীবনে শোধবার নয়।

সব ঋণ হয়তো শোধবার নয়ও। কারণ শোধা যায় না। তবে স্বীকার করা নিশ্চয়ই যায়। তাইই সুযোগ হলেই স্বীকার করি এবং ঈশ্বরকে বলি, যদি তিনি থেকে থাকেন, যে এঁদের সকলের ভাল হোক। সুখী হোন এঁরা। ঈশ্বর মঙ্গল করুন এঁদের প্রত্যেকের।

আমার মতো গভীর ঋণে আবদ্ধ একজন মানুষ, যার ঋণ শোধার ক্ষমতা নেই, সে সেই ঋণ সবসময় স্বীকার করা ছাড়া আর কীইই বা করতে পারে?

এঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা তাই এমনি করেই বুকে বয়ে বেড়াই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পুরুনাকোট, অংগুল, ওড়িশা ১৯৭০

বেলা পড়ে এসেছিল। বাঘমুণ্ডার দিক থেকে পুরুনাকোটের দিকে হেঁটে আসছিলাম, জঙ্গলের সুঁড়ি পথ দিয়ে একা একা। শীতের সন্ধের অদৃশ্য হিমেল আঙুল পিছন থেকে ঘাড় ছুঁয়েছিল। দিন ও রাতের মধ্যবর্তী এই একফালি বেওয়ারিশ বেওয়াফা সময়টুকুতে এসে পৌঁছলেই বুকের মধ্যে একটা চাপা বেদনা গুমরোতে থাকে।

বোষ্টমনালার পাশেই জঙ্গলের ঠিকাদারের ডেরা। নালার মধ্যে যেখানে জল গভীর, তারই পাশে আকাশ-ছোঁওয়া শাল সেগুন এবং নানারকম জ্বালা-কাঠের জঙ্গলের মধ্যে কতগুলো ঝুপরী। সামনেটায় ঘাস ও আগাছা কেটে পরিষ্কার করে নেওয়া হয়েছে। চতুর্দিকে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় বসে-থাকা হাতীর মতন নানা আকারের বিরাট বিরাট কালো পাথর।

ঝুপরীগুলোতে কাব্যাড়িরা থাকে। ঝুপরীগুলোর বিপরীত দিকে একটা তাঁবু খাটানো। সেই তাঁবুই এখন আমার বাসা।

ডেরা এখনও দূরে আছে।

সূর্য হেলে পড়েছে পশ্চিমে। গাছগাছালির ফাঁকে ফাঁকে ম্লান সোনালি আভার আভাস দেখা যাচ্ছে ওদিকের আকাশে। পুবে ছায়া নেমেছে ভারী হয়ে। ময়ূর ডাকছে থেমে থেমে পথের বাঁ দিক থেকে। নানারকম পাখির সম্মিলিত কাকলিতে কাকলিমুখর হয়ে রয়েছে বন-বনান্তর। ঝিঁঝির স্বর উঠছে শীতের দিনের ঠাণ্ডা নিরন্ধ্র গাছগাছালির মধ্যে থেকে।

এই শীতের বিকেলে এক আশ্চর্য মহিমা বন-জঙ্গলের। বিশেষ করে এরকম গভীর বনে-জঙ্গলে, যেখানে জন্তু-জানোয়ার, পাখ-পাখালি এখনও বেঁচে আছে, যেখানে সভ্যতা নামক অসভ্যতা তার চক্ষুলজ্জাহীন সৌন্দর্য-জ্ঞানহীন কদর্য হাত বাড়ায়নি এখনও।

www.BanglaBook.org

আর একটু এগোতেই একটা জিপের এঞ্জিনের আওয়াজ পেলাম। জিপ গাড়িগুলো এই পরিবেশে আশ্চর্য মানিয়ে যায়। পাহাড়ের মধ্যে মধ্যে পাহাড়ে-পাহাড়ে ধাক্কা-খাওয়া দূরাগত জিপের এঞ্জিনের গোঙানিকে কোনো জানোয়ারেরই আওয়াজ বলে ভুল হয়। জিপটা এদিকের গড়িয়ে-যাওয়া উৎরাই—ওদিককার চড়াই উঠছিল।

যে-পথে হাঁটছিলাম তাকে পথ বলে না। গত শীতে ঠিকাদারদের ট্রাক যাওয়া-আসা করায় পথের দু-পাশে চাকার দাগ হয়ে গিয়েছিল। ঘাস মরে গিয়েছিল। তারপর আবার বর্ষায় ঘাস গজিয়ে উঠেছে তাতে। মধ্যের ফালি-টুকুতে যেখানে চাকা স্পর্শ করে না, সেখানে এক-হাঁটু আগাছা ও ঘাস গজিয়েছে। তাদের এঞ্জিনের এবং ডিফারেন্সিয়ালে ছুঁয়ে সর্‌সর আওয়াজ করে জিপটা এগিয়ে আসছে।

সামনের বাঁকের মুখে জিপটাকে দেখা গেল। ছাই-রঙা জিপটা এই আসন্ন অন্ধকারের ছায়াচ্ছন্ন পটভূমিতে পুরোপুরি ক্যামোফ্লেজড্ হয়ে গিয়েছিল।

পাইকারা জিপ চালাচ্ছিল। টিউলি পাশে বসেছিল।

আমাকে দেখেই জিপটা দাঁড়িয়ে গেল।

খালি গায়ের উপর গামছা-জড়ানো মালকোঁচা-মেরে ধুতি-পরা টিউলি লাফ দিয়ে নেমে আমার দিকে দৌড়ে এল।

দৌড়তে দৌড়তে এসে বলল, বাবু বড্ড বাঘটা।

—বাঘ? কোথায় রে?

তারপর আর কথা না বলে ওর সঙ্গে দৌড়ে গেলাম জিপের দিকে।

ইতিমধ্যে আগাছা ভেঙে ঘাস দলে পাইকারা জিপটার মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল। আমি সামনের সিটে বসলাম। টিউলি লাফ দিয়ে পিছনে উঠতে না উঠতেই পাইকারা এ্যাকসিলারেটরে চাপ দিল। গিয়ারেই ছিল গাড়ি—দ্রুতবেগে চড়াইটা নামতে লাগল জিপ।

দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল ওদের। ওরা সকলে, সব কাবাড়িরা ভিড় করে ডেরার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল—একই জায়গায়। পুরুনাকোটের দিকে মুখ করে।

আমরা গিয়ে পৌঁছতেই ওরা সমস্বরে কথা বলতে লাগল। একটা বড় বাঘ এতক্ষণ পথের মাঝখানে বসেছিল। অতবড় বাঘ নাকি তারা কেউ জন্মে দেখেনি। ওরা বলল, বাঘটা পোড়ো ধরবার জন্য এসেছিল।

ওড়িয়াতে মোষকে পোড়ো বলে। গভীর জঙ্গলে কাঠ কেটে জঙ্গল থেকে মোষ দিয়ে কাঠ টানিয়ে আনতে হয়। মোষরা কাঠ টেনে এনে সুবিধেমত এমন জায়গায় রাখে, যেখান থেকে কাঠ লোড করা সোজা। ট্রাকগুলো জঙ্গলের বিভিন্ন জায়গায় যেখানে যেখানে কাজ হচ্ছে, সেখান সেখান থেকে কাঠ লোড করে চলে যায় কটকে বা অন্যত্র। কাঠ নামিয়ে রেখে আবার ফিরে আসে।

ওদের কথা কিন্তু আমার বিশ্বাস হলো না। মোষ ধরার হলে ডেরার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এ-পাশে ও-পাশে ছড়িয়ে রাখা মোষগুলোর যে-কোনো একটাকে সে বাঘ বিনা আড়ম্বরে ধরতে পারত।

এখন নভেম্বর মাস। বাঘ ও বাঘিনীর মিলন কাল। যে এসেছিল সে বাঘ কি বাঘিনী বাই-ই হোক, তার আজ অভিসার আছে। নইলে বিকেল বিকেল ঘুম থেকে উঠে ডেরার সামনের পথের মসৃণ ধুলো মেখে সে নিজেকে সাজাত না।

সে-কথা ওদের বলতেই ওরা হাসাহাসি করল। কিন্তু বিলক্ষণ বুঝলাম যে ওরা একটু ভয় পেয়েছে।

ওরা জঙ্গলের লোক। বাঘ কাকে বলে জানে। চিড়িয়াখানার খাঁচার সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে শালীর কাছে বীরত্ব দেখাবার জন্যে খাঁচার মধ্যের বাঘকে ওরা ঢিল ছুঁড়ে মারেনি কখনও। স্বাভাবিক কারণে, বাঘের রাজত্বে জন্মাবধি বাস করে, বড় বাঘের ক্ষমতার পরিচয় জেনে, ওরা বাঘকে ভয় করে; সমীহ করে। ওদের ডেরার আশেপাশে বড় বাঘের অস্তিত্ব খুব প্রাঞ্জল কারণেই ওদের ভীত করে।

গভীর রাতে বাইরে যখন টুপ্‌টুপিয়ে শিশির পড়ে, নালা দিয়ে বরফের মতন ঠান্ডা জল বয়ে যায়, দূরের জঙ্গল থেকে যখন কোট্‌রা হরিণ ব্যাক্, ব্যাক্, ব্যাক্ আওয়াজ করে বাঘের চলাফেরার খবর দেয়, তখন ওরা পাতার ঝুপরীর মধ্যে নড়েচড়ে শোয়—একে অন্যের বুকের কাছে কুন্ডলী পাকিয়ে থাকে। বাইরে মোটা মোটা জ্বাল-কাঠের আগুন জ্বলে। পিছনের জঙ্গল থেকে টুপ্-টাপ করে মাকাল ফল ঝরে পড়ে। তাতেই মনে হয় বোমা ফাটল। এমনই আশ্চর্য নিস্তব্ধতা রাতের জঙ্গলে।

হনুমানের দল মাঝরাতে হুপ হুপ হুপ হুপ করে কী জানি কি দেখে চিৎকার করে ওঠে। শাখা-প্রশাখায় জড়াজড়ি-করা কুমারী জঙ্গলের মহীরুহদের এ-ডালে ও-ডালে ঝাঁপাঝাঁপি আর পাতা ঝাঁকাঝাঁকি করে ওরা জঙ্গলের শান্তি বিঘ্নিত করে।

একটু পরে সব আবার চুপ হয়ে যায়।

নালার একটানা কুলকুলানি কানে আসে। ঝিঁঝিরা এক সুরে, এক লয়ে অর্কেস্ট্রা বাজায়। আগুনে কাঠ পোড়ে, কোনো হতভাগিনী বুড়ির বিলাপের মতন—অনির্দিষ্টকাল ধরে—কাউকে শোনাবার প্রত্যাশা না করে—।

ফুট-ফাট শব্দ হয়—আগুনের মধ্যে থেকে তারাবাজির মতন ফুলকি উঠে, লাল জোনাকির মতন জ্বলতে-নিভতে নিভতে জ্বলতে আকাশের দিকে মিলিয়ে যায়। নালার মধ্যে সাঁতরে-যাওয়া একটা পাহাড়ি মাছ তার মনের দুর্বোধ্য আনন্দে হঠাৎ জলে ডিগবাজি খায়। পক্কাৎ করে একটা আওয়াজ হয় জলে। জল ছিটকে ওঠে। ছিটকে উঠে শিশির-ভেজা-পাথরগুলোকে আরও একটু ভিজিয়ে দেয়।

পাইকারা, টিউলি, গগন, কালিয়া এবং দগো ওদের ঝুপরীর মধ্যে শুয়ে শুয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ভাবে, এবার ঘুমোবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টিউলির ওর নতুন-বিয়ে করা বউ লাবণীর কথা মনে পড়ে। তার সু-ডৌল বুক তার দু' উরুর মাঝের চিকণ কালো নরম কাঠবিড়ালীর উষ্ণতা। এই শীতের রাতে, লাবণীর নগ্ন শরীরের কথা ভেবে, মনে করে, আধো-ঘুম আধো-জাগরণে কল্পনার লাবণীর শরীর নেড়েচেড়ে যে-উষ্ণতা যে-আশ্বাস ও পায়, এই ঝুপরীর মধ্যের আগুন এই প্রচণ্ড শীতার্ত রাতে তাকে কখনই তা দিতে পারে না। সেই উষ্ণতার স্বপ্নিল আবেশে সে চোখ বোজে।

গগন আর পাইকারা ছেলেমানুষ; ওদের দুজনেরই বাড়ি ফুলবানী। পরের বছর ওদের দুজনেরই বিয়ে হবে। গগন সাইকেল পাবে একটা বিয়েতে। পাইকারা একটা হাত-ঘড়ি। আপাতত সাইকেল এবং ঘড়ির আনন্দেই ওরা বুঁদ হয়ে থাকে। নতুন বৌয়ের সম্বন্ধে ওদের এখনও কোনো ঔৎসুক্য জাগেনি। খড়কুটো মুখে করে ওড়াওড়ি করা ছোট ছোট পাখির মতন, ওরা ঘোরের মধ্যে, স্বপ্নের মধ্যে, ঘর বাঁধার কথা ভাবে।

দুর্গার বয়স হয়েছে। পম্পাশর থেকে যে-রাস্তাটা লবঙ্গী চলে গেছে ঘন গভীর দুর্ভেদ্য জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, সে-রাস্তায় তার গ্রাম। সেখানে তার বৌ থাকে; তার ছেলেমেয়েরা। তার ভাই থাকে, যে ক্ষেত-খামার দেখা-শোনা করে। এবারে যখন বাড়ি ছেড়ে আসে, তখন ও কন্দমূল লাগিয়ে এসেছিল ক্ষেতে। শুয়োর, শজারু আর হরিণের উপদ্রবে কন্দমূল বাঁচাতে পারবে কিনা জানে না। ওর ছোট ছেলেমেয়েরা সারাদিন সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অবধি কন্দমূলের ক্ষেতে মূল পাহারা দেয়। সূর্যাস্তর পর ওর ভাই গিয়ে ঝুপরীর মধ্যে হাঁড়িতে কাঠ-কয়লার আগুন করে রাত জাগে। মাঝে মাঝে ক্যানেস্তারা পেটে। কখনও কখনও বা এক বোতল পানমৌরী গিলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে অশ্লীল গান গায়। শুয়োর তাড়ায়, শজারু তাড়ায়, নিজের বুকের মধ্যের ভূত-পেত্নীর ভয় তাড়ায়। আধ-পেটা খেয়ে থাকার দুঃখ উপড়ে ফেলার চেষ্টা করে মন থেকে; মাটি থেকে কন্দমূল ওপড়ানোর মতন।

দুর্গা স্বপ্ন দেখে, ওর ক্ষেত লাল লাল কন্দমূলে ভরে গেছে। আর কিছুদিন পরেই নভেম্বরের মাঝামাঝি অষ্টমী পূজা। দুর্গা বাড়ি যাবে। ওর বৌ নরম নরম গোল গোল এন্ডুলি পিঠা বানাবে। গুড় দিয়ে এন্ডুলি পিঠা খাবে দুর্গা। আরও খাবে অন্যরকমের এন্ডুলি পিঠা—যে-পিঠা বহু-দিন খাওয়া হয়নি তার।

ওরা বললে, বাঘটা সোজা রাস্তায় এগিয়ে গিয়েছিল, তারপর বোল্টম নালাটা যেখানে পথটাকে কেটে গেছে, যেখানে একটা কজওয়ে আছে নালার ওপর, তারও আগে গিয়ে বাঁদিকের জঙ্গলে ঢুকে গিয়েছিল।

ততক্ষণে অন্ধকারও হয়ে গেছে।

সব ক'টা ঝুপরীর সামনে আগুনের উপর কালো কালো মাটির হাঁড়িতে ভাত চাপিয়েছে ওরা। এক-একটা ঝুপরী এক-একটা হাঁড়ি। জঙ্গলে তরি-তরকারি পাওয়া যায় না। ডালও একটা বিলাসিতা। মাটির হাঁড়িতে টগবগ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করে ভাত ফুটছে—ভাতের মিষ্টি গন্ধ বেরুচ্ছে। জায়গাটা ধানের ভাত, মেহনতের ভাত, মিষ্টি ভাতের গন্ধে ভরে আছে।

ওরা কেউ কেউ বা ভাতের মধ্যে একটু আফিং-এর গুঁড়ো ঢেলে দিয়েছে। ঘুম ভাল হবে। নেশাও হবে। দিশী-বিদেশী বইয়ে যে-সব ক্যালরির হিসাব থাকে—সে-সবের খবর রাখে না ওরা। ওরা শুধু ভাত খেতে পেলেই নিজেদের কৃতার্থ মনে করে। দিনে ও রাতে দু-বেলা। ভোরবেলা একবার আর কাজ সেরে এসে সন্ধেবেলায় একবার। ওরা এই খেয়েই সারাদিন কাজ করে। টাঙ্গী কাঁধে জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। যেখানে রাইফেল হাতেও আমাদের মতন শহুরে শৌখিন শিকারিদের ঢুকতে গা ছম্ ছম্ করে, সেখানেই ওরা সারা দিন সারা রাত কাটায়।

আফিং-ই ওদের জান্। আফিং-ই ওদের বেশিরভাগকে পায়ে দাঁড় করিয়ে রাখে। ওদের মুখগুলো ফ্যাকাশে, জোলো-জোলো ফোলা-ফোলা রক্তশূন্য হয়ে যায়। যৌবনে বিশেষ কিছু বোঝা যায় না। তখন রক্তের তেজ থাকে। কিন্তু ওদের মধ্যে বেশিরভাগ কাবাড়িরই যৌবনের পরেই বার্ধক্য।

ওরা অনেক গান গায়, অনেক কাঠ কাটে, পান-মৌরী খেয়ে অনেক হাসে, তারপর একদিন হাসতে হাসতে, নিজেকে, নিজের জীবনকে, নিজের অস্তিত্বকে কে পরিহাস করতে করতে কখন যে একটা প্রচণ্ড পরিহাসের মতন বাঁশের চাটাইয়ে মোড়া অবস্থায় মাছি ভন্-ভন শব হয়ে নদী-নালার পাড়ে কি পাহাড় চূড়ায় ছাই হওয়ার জন্যে চলে যায় ওরা, তা নিজেরাই জানে না। ওরা যেখানে পুড়ে ছাই হয়, সেখানে জমি বড় উর্বরা। ভারী সুন্দর লাল থোকা থোকা না-নউরিয়া ফুল ফোটে তার চারপাশে। ওদের জীবিতাবস্থার হাসি চিরদিন সেই ফুলগুলোতে লেগে থাকে।

নকুল আমাকে চা বানিয়ে দিয়েছিল। পর পর দু-কাপ চা খেয়ে, আমি আগুনের পাশে কাঠের গুঁড়িতে বসলাম ওদের সঙ্গে গল্প করবার জন্যে।

প্রতি রাত্রে এই সন্ধের সময়ের পর থেকে রাত আটটা অবধি আমাদের গল্প হয়। ওরা অর্গলমুক্ত মনে ওদের কথা বলে। ওদের ঘরের কথা, ওদের ভবিষ্যতের কথা, ওদের অতীতের কথা। কত কী যে জানার আছে ওদের কাছে, তা বলার নয়।

বাঘটাকে দেখে ওদের মধ্যে কার কী রি-এ্যাকশান্ হয়েছিল, তাই নিয়ে এখন আলোচনা হচ্ছিল ; হাসাহাসি হচ্ছিল।

ওরা সকলেই আমার কাছ থেকে পাইপের টোবাকো চেয়ে তামাকপাতার মতন ঠোঁটের নিচে রেখে খেতে ভালোবাসে। রোজ সকাল-সন্ধেতে এই এক ঝিচুয়ালের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়।

ওদেরও ভাত হচ্ছিল। আমারও ভাত হচ্ছিল। একটু ডাল ও একটা বুনো মুরগির ডিম ছেড়ে দিয়েছিল নকুল ভাতে। ভাতের গন্ধের মধ্যে বসে আমরা গল্প করছিলাম।

এমন সময় ট্রাকের আওয়াজ পাওয়া গেল। এই ডেরার ম্যানেজার হটবাবু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কটক গিয়েছিলেন মালিকদের হিসাব-নিকাশ দিতে।

ট্রাকটা এসে দাঁড়াল ডেরার সামনে। ডেরা অবধি ট্রাক আসার মতন পথ আছে। কিন্তু তারপর আর ট্রাক যাবার রাস্তা নেই।

ট্রাকের যুবক ড্রাইভার ও ক্লিনার লাফাতে লাফাতে এল। পেছনে পেছনে ধীর পায়ে বৃদ্ধ হটবাবু।

হটবাবু বললেন, ডেরা থেকে আধমাইল দূরে একটা বিরাট বাঘের সঙ্গে ওঁদের দেখা হয়েছে। বাঘটা রাস্তা ধরে, রাস্তার মাঝ বরাবর আমাদের ডেরার দিকেই আসছিল। ট্রাকের আওয়াজ শুনে রাস্তা থেকে জঙ্গলে নেমে গেছে।

বাঘের পুনরাগমনের কথা শুনে সকলকেই একটু চিন্তিত দেখাল। হটবাবু বেশ উদ্বিগ্ন হলেন, যখন শুনলেন যে ডেরার সামনেই বড় বাঘকে দেখা গেছে সন্ধের মুখে।

মোষগুলো ডেরার আশেপাশেই বাঁধা ছিল এদিকে ওদিকে। হটবাবু আমাকে অনুরোধ করলেন রাইফেলটা নিয়ে কালিয়া আর গগনের সঙ্গে একটু যেতে। ওরা মোষগুলোকে একজায়গায় করে একেবারে ডেরার পাশেই বেঁধে দেবে।

নতুন ট্রাক ড্রাইভার ছোকরা পাঞ্জাবি মেহেরচাঁদ খুব সাহসী ও উৎসাহী লোক। ও একটা জ্বলন্ত কাঠ তুলে নিয়ে মশালের মতো করে আমাকে বলল, চলিয়ে সাহাব।

আমি হটবাবুকে খুশি করার জন্য ওদের সঙ্গে গেলাম।

মিনিট পনেরোর মধ্যে কালিয়া আর গগন পোড়োগুলোকে খুলে এনে ডেরার পাশে বেঁধে রাখল। শেষ পোড়োটা যেখানে বাঁধা ছিল সেখানে পৌঁছতেই এক কাণ্ড হল। সেটা প্রায় শ'খানেক গজ দূরে ছিল ডেরা থেকে। পোড়োটা থেকে হাত-তিরিশ দূরে একটা বড় কালো পাথর ছিল। প্রায় একতলা সমান উঁচু। তার ওপরে একটা ঝাঁকরা কুচিলা (নাক্স-ভমিকা) গাছ। মেহেরচাঁদ যখন জ্বলন্ত কাঠটাকে উঁচু করে ধরেছে, ঠিক তখনই সেই গাছের ছায়ায় পাথরের ওপর একজোড়া চোখ জ্বলতে দেখা গেল। লাল লাল!

দু'টি চোখের দূরত্ব ও চোখের আয়তন দেখে, কালিয়া, গগন এবং আমি তিনজনেই বুঝলাম যে ওটা একটা বড় খাটাশ অথবা ছোট চিতা বাঘ। কোনো কারণে ওখানে ওত পেতে বসে আছে।

কিন্তু মেহেরচাঁদ জঙ্গলে নতুন চাকরি নিয়ে এসেছে। সে শুনেছে, অন্ধকারে বাঘের চোখ জ্বলে এবং একটু আগে পেছন থেকে স্বচক্ষে বাঘ দেখেওছে সে ট্রাকের স্টিয়ারিংয়ে বসে।

কিন্তু দৈত্য-প্রমাণ ডিজেল-মার্সিডিস ট্রাকের স্টিয়ারিংয়ে বসে তার তীব্র হেডলাইটের আলোয় বাঘ দেখা এক, আর পায়ে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত-কাঠের কম্পমান লাল স্তিমিত আগুনে গভীর জঙ্গলের মধ্যে আলো-পড়া জুল্‌জুলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বুক-হিম করা চোখ দেখা আর এক। তাছাড়া মেহেরচাঁদের কল্পনা তখন বাঘে ভর্তি। শুধু তখন কেন? তখন থেকে বেশ কিছুদিন ধরেই সে শ'য়ে শ'য়ে বাঘ দেখবে স্বপ্নে।

বেচারার দোষ নেই। জঙ্গলে প্রথম প্রথম গেলে সকলেরই ওরকম হয়। হওয়াই স্বাভাবিক।

ঐ খাটাশের চোখে আলো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে, মেহেরচাদ দু-বার নীচু গলায় 'শের' 'শের' বলে জ্বলন্ত কাঠটা হাতে নিয়েই, আমাদের নিরন্ধ্র অন্ধকারে ফেলে এক দৌড়ে ডেরার দিকে চলে গেল। পেছন ফিরে একবার তাকাল না পর্যন্ত।

গগনটা খিলখিল করে হেসে উঠল।

কালিয়া বলল, ষড়াকু কাণ্ডটা দেখিলে বাবু? আন্ধারে কিচ্ছি দিশি পড়ু নাই, আউ সে নেহটা ধরিকি পলাইলে। অর্থাৎ, শালার কাণ্ডটা দেখলে বাবু? অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না, আর সে আগুনটা নিয়ে পালিয়ে গেল।

আমারও মজা লেগেছিল, কিন্তু হাসলাম না, মেহেরচাঁদের অবস্থা ডেরায় ফিরে আরো বেশি শোচনীয় হবে বলে।

পোড়োটাকে নিয়ে আমরা যখন ডেরার সামনে এসে পৌঁছলাম, তখন মনে হল কোনো মন্ত্রবলে সবাই সেখান থেকে উধাও হয়ে গেছে। সকলেই; একমাত্র দুর্গা ছাড়া।

দুর্গা, মুহুরী। সে এমন অনেক বাঘ এ জীবনে চরিয়ে খেয়েছে। আর সকলেই যে-যার ঝুপরীর মধ্যে ঢুকে পড়েছে; একমাত্র দুর্গা আগুনের পাশে ওর হলুদ-রঙা লুঙ্গি পরে বসে বসে আগুনটা ফুঁ দিয়ে জোর করছে আর অশ্রাব্য ভাষায় কাবাড়িদের ভয় পাওয়ার জন্যে গালাগালি করছে।

আমরা যেতেই ওরা একে একে বেরিয়ে এল। সবসুদ্ধ জনা-কুড়ি কাবাড়ি।

কালিয়া আর গগনের মুখে মেহেরচাঁদের কথা শুনে সকলে মিলে হাসা-হাসি শুরু করল।

মেহেরচাঁদকে আমি বাঁচাবার চেষ্টা করলাম।

বললাম, প্রথমে আমিও চোখ দুটোকে বাঘের বলেই ভুল করেছিলাম।

কিন্তু তাতে মেহেরচাঁদের হেনস্তা কিছু কমল না।

কাবাড়িরা কিন্তু কখনও এমন করে না। বাঘ কি হাতী দেখলে রাতের বেলা অথবা দিনের বেলা ডেরার কাছাকাছি, ওরা বাঘের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গলা চড়ায়।

পাইকারা বলল যে, ওরা ভেবেছিল সত্যিই বাঘ, আর যদি আমি গুলি করতাম বাঘকে, তাহলে তারপর অনেক কিছু ঘটতে পারত। সে জন্যে সাবধানতা অবলম্বন করে ঝুপরীর মধ্যে চলে গিয়েছিল। ভেবে দেখলাম, ভালই করেছিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হটবাবুকে কোথাওই দেখা গেল না।

দুর্গা বলল, ভাল হয়েছে। সে-বুড়োকে বাঘে নিলে ও-ই এরপর ম্যানেজার হবে। ওর উন্নতির রাস্তাটা নির্বিঘ্ন হয় তাহলে।

দুর্গার কথা শেষ হতে না হতে নালার দিকের অন্ধকার ফুঁড়ে ডানহাতে লুঙ্গি এবং বাঁ হাতে ঢাল (ঘাটি) ধরে হটবাবু এসে উপস্থিত হলেন। দুর্গাকে গাল দিয়ে বললেন, তোর কপালে ম্যানেজার হওয়া নেই এত শিগগির।

কাবাড়িরা খেলো। আমাদেরও খাওয়া-দাওয়া শেষ হল।

হটবাবু খেয়ে-দেয়ে লাল লুঙ্গির উপর কালো র‍্যাপার গায়ে দিয়ে কালো বাঁদুরে টুপি মাথায় চড়িয়ে আমার পাশে এসে বসলেন কাঠের ওপর। তাঁর গড়গড়াটাও সঙ্গে এল। কটকের সুগন্ধি অম্বুরী তামাকের গন্ধ ছড়াতে লাগল বনময়, তার সঙ্গে ভুড়ুৎ ভুড়ুৎ করে গড়গড়া টানার শব্দ। কাবাড়িরা আগুনের মধ্যে বড় বড় গুঁড়ি এনে ফেলে আগুনটাকে জোরদার করল।

হটবাবু বললেন, ঋজুবাবু, একটা কথা বলি? রাগ করবেন না তো? বললাম, বলুন না কি কথা?

হটবাবু দ্বিধাগ্রস্ত গলায় বললেন, আমার মনটা ভালো বলছে না। বাঘটাকে কাবাড়িরা দেখল সন্ধের সময়, তারপর আবার আমরাও দেখলাম। ক্যাম্পের দিকেই আসছিল। একটাও পোড়ো যদি মেরে দেয়, তাহলে বড় আফশোসের কথা হবে। আপনি কি একটু সজাগ থাকবেন রাতে? কিছুক্ষণ যদি রাইফেল নিয়ে আগুনের পাশে বসে থাকেন, তাহলে তো আরো ভাল হয়। এই শীতে আপনার কষ্ট হবে, জানি। কিন্তু আমরা নির্বিঘ্নে ঘুমোতে পারি। বসবেন?

জানতাম যে হটবাবু ও কাবাড়িদের ভয় অমূলক। অন্তত আজ রাতে কোনো ভয় নেই। কারণ যে বাঘ পোড়ো ধরবে, সে জঙ্গলে সড়কে ইভনিং-ওয়াক করে না বারবার।

অবশ্য জাগতে হবে না। পোড়োরা ভীষণ সাবধানী। তাছাড়া ছ'-ছটি পোড়ো একই সঙ্গে বাঁধা আছে। বাঘ ওদের ধারেকাছে এলেই ওদের মধ্যে কেউ না কেউ টের পাবে। ওদের হাব-ভাব দেখেই বোঝা যাবে যে, বাঘ এসেছে।

বাইরে থাকতে আমার কোনো আপত্তি ছিল না। তাছাড়া এতজন লোকের যখন ইচ্ছা যে, আমি বাইরে থাকি, রাত জাগি, তখন আপত্তি করার মানেও হয় না কোনো। বললাম, বেশ তো! থাকব।

হটবাবু বললেন, পুবের আকাশ ফর্সা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চা করে আপনাকে জাগিয়ে দেবো।

আমি বললাম, আচ্ছা।

হটবাবু একটু পর গড়গড়াসমেত ভিতরে চলে গেলেন।

তামাকের হাল্কা গন্ধ রেখে গেলেন আমার জন্যে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাঁবুর ভিতর গিয়ে টুপিটা আর ওভারকোটটা নিয়ে এলাম। রাইফেল-টার ক্লিচ খুলে দুটো সফ্‌ট-নোজড্‌ বুলেট ভরে নিলাম। রাইফেলের সঙ্গে ক্ল্যাম্প লাগানো ছোট ব্যাটারীর টর্চটা কাজ করছে কিনা দেখে নিলাম। তারপর রাইফেলটাকে কাঠের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে রেখে, গুঁড়িতে পিঠ দিয়ে বসলাম।

আমার দারুণ লাগে। এমনি সব দীর্ঘ একাকী রাত—মাঁড়ির উপরে-বাঁধা মাচায় কিংবা ক্যাম্পের সামনে একা একা। কত কী ভাবা যায়—নিজের মনটাকে, তোমাকে লেখা চিঠির মতো ছিঁড়ে ফেলা যায়—আবার মিলিয়ে মিলিয়ে জোড়া লাগানো যায়। অথবা মুর্শিদাবাদের ধুনুরীরা যেমন করে বালাপোষ বানায়, তেমন করে নিজের মনকে ধুনে ধুনে, মনকে ফিন্‌ফিনে করে পিঁজে-পিঁজে আকাশে ছড়িয়ে দিয়ে আবার সেই টুকরোগুলো নিচে ধরা যায়—তারপর পরতে পরতে খস্‌স্‌ কিংবা যুঁইয়ের আতর লাগিয়ে, সাজিয়ে গুছিয়ে নেড়ে-চেড়ে চমৎকার সুগন্ধি বালাপোষ করে নিয়ে তা দিয়ে জড়িয়ে মুড়ে বসে ভাবতে, ভাবতে ভাবতে, কী চমৎকার, কী চমৎকার—রাতের পর রাত কাটিয়ে দেওয়া যায়।

এখন কৃষ্ণপক্ষ। চাঁদ উঠবে দেরী করে। যখন এসেছিলাম, মানে যেদিন এসেছিলাম এখানে, সেদিন পূর্ণিমা ছিল। জিপটা পম্পাশর ছেড়ে জগন্নাথ-পুর পেরিয়ে পুরুনাকোটের একেবারে কাছাকাছি এসে খারাপ হয়ে যায়। খারাপ মানে, ফুয়েল ইনজেকশান্‌ পাম্প কাজ করছিল না।

পাইকারা বনেট খুলে এঞ্জিনের ভিতরে মুখ নামিয়ে গাড়ি ঠিক করছিল। আমি পায়চারি করছিলাম ধুলি-ধূসরিত পথে। এ জায়গাটা ফাঁকা ফাঁকা। রাস্তার পাশেই ঝুঁকে পড়েনি জঙ্গল। চন্দ্রাতপের সৃষ্টি করেনি মাথার উপর।

চতুর্দিক ফুট্‌ফুট্‌ করছিল জ্যোৎস্নায়। ফুট্‌ফুট্‌ বলা ঠিক হবে না। বন-পাহাড় শুধু গ্রীষ্মকালের চাঁদের আলোতেই ফুটফুট করে। শীতের চাঁদে বন-পাহাড় সপ্‌সপ করে। শিশিরভেজা বন-পাহাড়ে আলো পিছলে যায়। রাত যত গভীর হয়, একটা কুয়াশার মতো হিমের আস্তরণ পড়তে থাকে। তাতে যেন পাহাড় জঙ্গলের রূপ অস্পষ্ট হয় বলেই আরো খুলে যায়।

পথের বাঁ পাশে একটা বিল ছিল। তাতে সাদা ফুল ফুটেছিল শাপলার। অসংখ্য হাজার হাজার। বিলের পাশে কার যেন ছোট্ট কুঁড়ে। একসময় এখানে কেউ থাকতো। এখন খড়ের চাল ভেঙে গেছে, মাটির দেওয়াল ধসে পড়েছে। ভেরেণ্ডার বেড়া লাগিয়েছিল কুঁড়ের মালিক একসময় কুঁড়ের চারপাশে—তা এখন জঙ্গলে রূপান্তরিত হয়েছে। চাঁদের আলোয় ভেরেণ্ডার উজ্জ্বল পাতাগুলো, শাপলার ফুল সব যেন হাসছিল। আমি সেই সাধারণ অথচ অসামান্য দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। অনেকক্ষণ।

পথের ডানধারে ধূ ধূ রুপোলী ধোঁয়া-ধোঁয়া দেখা যায়—ধানক্ষেত—দূরে, মাঝে মধ্যে রাত জাগার ঘর। সেই ধানক্ষেত শেষ হয়েছে গিয়ে

www.BanglaBook.org

বাঘমুণ্ডা রেঞ্জের মাথা-উঁচু পাহাড়শ্রেণীতে। সেই রাতের দিগন্তবিস্তৃত পাহাড়শ্রেণীকে মেঘ মেঘ দেখাচ্ছিল। এতক্ষণে হাতীর দল নেমেছে লোধহয় ধানক্ষেতে, ধান খেতে। এ অঞ্চলে হাতী খুব বেশি। হাতীর জন্য ধান করাই মুশকিল। এক এক দলে তিন-চারটি থেকে পনেরো-কুড়িটি পর্যন্ত নামে ওরা। ওদের পাহাড়প্রমাণ শরীরগুলো নড়েচড়ে বেড়ায়। চাঁদের আলো পিছলে যায় বড় বড় সাদা দাঁতে। মাঝে মাঝে হঠাৎ কোনো মাদী হাতী বৃংহণ করে ওঠে। কোনো অসংযমী তরুণ মদ্দা হাতীকে তিরস্কার করে। ওরা ঘোরে-ফেরে। কাছে আসে; দূরে যায়। রাত জাগা ঘর থেকে অসহায় চাষীরা তালপট্‌কা ফাটায়—ক্যানেস্তারা পেটে—মশাল নাড়ে। হাতীরা দৃক্‌পাতও করে না। ওদের কর্তব্য ধান খাওয়া; যারা রাত জাগে, তাদের কর্তব্য চিৎকার চেঁচামেচি করা। দু-পক্ষই দু-পক্ষের কর্তব্য সমানে করে যায়।

এক সময় রাত গভীর হয়ে আসে। চাঁদের আলোয় হাতীদের গায়ের ছায়া ধানক্ষেতে পড়ে। ওরা কতগুলো অপসৃয়মান আবছা স্তূপের মতো দূরের পাহাড়শ্রেণীর গভীর ছায়ার মধ্যে মিলিয়ে যায়। ঘন ছায়ার ছায়াচ্ছন্ন-তার উপর কতগুলো চলমান তরল ছায়া সুপারইম্‌পোজ্‌ড হয়ে যায়।

ধানক্ষেতের উপর একটা একলা টি-টি পাখি টিটির-টি, টিটির-টি করে চমকে চমকে ওঠে; চাঁদকে তাড়া করে। তাড়া করে দিগন্ত অবধি চাঁদটাকে যেন তাড়িয়ে নিয়ে যায়।

কুপিরিগুলোর মধ্যে এখন আর কোন সাড়াশব্দ নেই।

আগুনটাও যেন নিঃশব্দে জ্বলছে। নালা দিয়ে কুলকুলিয়ে জল বয়ে যাচ্ছে; শিশির পড়ছে। গাছের উপরের পাতাগুলোতে শিশির জমে জমে জল হয়ে নিচের পাতাগুলোয় ঝরছে টুপ্‌ টাপ্‌ শব্দ করে, বৃষ্টির মতো।

গভীর রাতের জঙ্গল থেকে একটা আশ্চর্য রহস্যময় ফিসফিসানি উঠছে।

কুম্ভাটুয়া পাখিটা ডেকে চলেছে। বহু দূর থেকে তার গুব্‌ গুব্‌ গুব্‌ গুব্‌ একটানা ডাক শিশিরভেজা জঙ্গল বেয়ে কানে আসছে। কল্পনার পাখিটাকে দেখতে পাচ্ছি। বড় বাদামী লেজঝোলা পাখিটা কুরুম্‌ অথবা রুশি অথবা কোনো মিট্‌কুনিয়া গাছের ডালে বসে একটানা ডেকে চলেছে।

ও কাউকে ডাকছে না। হয়তো ডাকার মতো ওর কেউ নেইও। তবুও এই ঘন গভীর জঙ্গলে, এই শীতার্ত সিক্তরাতে ও যে বেঁচে আছে; একা থেকেও প্রচণ্ডভাবে যে বেঁচে আছে, এই জানাটাকেই জানান দিচ্ছে গলা ফুলিয়ে। দিকে দিগন্তরে।

আমিও একা আছি। এই মুহূর্তে। ভুল বললাম। একাই ত' সব মুহূর্তে। এই কুম্ভাটুয়া পাখির মতোই একা। কিন্তু চিৎকার করে জানানোর মতো আমার কোনো কথা নেই। আমার কথা এই ফিসফিসে রাতের মতো আমার বুকের মধ্যেই ফিস্‌ফিসানি তোলে। আমি নিজেও সেসব কথা ভালো শুনতে পাই না অনেক সময়। তা-ই বাইরের পৃথিবীকে জানানোর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কথাই ওঠে না।

মনে পড়ে যাচ্ছিল, এখানে আসার অল্প কদিন আগে একদিন তোমার কাছে গিয়েছিলাম। শেষবার। সেই-ই বোধহয় শেষবার তোমার কাছে যাওয়া এ জীবনে; তেমন করে কিছু চাইতে যাওয়া। শেষবার: কারণ আমার জীবন তোমাকে খুঁজতে গিয়ে, তোমাকে পেতে গিয়ে এক কানাগলির মধ্যে হারিয়ে গেছে। যেখানে প্রবেশ পথ ছিল, কিন্তু নির্গমনের পথ ছিল না কোনো।

তোমার সেই দুপুরবেলার চেহারাটা এখনও চোখে আঁকা আছে। আঁকা থাকবে যতদিন বাঁচবে আমি; যতদিন মস্তিষ্কের মধ্যে স্মৃতির রস ক্ষরণ হবে।

তোমার চান হয়ে গিয়েছিল। সাদা খোলের উপর একটা কালো আর লাল ডুরে টাঙ্গাইল শাড়ি পড়েছিলে তুমি। কালো ব্লাউজ। খোপা করেছিলে। সুন্দর, হালকা বসন্ত বাতাস ভেসে আসা করোঞ্জ ফুলের গন্ধের মতো নরম প্রসাধনে সাজিয়ে ছিলে নিজেকে। ছিপ্‌ছিপে—তোমাকে সাদা আর কালো আর লালে-মেশা একটা মিষ্টি দুষ্টু প্রজাপতির মতো দেখাচ্ছিল।

হাতে একটা কালো চামড়ার ব্যাগ ঝুলিয়ে তুমি বেরিয়ে যাচ্ছিলে।

আমাকে দেখে বলেছিলে, আপনি? অসময়ে?

আমি অবাক হয়েছিলাম। বলেছিলাম সে কি? আজকে বুধবার না? আমি তো আজকেই আসব বলেছিলাম।

তুমি অম্লানবদনে বলেছিলে, আমার মনে ছিল না। আমি একটু রাণুদির বাড়িতে যাব। এক্ষুণি।

আমি দুঃখিত হয়েছিলাম। তোমার কাছে কখনও আসব বললে সাতদিন আগে থেকে সে কথা আমার মনে হয়, মনে হয় দেখা হওয়ার কথা, দেখা হওয়ার দিন, ঘণ্টা, মুহূর্ত সব বুকের মধ্যে গাঁথা থাকে। অথচ তুমি কিরকম ক্যাজুয়ালি বলে ফেল, "আমার মনে ছিল না"।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও তুমি খাটের উপর বসলে তোমার হাঁটু দুটি বুকের কাছে মুড়ে, দু'হাত দিয়ে হাঁটু জড়িয়ে বসলে।

তোমার কণ্ঠার হাড় দুটি উঁচু হয়ে ছিল। সেই স্নিগ্ধ, ঠাণ্ডা শান্তির ঘরে, আমার আনন্দনিকেতনে তোমার ফিঙের মতো কালো চোখ দুটি আমার দিকে চেয়েছিল। আস্‌কল পাখির বুকের মতো তোমার কোমল স্পন্দিত বুকের মধ্যের পেলব ভাঁজটি দেখা যাচ্ছিল।

আমি তোমার দিকে, তোমার সমস্ত তুমির দিকে চেয়েছিলাম।

ভাবছিলাম যে, আমি তোমাকে যে তীব্রতায় চেয়েছিলাম, তোমার মনকে, তোমার শরীরকে, সে-চাওয়ার কণামাত্রও তোমাকে কখনও স্পর্শ করেনি। করলে, আমার মতো করে কেউই তা বুঝত না। তা করলে, তোমার শরীর-মন বিদ্যুৎচমকের মতো চমকে উঠত, জ্বলে উঠত। সেই উজ্জ্বল উদ্ভাসিত আলোয় তোমার পর্দা-টানা সায়ংকার ঘর আলোকিত হয়ে

www.BanglaBook.org

উঠত।

তোমার স্বপক্ষে অনেক যুক্তি ছিল চিরদিনই। কিন্তু সেগুলো আমাকে ঠকানোর, তোমাকে নিজেকে চোখ-ঠারার যুক্তি। আসল কথাটা এই-ই যে, আমাকে তুমি কখনও আমার জন্যে চাওনি।

আমি সব জানি, সব বুঝি, বুঝেও কেন তোমার কাছ থেকে সরে আসতে পারি না? আমার মন বদ্ধজলের মতো তোমার মনের উদাসীনতার পানাপড়া পুকুরে কেন এমনভাবে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে? কেন তোমাকে ভুলে, তোমার মন থেকে উপচে গিয়ে আমার মন অন্য কোনো মনে পৌঁছয় না? কেন আমাকে বারে বারে তৃষ্ণার্ত, ক্লান্ত অবস্থায় বারে বারে শুধু তোমারই কাছে গিয়ে সে পিপাসা বহুগুণে বাড়িয়ে আবার ফিরেই আসতে হয়? তুমি আমাকে কষ্ট দিয়ে এত পৈশাচিক আনন্দ পাও কেন? কেন? কেন?

আমি অনেক ভেবেছি। কত নারীই তো ওদের ভালোবাসা জানিয়েছে, জানিয়েছে তাদের নিঃশর্ত অঙ্গীকার। কত বিদুষী; কত সুন্দরী। জানিয়েছে, আমি যাই-ই চাই, যেমন করেই চাই, তারা তা সবই দিতে পারে। শুধু আমাকে সুখি দেখার জন্যে তারা সব কিছু করতে পারে। শুধু আমারই জন্যে।

তবু। তবু কেন? এখনও কেন তোমাকে আমি ঘৃণার মধ্যে, বিস্মরণের মধ্যে, অতীতের অন্ধ আঁধির মধ্যে নিক্ষেপ করে নিজেকে ভারমুক্ত করতে পারি না? কেন তুমি-ব্যাতিরেকেও সুখি হতে পারি না, সুখি করতে পারি না নিজেকে? কেন তোমাকে ভুলতে পারি না?

মাঝে মাঝে আমার সেই উর্দু শায়েরীর কথা মনে পড়ে। জীগর মোরাদাবাদীর না মীর্জা গালিবের, ঠিক মনে নেই। মনে আছে শুধু শায়েরীটুকু।

> এতো নহি কি তুম্‌সা জাঁহামে.হাসিন্‌ নহি
> ইস্‌ দিল্‌কা কেয়া করুঁ বহল্‌তা কঁহি নেহি।

এ তো নয় যে তোমার চেয়ে সুন্দরী পৃথিবীতে আর নেই? কিন্তু কি করি, আমি কি যে করি, আমার এই হৃদয় নিয়ে কি যে করি আমি, এ যে অন্য কোথাও, কোনোখানেই যেতে চায় না। এ যে সরে না; নড়ে না।

তুমি তোমার প্রতি আমার সর্বাঙ্গীন ভালোবাসার সহজ অধিকারে আমি ছাড়া আর যারা তোমাকে ভালোবাসে, তাদেরও ভালোবাসতে বাধ্য করো আমাকে। তোমাকে যে চায়, যারা চায় তাদের সঙ্গে আমার যোগসূত্র তুমি। শুধু তুমিই। কিন্তু তুমি তাদেরও যদি ভালোবাসতে বাধ্য করো আমাকে, তখন বিদ্রোহ করতে ইচ্ছে হয়, মাঝে মাঝে মনে হয়, তোমাকে বলি, দরকার নেই, আর দরকার নেই, তুমি ফিরিয়ে দাও আমার হৃদয়। আমার দ্বারা এ হাটে বিকিকিনি সম্ভব নয়।...

www.BanglaBook.org

একটা পোড়ো হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠল। তার গলার কাঠের ঘণ্টাটা একটা গম্ভীর শুকনো ডুং ডুং আওয়াজ করল। অন্য পোড়োগুলো যেগুলো শুয়ে-বসে ছিল, তারা সকলেই মাথা উঁচু করে, কান খাড়া করে পথের দিকে দেখতে লাগল।

ওরা নিশ্চয়ই কিছু দেখে থাকবে ওদিকে।

আমি উঠে রাইফেলটা নিয়ে ওদিকে এগিয়ে গেলাম। জানতাম, আর যে জানোয়ারই হোক, বাঘ নয়। বাঘ ধারে কাছে এলে পোড়োদের চেহারাই অন্যরকম হয়ে যেত।

সাবধানে এগিয়ে পথের কাছে পৌঁছতেই এক আশ্চর্য দৃশ্য চোখে পড়ল। যিনি বা যাঁরা এমন দৃশ্য না দেখেছেন, তাঁদের এই দৃশ্যের পদ্যময়তা বোঝাবার মতো ভাষা আমার নেই।

তখন রাত একটা। বাঘমুণ্ডার দিক থেকে ঠিক পথটার সোজাসুজি দূরে জঙ্গলের মাথায় একফালি চাঁদ উঠছে। চতুর্দিক সমস্ত বিশ্বচরাচর, গ্রহ-উপগ্রহ নিস্তব্ধ প্রতীক্ষায় নির্বাক। শীতের গভীর রাতে গহন জঙ্গলের মধ্যে শিশিরভেজা পথে-প্রান্তরে, বনে-পাহাড়ে সেই একফালি প্রোষিতভর্তৃকা চাঁদের যে কী রূপ, তা কি বলব!

মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে আমি ঐ দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

হঠাৎ সমস্ত মুগ্ধতা কেটে গেল, একটা বুক-কাঁপানো ভৌতিক অট্টহাসিতে।

সে-হাসি বুকের মধ্যে অবধি, বুকের পাঁজরে পাঁজরে চমক তোলে। সেই হাসির সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘোরাতেই দেখতে পেলাম একটা প্রকাণ্ড হায়েনা তার কুৎসিত ভঙ্গীতে চলতে চলতে বোষ্টমনালার দিকের জঙ্গলে মিলিয়ে যাচ্ছে।

সে চলে গেল বটে, কিন্তু তার সেই বুক-কাঁপানো ঘুম-ভাঙানো হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাসি অনেকক্ষণ কাঁপতে থাকল পাতায় পাতায়, ঝোপে-ঝাড়ে, পাথরে পাথরে।

অনেকক্ষণ বসে থাকতে থাকতে কোমর ধরে গিয়েছিল। ভাবলাম, একটু পায়চারি করে নিই পথে, ডেরার সামনেই।

একটা পেঁচা, ছোট্ট পেঁচা; নালার ওপাশে কিঁচর্-কিঁচর্ আওয়াজ করে একটা বড় গাছ থেকে উড়ে ভিতরের সেগুন প্ল্যানটেশনের দিকে চলে গেল।

বসে থাকতে থাকতে আমার নাক কাঠের আগুনের গন্ধে ও মোষের গায়ের গন্ধে ভরে ছিল। এখন ডেরা ছেড়ে ফাঁকায় আসতেই সে গন্ধটা নাক থেকে মুছে গিয়ে রাতের নির্ভেজাল টাটকা গন্ধে নাক ভরে গেল। মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

বাঘের জন্য রাত জাগার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন যে ছিল না তা আমার মতো করে কেউই জানত না। কিন্তু বাঘটা একটা ছুতো। যেমন শিকারও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটা ছুতো। একটা নিছক এ্যালিবাই। শিকারের ছুতো না থাকলে কি এমন-এমন জায়গায় আসতে পেতাম কখনও, বছর বছর, বহু বছর, বারবার? বাঘের ছুতো না থাকলে কি এমন একলা রাতে একা একা এমন পথে পায়চারি করতে পেতাম? "ইয়ে সিরিফ বাহানা হ্যায়।" এক বিহারি মুসলমান বন্ধু বলেছিলেন। ঠিকই বলেছিলেন। আমিও জানি, শিকার সিরিফ বাহানা হ্যায়।

ভীষণ ভালো লাগে জঙ্গলে আসতে; থাকতে। এত ভালো আমার আর কিছুই লাগে না। ভুল বললাম বোধহয়। সবচেয়ে ভালো লাগে তোমার কাছে থাকতে, তোমার সামনে থাকতে। তারপরই জঙ্গল ভালো লাগে।

আমার খুব শখ ছিল, সাধ ছিল, একদিন, কখনও, জীবনে কোনও এক সময়, এক মিনিটের জন্যে হলেও তোমার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে থাকব।

জঙ্গলে এলে জঙ্গলকে তোমার বিকল্প বলে মনে হয়। বড় শান্তি পাই আমি। আমার সমস্ত শরীর, সমস্ত স্নায়ু, সমস্ত মন নিস্পন্দ শান্ত হয়ে ওঠে। জঙ্গল থেকে আশ্চর্য শান্তি বিকিরিত হয়। সেই শান্তি এমন-এমন রাতে আমার বুকের মধ্যে সেঁধিয়ে যায়।

যখন যায়, তখন আমার বুক এক পরিতাপহীন, আক্ষেপহীন শান্ত ভাবনায় ভরে ওঠে। ঠিক তখনই তো আমাকে ক্ষমা করার কথা ভাবি।

তবু, আমি কাউকেই তোমার বিকল্প করিনি, কারণ তোমার কোনো বিকল্প নেই। তোমার বিকল্প হয় না। তোমার কোনো বিকল্প ছিল না। না, না। নয়নার কোনো বিকল্প নেই ঋজু বোসের জীবনে।

এখন রাত প্রায় সোয়া একটা।

তুমি এখন নিশ্চয়ই অঘোরে ঘুমচ্ছ। কোলকাতায় তো এত শীত নয়। তোমার হালকা নীল রঙা কম্বলটা বুকের নিচু থেকে ঢেকে রেখেছে তোমার শরীর। গলার কাছে নাইটির ফ্রিল দেখা যাচ্ছে। তুমি আরামে ঘুমচ্ছ।

তুমি যখন ছোট্ট ছিলে, তুমি কী অদ্ভুত এক কায়দায় উপুড় হয়ে শুতে। তোমার পা দুটো গুটিয়ে আনতে বুকের কাছে, পেছনটা উঁচু হয়ে থাকতো, মুখটা গুঁজে দিতে বালিশের গভীরে। তুমি একটা খাগলী ছিলে।

তুমি বলেছিলে যে, একবার আমার সঙ্গে এখানে আসবে। এ জঙ্গলে।

যদি আসতে, তাহলে তোমাকে আমি কত জায়গায় নিয়ে যেতাম। কত জিনিস দেখাতাম। তুমি ভাবতেও পারো না। তুমি সত্যিই জানো না, কলকাতাটা কী দরিদ্র।

আমি জিপের স্টিয়ারিংয়ে বসতাম। তুমি আমার পাশে বসতে। উইন্ড স্ক্রিনের কাচটা একটু তুলে দিতাম, যাতে হাওয়া ঢুকে পেছন থেকে ধুলো তাড়িয়ে নিয়ে যায়। কোন্ বিখ্যাত কার-রেসিং চ্যাম্পিয়ন বলেছিলেন না? "Give me the moonlight. Give me a girl and leave the rest to

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

me" না। না। যে-কোনো মেয়ে নয়। আমি হলে বলতাম, give me my girl, the girl ; and leave the rest to me.

তুমি কটক থেকে আমার সঙ্গে আসতে অঙ্গুলে, ঢেনকানল হয়ে ; ঢেনকানলে পোড়-পিঠা খাওয়াতাম। তারপর অঙ্গুলে এসে সম্বলপুরের পথের মোড়ের দোকানে দই-বড়া। অঙ্গুল থেকে রওনা হয়ে আসতাম পুর্ণাগড়। পুর্ণাগড়ের পর করত্পটা। করত্পটা থেকে পম্পাশর। তারপর জগন্নাথপুর হয়ে পুরুনাকোটে।

ইচ্ছা করলে তুমি পুরুনাকোটে নাও থাকতে পারতে।

পুরুনাকোটের মোড় থেকে বাঁয়ে চলে যেতাম আমরা—ছোটকেই হয়ে টুম্বকা, অথবা ডাইনে মোড় নিয়ে চলে যেতাম বাঘমুণ্ডা। "নগ্ননির্জন" উপন্যাসের পটভূমিকায়।

আসন্ন সন্ধ্যার মুখে যখন বড় বড় ধনেশ পাখিগুলো গ্লাইডিং করে গোলাপি আকাশের আর ঘন জঙ্গলের পটভূমিতে পাহাড়ের কোলে কোলে ফিরে যেত, তখন তুমি যদি চুপ করে বাংলোর বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে থাকতে, তবে তোমার মন এক দারুণ দেনা-পাওনাহীন আনন্দে ভরে উঠত।

যদি টুম্বকা অথবা বাঘমুন্ডাও না ভালো লাগত, চলে যেতে আমার সঙ্গে তবে টিকরপাড়ায়। যেখানে মহানদী নীল হয়ে বয়ে চলেছে গভীর খাদের মধ্যে দিয়ে। ওরা বলে সাতকোশীয়া গন্ড। চোদ্দ মাইল চলেছে মহানদী দু-পাশের মাথা উঁচু পাহাড়ের মধ্যের খাদের বুক বয়ে।

নদীর দু-পাশে বোধ রাজ্যের মাথা-উঁচু পাহাড়। বোধ, ফুলবানী ; দশপাল্লা। "পারিধী" উপন্যাসের পটভূমি দেখতে পেতে। তুমি যেখানেই যেতে চাইতে, সেখানেই নিয়ে যেতাম তোমাকে।

তুমি অবাক হয়ে ভালো-লাগায় তাকিয়ে থাকতে ; বলতে, ইস্-স্, কী সুন্দর। তুমি ভালো লাগায় শিউরে উঠতে, আর তোমাকে সুখী দেখে আমিও শিউরে উঠতাম। তুমি বলতে, আমার বাহুতে, গাল ছুঁইয়ে বলতে, ইস্-স, কী ভালো!

ডেরা থেকে অনেকদূর চলে এসেছিলাম। এদিকে গাছগুলো ঘন ছায়া ফেলেছে পথে। চাঁদের আলো এখানে পৌঁছবে না। ডেরার দিকে ফিরলাম এবার। অন্ধকারে কোথাও হাতী কি বাইসন, কি ভাল্লুকের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি হয়ে যেতে পারে।

ডেরার দিকে ফিরছিলাম, তখন হঠাৎ প্রায় দু-মাইল দূর থেকে এক বাঘিনীর ডাক শোনা গেল। উঁ—আ—ও।

সমস্ত নিশুতি রাত সেই ডাকে গম্‌গম করে উঠল। অনেকক্ষণ ধরে পাহাড়ে-পাহাড়ে প্রতিধ্বনি উঠল সে ডাকের। সে ডাক ভিজে বনে পিছলে যেতে লাগল। তারপর ঘনঘন ডাকতে লাগল বাঘিনী। বাঘকে ডাকতে লাগল। এমন চাঁদের রাতে, এমন হিমেল রাতে, বাঘিনী বাঘের আদর

www.BanglaBook.org

খাওয়ার জন্যে পাগলিনী হয়ে উঠেছে যেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্যদিক থেকে, বাঘমুণ্ডার দিক থেকে বাঘের আওয়াজ শোনা গেল। বাঘ উত্তর দিতে দিতে এগিয়ে যেতে লাগল আওয়াজের দিকে। তার আওয়াজে কোনো দ্বিধা, কোনো সংশয় ছিল না। আত্মপ্রত্যয় ঝরে পড়ছিল তার উদাত্ত ডাকে। বাঘিনীও ডাকতে ডাকতে বাঘের ডাকের দিকে আন্দাজ করে এগিয়ে যেতে লাগল।

এখন বাঘিনীদের আদর খাওয়ার সময়।

আস্তে আস্তে ডেরায় ফিরে ভাবলাম, এখন সারা রাত তাঁবুর মধ্যে শুয়ে শুয়ে বাঘ ও বাঘিনীর ডাক শোনা যাবে। সারা রাত ওদের খেলা চলবে। এক দারুণ খেলা। তারপর ভোর হয়ে গেলে ওরা দুজনে দুজনকে ছেড়ে চলে যাবে। ক্লান্তির, ক্লান্তি অপনোদনের; আরামের ঘুম ঘুমাবে ওরা আলাদা আলাদা—। নালার রোদ-পড়া শুকনো বালির ওপরে অথবা গুহায়। চিত হয়ে শুয়ে রোমকূপে, শরীরের আনাচে-কানাচে, প্রতি অঙ্গ এবং প্রত্যঙ্গে রোদ লাগাবে। সূর্যের আশীর্বাদে অভিষিক্ত করবে নিজেদের। তারপর আগামী রাতের জন্যে, ঘুমের মধ্যে, সারা দুপুর ঝুরঝুর স্বপ্নের মধ্যে, গোঁফের আড়ালে হাসি হাসি মুখে নিজেরা তৈরি করবে নিজেদের। নিজেদের নরম লোমের শরীরে তাপ সঞ্চিত করে নেবে। নিজে জ্বলবার জন্যে। অন্যকে জ্বালাবার জন্যে।

তাঁবুর মধ্যে ঢুকে, জামাকাপড় খুলে কম্বলের নীচে চলে গেলাম।

এমন অনেক রাতে সত্যিই মনে হয়, একজন সঙ্গিনী, বাঘিনী নয়, নিছক একজন মানবী সঙ্গিনী থাকলেও থাকতে পারত আমার। আমি তো কলুঙ্গীর ফুল-বেলপাতা খেয়ে থাকা দেবতা নই। আমি যে রক্তমাংসের একজন সাধারণ মানুষ।

না, না। বাঘিনী চাইনি আমি, কখনোই না। মানবীই চেয়েছিলাম একজন। একজন নরম, লাজুক, মিষ্টি মেয়েকে চেয়েছিলাম। একটিমাত্র মেয়ে তার নাম নয়না।···

ঘুম আসছিল না। রাত প্রায় দুটো বাজে। শীতটা এখন খুব বেশি। বাইরে নালার জল যেন বরফ হয়ে গেছে। কুলকুলানি আওয়াজটা যেন অনেক ঘন হয়ে এসেছে। ক্যাম্প খাটে এপাশ ওপাশ করছিলাম। ওপাশে ফোল্ডিং টেবুলে লেখার কাগজ-কলম। জামাকাপড়। বন্দুক ও রাইফেল দুটো এক সারিতে গান-র‍্যাকে সাজানো। বাইরের আগুনের আঁচ এসে তাঁবুর ফাঁক-ফোকর দিয়ে ব্লুইং করা ব্যারেলগুলোয় পড়ে চক্‌চক করছে। তাঁবুর ওপরে গাছের পাতা থেকে শিশির পড়ছে টুপ টুপ করে। কুভাটুয়া পাখিটা এখনও ডেকে চলেছে একটানা গুব—গুব—গুব—গুব।

ঘুম আসছিল না। অনেক কথা মনে আসছিল—ধানখেতে বগারী পাখির ঝাঁকের মতো। মনে আসছিল, আবার পরমুহূর্তেই দল বেঁধে উধাও হয়ে যাচ্ছিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যখন ঘুম ভাঙল তখন রোদ উঠে গেছে। তাঁবুর দরজার ফাঁক দিয়ে আলো এসে ঢুকেছে ভিতরে।

নালার ওপাশে একটা ঝাঁকড়া অশ্বত্থ গাছে কম করে পাঁচশো পাহাড়ী হায়না একসঙ্গে কিচির-মিচির শুরু করেছে। নেপালী ইঁদুর ডাকছে।

জঙ্গলের অবসরে সবে ঘুম-ভাঙা আলস্যের মধ্যে সকালের এই বিচিত্র ও বিভিন্ন শব্দমঞ্জরী কানে ঝুম্‌ঝুম্‌ করে বাজে। বিশেষ কাজ না থাকলে বিছানা ছেড়ে উঠতেই ইচ্ছা করে না। এই সব মুহূর্তে শুয়ে শুয়ে বারট্রান্ড রাসেলের "ইন প্রেইজ অফ আইডেলনেস" লেখাটার কথা খুব মনে পড়ে। ভদ্রলোক সার বুঝেছিলেন।

তাঁবুর বাইরে এসে দেখি, রোদে চারদিক ঝক্‌ঝক করছে। বনের মধ্যে সকাল হলে মনেই পড়ে না যে রাত বলে কোনো একটা অস্পষ্ট অনিশ্চয়তায় ভরা ভয়-ভয় ব্যাপার ছিল কয়েক ঘণ্টা আগেই।

বহুদূর অবধি যতদূর চোখ পৌঁছয়, সব কিছুই আলোতে পরিষ্কার দেখা যায়। দূরের গাছের রোদ-ঝল্‌মল্‌ পাতা। কালো-পাথরে ছিটকে পড়া নালার জলের ক্ষণিক-সাদা, পথের পাশের এ্যালিফ্যান্ট গ্রাসের সজীব সবুজ ফালিগুলো এক প্রাঞ্জল নিশ্চয়তায় ভোরের উত্তুরে বাতাসে হেলে দোলে।

তাঁবুর বাইরে তখন কেউই নেই। সব কাবাড়িয়া কূপ কাটতে বেরিয়ে গেছে। হটবাবুও নেই। ওরা যেখানে রান্না করেছিল, সেই রান্নার আগুন-গুলো এখনও ধিকি ধিকি জ্বলছে।

যখন নকুলের বানানো চা খাচ্ছি বাইরে বসে, নালায় মুখ হাত ধুয়ে নেওয়ার পর তখন বানিয়া কিণ্ট সাউ তার আশ্চর্য ডালিটি কাঁধে নিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এসে হাজির।

কিষ্ট সাউই এখানের মোবাইল ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। দিনের বেলাতে বেশ সুখি ভাব। ওর চেহারা দেখে কেউ বিশ্বাস করে না যে, পাহাড়ে-জঙ্গলে মাইলের পর মাইল বাঘ-বাইসন-হাতী ভরা জঙ্গলে অবলীলায় হেঁটে যায় ও এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে বারো মাস।

কিষ্ট সাউই এখানের মোবাইল ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। দিনের বেলাতে সব সময়েই তার খালি গা। সাজি মাটিতে কাচা, মালকোচা মেরে পরা মোটা ধুতি আর মাথায় সেই চুবড়ি। খুব শীত পড়লে ধুতির কোণটা গায়ে জড়িয়ে নেয় ও পথ চলার সময়। শীত ও গ্রীষ্মে সব সময়েই তার মুখে বানিয়ার হাসি। পৃথিবীর সব বানিয়ার হাসিই বোধহয় একরকম।

কিষ্ট বলল, দণ্ডবৎ আইজ্ঞা।

আমি নমস্কার করে ওকে বসতে বললাম। নকুলকে একটু চা বানাতে বললাম ওর জন্যে—সঙ্গে তেল-কাঁচালংকা-পেঁয়াজ দিয়ে মাখা মুড়ি। আমার এবং ওর ব্রেকফাস্ট।

শুধোলাম ব্যবসা কেমন?

কিষ্ট বলল, ব্যবসা খুবই খারাপ। জঙ্গল-পাহাড়ের লোকদের এমন দুরবস্থা এর আগে কখনও হয়নি। আপনি তো কাবাড়িদের দেখছেন। ওদের তাও তো রোজগার আছে। যাদের আলাদা রোজগার নেই, ভাগচাষ করে, জঙ্গলে-জঙ্গলে ফল-মূল কুড়িয়ে যাদের জীবন কাটে, তাদের আমার মতো মহাজনের কাছ থেকেও কিছু কেনার আর অবস্থা নেই।

তারপর কিষ্ট বলল, আজকাল রোজই প্রায় দশ মাইল করে হাঁটতে হয়। আগে আগে এক এক গ্রামে গিয়ে তিন-চার মাইল অন্তর অন্তর বিশ্রাম পেতাম। কারো বাড়িতে শুয়ে রাত কাটিয়ে দিতাম। এখন তিন গ্রাম মিলিয়ে বিক্রি করলেও দিনে পাঁচ টাকা দশ টাকার বেশি বিক্রি নেই।

কিষ্টকে বললাম, আনো দেখি তোমার ঝুড়ি। কি মাল আছে দেখি?

কিষ্ট ঝুড়ি এনে সামনে বসালো।

প্যান্ডোরার বাক্সের মতোই আশ্চর্যজনক ঝুড়ি এ। পৃথিবীর তাবৎ জিনিস এই একটি ঝুড়ির মধ্যে আছে। রাবারের চটি, গামছা, ধুতি, শাড়ি। সবই একখানা দু-খানা করে। এ্যানাসিন, কোডোপাইরিন ও কুইনীনের বড়ি। নিরোধের প্যাকেট। তরল আলতা, সিঁদুর, চুল-বাঁধার রিবন, কাঁচি, ছুরি, সাবান, সস্তার বলপয়েন্ট পেন, চা, চিনি। নেই এমন জিনিস নেই।

পুরুনাকোটে অবশ্য কিষ্ট ব্যবসা করতে আসেনি। কারণ পুরুনাকোটে প্রায় রোজই ট্রাক যাতায়াত করে শীতকালে। ও বরং এসেছে এখানে ওর ফুরিয়ে যাওয়া চা-চিনির রসদ কিনে নিতে। ওর আসল বাণিজ্য হল এমন এমন গ্রামে, যেখানে মাত্র দু'শ ঘর লোকের বসতি—দূরে—দুর্গম জায়গায়।

কিষ্টর সঙ্গে কথা বলছি, এমন সময় কিষ্ট উদ্বেগহীন গলায় ধীরে সুস্থে বলল, এ সাপটা এখানে এল কি করে? এ কামড়ালে তো পাঁচ মিনিটের মধ্যে

www.BanglaBook.org

আপনি শেষ।

কিষ্টর দৃষ্টি অনুসরণ করে আমি তাকালাম বটে, কিন্তু কোনো সাপই দেখতে পেলাম না।

কিষ্ট যেদিকে তাকিয়েছিল, সেদিকে কতগুলো খড় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল। কিছু খড় এক জায়গায় জড়ো করে রাখা ছিল। পোড়োগুলোর রাতের খাওয়ার জন্যে।

ভালো করে দেখেও আমি কিছু দেখতে পেলাম না।

কিষ্ট নিজেই বলল যে, (কল্পিত) এ সাপ কামড়ালে মানুষ পাঁচ মিনিটের বেশি বাঁচে না, অথচ সে সাপ দেখতে পাওয়া সত্ত্বেও ওঁকে বিন্দুমাত্র বিচলিত দেখাল না।

যারা জঙ্গলে জন্মেছে, জঙ্গলেই বড় হয়েছে, জঙ্গলেই যারা মরবে, তাদের বোধহয় অত সহজে বিচলিত হলে চলে না।

ঐদিকে ভালো করে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমার মনে হল, একটা শুকনো খড় মাটি থেকে সোজা উঁচু হয়ে রয়েছে যেন মন্ত্রবলে। পরমুহূর্তেই খড়টা একটু যেন হেলেদুলে উঠল। খড়টা একটা পাটকিলে সাপে রূপান্তরিত হয়ে তার সরু লিক্‌লিকে জিভ বের করে মাথাটা এ-পাশে ও-পাশে হেলাতে লাগল। ওটা যে একটা সাপ এবং প্রচণ্ড বিষধর সাপ তা কিষ্ট সাউ না থাকলে আমার জানার বা চেনার কোনো উপায়ই ছিল না।

কিষ্টকে চা এনে দিল নকুল ইতিমধ্যে।

সাপটা তার সরু মুখটা ঘুরিয়ে আমাদের কথা শুনছিল।

কিষ্ট ধীরে-সুস্থে একটা চুমুক লাগাল চায়ের গেলাসে। তারপর কাল রাতের আগুনের জায়গা থেকে একটা পোড়ো-কাঠ তুলে নিয়ে সাপটার কাছে এগিয়ে গিয়ে ঝাড়ু দেওয়ার মতো করে কাঠটা দিয়ে সাপটাকে আঘাত করল।

আঘাত করতেই, সাপটার কোমর ভেঙে গেল। কোমরটা মাটিতে লেপটে রইল। আর কোমর থেকে ঊর্ধ্বাংশ ওপরে উঠিয়ে ফণা তুলল সাপটা। এখন তার আসল চেহারাটা দেখা গেল। শরীরটা তিনগুণ চওড়া হয়ে গেল। পাটকিলে রঙ বদলে গিয়ে তার মধ্যে থেকে সবুজ রঙ ফুটে বেরোল। ফণাটা প্রায় দেড়-ইঞ্চি চওড়া হল। তার ফণা ধরার বহর দেখে বোঝা গেল তার বিষ ঢালার ক্ষমতা কতখানি।

কিষ্ট সাউ আবার বাড়ি মারল তার মাথায়। এবারে সাপটা নেতিয়ে পড়ল। কিন্তু তার সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকল। অনেকক্ষণ। মরে যাবার পরও রিফ্লেক্স অ্যাক্‌শানে তার সরীসৃপের শরীরটা কুঞ্চিত ও সম্প্রসারিত হতে লাগল।

কিষ্ট সাউ আবার এসে চায়ের গেলাস তুলে নিল।

বলল, এটা কি সাপ জানেন ঋজুবাবু? এর নাম কানখুস্টা। এ সাপ কেউটের চেয়েও মারাত্মক বিষধর।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শুধোলাম, কানখুস্টা নাম কেন ?

কিষ্ট হাসল। বলল, দেখছেন না কান খুঁচোনির মতো সরু এর চেহারা। লাউডগা সাপের চেয়েও সরু। সাংঘাতিক সাপ এ।

আমি শুধোলাম, কাঠটা অমন ঝাঁটার মতো করে শুইয়ে মারলে কেন তুমি সাপটাকে ?

কিষ্ট বলল, আপনারা তো দামী দামী বন্দুক, রাইফেল ব্যবহার করেন। আমাদের তো অত সব নেই। লাঠি আর টাঙ্গীই আমাদের ভরসা। লাঠি দিয়ে সাপ মারতে হলে ওরকম ঝাঁটার মতো করেই মারতে হয়—শুইয়ে। যদি সোজা করে মারেন, তাহলে ফসকে যাবার সম্ভাবনা বেশি। আর বিষধর সাপের বেলায়, আপনার লাঠি-ফসকানো মানেই প্রাণ-ফসকানো।

নকুল মুড়ি মেখে নিয়ে এল।

বলল, আলো বাপালো, এ সাপ তাঁবুর মধ্যে কুপরীর মধ্যে ঢুকে তো যাকে-তাকে কামড়াতে পারে। ছুঁচের মতো সরু তো।

কিষ্ট সাউ বিজ্ঞের হাসি হাসল। বলল, আরে, এ সাপই তো ঢুকেছিল লখীন্দরের বাসর ঘরে।

অন্য সব জায়গার বানিয়ার মতো এখানের বানিয়াও সবচেয়ে ওয়েল-ইনফর্মড। কত জায়গায় ঘোরে ও কত লোকের সঙ্গে মেশে, কত শত খবর রাখে।

এমনভাবে কথাটা বলল কিষ্ট, যেন ও-ও লখীন্দরের সঙ্গে বাসর ঘরে ছিল।

নকুল বিনা বাক্যব্যয়ে কিষ্টর কথা মেনে নিল।

চা-টা খেয়ে কিষ্ট সাউ চলে গেল।

একটু পর সাইকেল চড়ে শ্যামলবাবু এলেন। শ্যামলবাবুর বাড়ি চারছক-এ। উনি কাঠের ঠিকাদারি করেন। ছোট ঠিকাদার। হটবাবুর মালিকদের মতো অত বড় কাজ না ওঁর। পুরুনাকোট আর টিকরপাড়ার মাঝে ওঁর তৈলা আছে। তৈলা মানে জঙ্গলের মধ্যে জঙ্গল কেটে যে আবাদ করা হয় তা-ই। এমনিতে সব ভালো, তবে শুনতে পাই যে, হাতীর উপদ্রব ভীষণ। সন্ধে হতে না হতেই খড়ের ঘরের চারপাশে হাতী ঘুরে বেড়ায়। অনেক সময় সকালের রোদ ওঠা অবধি থাকে। সারারাত তৈলার লোকেরা তেল-পটকা ফাটায়, কিন্তু হাতীর দলের ভ্রুক্ষেপ নেই তাতে। সকালে-বিকালে ময়ূর আসে। ময়ূর চরে বেড়ায় শ্যামলবাবুর তৈলার ভিতরে। অনেক সময় চিতল হরিণের পাল এসে ছবির মতো দাঁড়ায় বেড়া ঘেঁষে। তারপর তাড়া খেয়ে পালিয়ে যায়। তৈলার এলাকা হবে বিশ একর মতো। তিনদিক ঘিরে মাথা উঁচু গভীর বন। একদিকে টিকরপাড়ায় যাওয়ার রাস্তা। রাস্তার দু-পাশে সেগুনের প্ল্যানটেশান। সেগুনের সামনে সামনে রাস্তা ঘেঁষে বাঁশ বন। কন্টা-বাঁশ, নলা-বাঁশ, ডবা-বাঁশ।

এই পুরুনাকোট টিকরপাড়ার রাস্তা ধরে প্রায়ই হেঁটে বেড়াতাম দুপুর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেলা বোষ্টমনালায় চান-টান করার পর। দুপুরে খাওয়ার আগে খিদে করতাম।

দারুণ লাগে শীতের দুপুরে এই একা-একা পথ চলতে। কোথাও কোনো জনপ্রাণী নেই, গাড়ি নেই, বাস নেই, ট্রাক নেই। আদিগন্ত ঘন গভীর বন ছাড়া আর কিছুই নেই।

পথের দু-পাশে বাঁশ বনে ঝুরু ঝুরু করে উত্তরে হাওয়া বয়ে যায়। সরু-সরু পাশাপাশি বাঁশে বাঁশে ঘষাঘষি লেগে একরকম কট্‌কটি আওয়াজ বেরোয়। পাতায় পাতায় ছোঁওয়া লেগে দীর্ঘশ্বাসের মতো ভারি নিঃশ্বাস জাগে।

পথের পাশে যেখানে যেখানে বন গভীর, যেখানে রোদ পড়ে না বেশি, সেখানে লজ্জাবতীর কোমল নরম লতারা পাথর ছেয়ে থাকে। ছোট ছোট গোল গোল ফিকে বেগুনী ফুল ফোটে তাতে। জংলী শটী গাছ, কণ্টিকারী, আরও কতরকম নাম-না-জানা লতাপাতা। প্রজাপতির ঝাঁক গুনগুনিয়ে ওড়ে। রোদের মধ্যে এলে তাদের গা চকচক করে—আবার ওরা ছায়ায় উড়ে যায়। ওদের ডানার রোদ নিভে যায়। বড় বড় কাঁচপোকা বুঁবু—বুঁইইই আওয়াজ তুলে নিজেদের আনন্দেই নিজেরা হাওয়ায় পাক খায়। ছোট খুরান্টি হরিণ (মাউস ডিয়ার) এক দৌড়ে রোদ্দুরে বাদামী ঝলক তুলে রাস্তা পার হয়। ডানদিকের জঙ্গল থেকে বাঁদিকের জঙ্গলে যায়। কোথাও বা, যেখানে জঙ্গল অপেক্ষাকৃত ফাঁকা, সেখানে শুকনো পাতা মচ্‌মচিয়ে ছাই-রঙা নীলগাইয়ের দল দৌড়াদৌড়ি করে বেড়ায়। নেপালী ইঁদুর (বড় বাদামী কাঠবিড়ালী) বড় বড় গাছের মগডাল থেকে মগডালে লাফিয়ে লাফিয়ে শুঙ্গার করে।

এ পথে একদিন দেখা হয়েছিল যাত্রার দলটার সঙ্গে। অল্পবয়সী একদল ছেলে, বাড়ি ওদের দশপাল্লা। টিকরপাড়া থেকে হেঁটে আসছিল ওরা পুরুনাকোটের দিকে। যে যাত্রাদলের মালিক, তার বয়স বড় জোর পঁচিশ হবে। পাহাড়ী তক্ষকের মতো তার গায়ের রঙ, ধুতি পরা, গায়ে নীলরঙা টুইলের শার্ট, হাতে একটা এইচ্‌-এম্‌-টি হাতঘড়ি, কপালে রসকলি, ডান-হাতে হাওয়ায় ওড়া সাদা চামর, কাঁধে একটা লালরঙা থলে। ওর পিছনে পিছনে দলের চার-পাঁচজন মালপত্র সমেত হেঁটে যায়।

আসার সময় ওরা পথের পাশের নদীতে চান করে নিয়েছিল। নদীর পারে পাথরের ওপর বসে পোকাল ভাত খেয়ে নিয়েছিল শুকনো লংকা আর পেঁয়াজ দিয়ে। ওরা পুরুনাকোটে সীতাহরণ পালা করবে বলে বায়না পেয়েছিল। পুরুনাকোট থেকে ছোট্‌কুই যাওয়ার পথে ফরেস্ট গেট-এর সামনে রাস্তার ওপর হ্যাজাক জ্বালিয়ে রাতে সীতাহরণ পালা হত। পথের ওপর একদিকে ছেলেরা, অন্যদিকে মেয়েরা ধুলোর মধ্যে বসে থাকত সারারাত ঐ প্রচণ্ড শীতে। সীতাহরণ পালার গান রিন্‌ রিন্‌ করে বাজত চতুর্দিকের বন-পাহাড়ে। আমাদের ডেরা থেকেও শুয়ে শুয়ে ঘুঙুরের শব্দ আর ওদের

www.BanglaBook.org

চিকণ তরুণ গলার অস্পষ্ট রেশ শোনা যেত রাতভর।

এই বন, এই পাহাড়, এই নদী-নালা, এই লোকজন, পশু-পাখি এরা সকলে মিলে আমার মধ্যে কি যেন ঘোরের সৃষ্টি করে। কলকাতার সব কথা ভুলে যাই। এমনকি মাঝে মাঝে তোমার কথাও ভুলে যাই।

অবশ্য তোমার কথা একেবারে ভোলা যায় না। তোমার একটা ছবি আছে আমার কাছে। সেটা সব সময় আমার কাছেই থাকে। তোমার ছেলে বেলার ছবি। পার্ক স্ট্রিটের বোম্বে ফোটো টোরস্-এ তুলেছিলে তুমি।

যে শাড়িটা পরে তুমি ছবিটা তুলেছিলে, সে শাড়িটার কথা আমার এখনও মনে আছে। হাল্কা কচি-কলাপাতা-রঙা একটা টাঙ্গাইল শাড়ি। পাড় ছিল তার কালো-রঙা। কনুই অবধি ব্লাউজ পরেছিলে তুমি। গলায় একটা গুজরাটি মঙ্গলসূত্রম্। কানে মুক্তোর ইয়ারটপ্। ডান হাতে ঘড়ি—কালো ব্যান্ডের। বাঁ হাতের অনামিকায় একটা সীসের আংটি। বাঁ হাতটা তোমার উরুর ওপর রাখা। তার ওপরে ডান হাত। তোমায় সুন্দর আঙুলগুলো; তোমার আশ্চর্য গড়নের সুন্দর নখ। তোমার উজ্জ্বল চোখ দুটি, তোমার ঠোঁটের ভাঁজ, তোমার সুকুমার চিবুক, সব মিলিয়ে কী এক আশ্চর্য হাসির আভাস তোমার সমস্ত মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে আছে। তোমার সুন্দর গ্রীবা, লো-কাট ব্লাউজে দৃশ্যমান তোমার কণ্ঠার হাড়। তোমার সেই সমস্ত তুমিকে আমি সব সময় আমার বুকের মধ্যে নিয়ে বেড়াই।

তোমার অনেক ছবি আমার কাছে আছে। নৈনিতাল-এর ছবি, দার্জিলিং-এর ছবি, দীঘার ছবি, পুরীর ছবি, কিন্তু কোনো ছবিই এ ছবির মতো নয়। এ ছবিতে আমার নয়না সোনা এক সরল অপাপবিদ্ধ ভালোবাসায় ভাসছে। এখন তুমি অন্যরকম হয়ে গেছ। কত অন্যরকম!…

আমি অন্যমনস্ক হয়ে নালার দিকে তাকিয়েছিলাম।

একদল হনুমান ওপার থেকে জলে নেমে জল খাচ্ছে। মা-হনুমানের বুকে ছোট্ট সুন্টুনি-মুন্টুনি বাচ্চা। বাবা-হনুমানের রকমসকম ভারিক্কি। সে এদিকে-ওদিকে সাবধানী চোখে তাকাচ্ছে।

শ্যামলবাবু আমার সামনেই বসেছিলেন। কতক্ষণ বসেছিলেন, কখন চায়ের গেলাস খালি করে ফেলেছিলেন, খেয়ালই হয়নি আমার।

হঠাৎ উনি বললেন, ঋজুবাবু, একবার তৈলায় রাতে না বসলে তো হয় না। হারামীদের জ্বালায় আর পারি না।

আমি বললাম, বসে লাভ কি? হাতী মারার পারমিট কোথায়?

উনি বললেন, হাতী না, শুয়োর। হাতীর উপদ্রব এখন কম। শুয়োরের জ্বালায় তো কিছুই আর রাখা যাচ্ছে না। খরগোসও আসে ডজনে ডজনে। আর দিনের বেলা শ'য়ে শ'য়ে পাখি। আমার চাষবাস মাথায় উঠেছে।

আমি শুধোলাম, তৈলায় কি বুনছেন এখন?

শ্যামলবাবু বললেন, বিড়ি (কলাই ডাল), কুলথী, অড়হর, রাশি, চীনাবাদাম। লাগিয়েছি সবই, কিন্তু কিছুই রাখা যাবে বলে মনে হচ্ছে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে হারামী টিয়া আর বগারী।

আমি হাসলাম।

উনি কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন, আপনি হাসছেন? দিনের বেলা চারটে মাগীকে রাখতে হয়েছে খেত পাহারা দেবার জন্যে। সন সময় তারা ক্যানেস্তারা পেটাচ্ছে, তবুও পাখির কিছু ভ্রুক্ষেপ আছে?

আমি বললাম, ঠিক আছে। বিকেল-বিকেল গিয়ে বসব এখন একদিন। কুপরী বানিয়ে রাখবেন একটা জায়গা মতো।

শ্যামলবাবু বললেন, প্রথম রাতে আসে না। আসে শেষরাতে। সারারাত কেন কষ্ট করে বসবেন? তার চেয়ে রাত বারোটা-একটায় বসলেই তো হবে।

আমি বললাম, ঠিক আছে। তাই যাবো।

উনি বললেন, অত রাতে এখান থেকে এতটা পথ যাওয়ার কি দরকার হেঁটে? তার চেয়ে তৈলাতে গিয়ে শুয়ে থাকবেন ঘরে। আমাদের সঙ্গে না হয় খাবেন, সেদিন রাতে; খিচুড়ি আর ডিমভাজা খাবেন। কেমন?

বললাম, আচ্ছা।

তারপর শুধোলাম, অনিবাবু কেমন আছেন? এবারে এসে অবধি দেখা হল না ওঁর সঙ্গে।

শ্যামলবাবু বললেন, আছেন একরকম। বয়স তো হয়েছে। তার উপরে একটা বড় স্ট্রোক হয়ে গেছে। এখন যেমন থাকা যায় তেমনই আছেন।

এরপর একটু গল্পগুজব করার পর শ্যামলবাবু উঠলেন।

ততক্ষণে রোদ বেশ কড়া হয়েছে। তোয়ালে ও জামাকাপড় কাঁধে ফেলে সর্ষের তেলের শিশি হাতে ঝুলিয়ে পাইপটাতে ভালো করে তামাক ভরে আমি বোষ্টম নালার কজওয়ের দিকে রওনা হলাম।

কজওয়ের বাঁ দিকে জল বেশ গভীর। জায়গায় জায়গায় পাথরের মধ্যে মধ্যে সাদা বালির চর—মসৃণ: মেয়েদের উরুর মতো। বড় বড় শলাই গাছ—মোটা মোটা গুঁড়ি। অন্যান্য বড় গাছের মতো। কালো পুষ্ট শিকড় বালি ফুঁড়ে বেরিয়ে রয়েছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন অনেকগুলো ছোট বড় কুমীর রোদ পোহাচ্ছে।

এখানে নালাটা একটা প্রপাত মতো সৃষ্টি করে প্রায় বারো ফিট উঁচু থেকে লাফিয়ে পড়েছে নিচের জলে। সেখানে কাঁচা বাঁশের বেড়া বানিয়ে বাঁধ দিয়েছে গ্রামের লোকেরা মাছ ধরার জন্যে। নানারকম মাছ ধরা পড়ে এখানে, পাহাড়ী মাছ; ছোট ছোট।

জল কম হলে কি হয়, প্রচণ্ড স্রোত নদীতে। পা রাখা যায় না। মনে হয়, হাতী ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার বল রাখে এতটুকু নদী। সাঁতার কাটারও উপায় নেই পাথরের জন্য। এক জায়গায় সাঁতার কেটে ভেসে থাকাও যায় না। জলের তোড় মুহূর্তের মধ্যে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে পাথরে ধাক্কা মারে।

যেখানে চান করতে পৌঁছলাম আমি, সে জায়গাটা রাস্তা থেকে দেখা যায় না। নদীটা একটা সমকৌণিক বাঁক নিয়েছে প্রপাতটার আগে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে রোদের মধ্যে উত্তপ্ত পাথরে বসে সারা গায়ে সর্ষের তেল মাখতে মাখতে ভীষণ জংলী জংলী মনে হয় নিজেকে। এই পাথর, বালি, আকাশ, জল, ঘাস, গাছ, পাখি, পাহাড়ের সঙ্গে নিজেকে দারুণ একাত্ম মনে হয়।

জলে যখন ঝাঁপিয়ে পড়লাম জল ছিটকে উঠল চারদিকে। হাজার হাজার হীরে ঝলমল করে উঠল অনেকখানি পরিমণ্ডলে সকালের রোদ্দুরে।

নদীর মধ্যেই অটুট অবস্থায় থেকে যাওয়া একটা বন্ধন গাছের গুঁড়ির উপর এতক্ষণ একটা বাদামী আর বেগুনীতে মেশা মাছরাঙা বসেছিল। আমি জল ছিটিয়ে জলে নামার সঙ্গে সঙ্গে সে একটা অদ্ভুত ব্যথাতুর স্বরে ডাকতে ডাকতে নদীর উজানে উড়ে গেল।

বন্ধন গাছের ডাল খুব শক্ত। এ গাছের ডাল দিয়ে গোরুর গাড়ির চাকা বানানো হয়। রেল লাইনের স্লিপারও হয় এই কাঠে।

নদীটা বোধহয় পথ বদলেছিল, যে কোনো নারীর মতো, ওরা বড় ঘন ঘন পথ বদলায়; মন বদলায়। তার নতুন পথে এই গাছটা পড়ে গিয়েছিল। তার ডাল-পালা, শাখা-প্রশাখা সব ভেঙেচুরে নিয়ে গেছে নারী নদী তার নিজের চলার তাগিদে, তার নিখাদ স্বার্থপরতায়। তবুও নির্লজ্জের মতো এই শক্ত বিশ্বস্ত মধ্যবয়স্ক পুরুষ গাছটা, তার ঋজু শরীরে এক কোমর জলের মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, জানিয়ে দিচ্ছে যে, তার হৃদয়েতে পথ কেটে এ নদী চলে গেছে অন্য হৃদয়ে; কিন্তু সে নিজে পথ বদলায়নি।

এ গাছটা আমারই মতো বোকা। তোমারই মতো কোনো নদী তাকে নিঃস্ব, রিক্ত, সর্বস্বহৃত করে চলে যাবার পরও সে তবু একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। ও ঘন ঘন জায়গা বদলাতে, মন বদলাতে পারেনি। তাই ও ঠকেছে; ঠকছে। পুড়ছে রোজ-দিন ঠা-ঠা রোদ্দুরে। এক কোমর জলে দাঁড়িয়েও পুড়ে ছাই হচ্ছে। আমার মতই ও বুঝি এখনও জানে না যে একই জায়গায়, একই প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ও কখন নিজেও বন্ধ্যা হয়ে গেছে।

চান শেষ হয়ে এসেছিল। আমি বালিতে উঠে পাথরে দাঁড়িয়ে তোয়ালে দিয়ে গা মুছছি, এমন সময় জিপের এঞ্জিনের আওয়াজ ও টিউলির উত্তেজিত গলা শুনলাম, কজওয়ের দিক থেকে। আমার নাম ধরে টিউলি খুব জোরে জোরে ডাকছে। আমাকে তাড়াতাড়ি আসতে বলছে।

আমি তাড়াতাড়িতে শর্টস্‌টা পরে নিয়ে খালি গায়েই তোয়ালে আর ছাড়া-জামাকাপড় হাতে ওদিকে দৌড়ে গেলাম। কজওয়ের কাছে পৌঁছতেই টিউলি বলল, বাবু শীগগির চলুন, কালিয়া গাছ চাপা পড়েছে।

টিউলি জিপটার স্টার্ট বন্ধ না-করে, জিপের মুখটা ঘুরিয়ে কজওয়ের ওপরেই দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। আমি ওখানে পৌঁছতেই ও সরে বসল। স্টিয়ারিংয়ে বসে আমি যত জোরে পারি জিপ ছুটিয়ে চললাম। ডেরা অবধি একই রাস্তা। তারপর ডেরার ডানদিক দিয়ে জঙ্গলের ভিতরে চলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেছে পায়ে-চলা পথ। পায়ে-চলা যদিও, তবে জিপের যাওয়ার মতো করে রেখেছিল ওরা ডালপালা কেটে শীতের প্রথমেই, কারণ কটক থেকে ঠিকাদার বাবুরা এলে জঙ্গলের বেশির ভাগ কূপ ওরা ঘুরে ঘুরে দেখেন। কমপক্ষে মাসে একবার দু-বার আসেনই ওঁরা।

একটা পাহাড় টপ্‌কে যখন অকুস্থলে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন দূর থেকে দেখতে পেলাম একটা জায়গায় জঙ্গলের মধ্যে পথ থেকে বেশ দূরে ওরা সকলে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

জিপ থামিয়ে টিউলির সঙ্গে দৌড়ে ওদের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। কিন্তু তখন কারোই কিছু করার ছিল না।

জায়গাটায় কপিসিং ফেলিং হচ্ছিল। সাউন্ড গাছ দেখে দেখে দিন সাতেক আগে পুরুনাকোটের রেঞ্জার আর ফরেস্ট গার্ডরা হাতুড়ির মতো মার্কা দিয়ে চিহ্নিত করেছিলেন গাছগুলোকে। এসব জঙ্গলে এরকম দুর্ঘটনা বড় একটা ঘটে না। চিরদিনই ওরা বড় বড় মহীরুহকে টাঙ্গি দিয়ে কেটে কেটে একসময় ঘটনাবিহীনভাবে মাটিতে ফেলে দেয়। বহু বছরের পুরনো গাছগুলো যখন তাদের সমস্ত শাখা-প্রশাখা, লতা-পাতা, তাদের মগডালে-ঝোলা মৌচাক, গুঁড়িতে-লতানো স্বর্ণলতার-জাল, ডালে ডালে পাহাড়ী পাখির বাসা, হাজার হাজার কাঠ পিঁপড়ে ও সাপখোপের ছানাপোনা সমেত আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে, তখন দেখতে ভীষণ কষ্ট হয়। শেষবারের মতো তাদের শাখা-প্রশাখা আকাশের দিকে হাত তুলে প্রতিবাদ জানায়; আর্তনাদ করে তারা।

এই ঝাঁকড়া তেঁতরা গাছটা এমন অনেক অনেক গাছের মৃত্যু-যন্ত্রণার প্রতিশোধ নিল বোধহয় কালিয়ার ওপর। গাছটা ফেলছিল ওরা উপত্যকার দিকেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কালিয়া গগনের সঙ্গে কি সব রসিকতা করছিল, হাসছিল ফ্যাক্ ফ্যাক করে। ও টাঙ্গি হাতে একটা আলগা পাথরের ওপর দাঁড়িয়েছিল উল্টোদিকে। কি করে, কেউ জানে না, পাথরটা হঠাৎ গড়িয়ে যায় উপত্যকার দিকে। কালিয়া সামলাতে না পেরে পড়ে যায় এবং ও পাথরটার সঙ্গে গড়িয়ে যায় নীচে। ততক্ষণে এসে গেছে, এসে গেছে, সমস্ত আকাশ ডালপালার সবুজ মেঘে ঢেকে গাছটা কালিয়ার বুকের ওপর এসে পড়ে। পাঁজরাগুলো সব গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায় কালিয়ার। মাথাটা আছাড় খায় একটা তিনকোনা পাথরের ওপরে। পোড়ো দিয়ে যখন ওরা গাছটাকে টেনে সরায় একপাশে, তখন কালিয়াও ছেঁচড়ে চলে যায় অনেকখানি কাঁটা-পাথরের উপর দিয়ে। তারপরে গাছটাকে আলাদা করা হয় কালিয়ার শরীরের ওপর থেকে। কালিয়া একটু জল খেতে চায়, ওর ছোট মেয়ের নাম ধরে একবার ডাকে।

ওরা কেউ কোনো কথা বলছিল না। ওদের মুখ ভাবলেশহীন।

আমাকেই ওদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উত্তেজিত, বিচলিত ও ভাবিত দেখাচ্ছিল। কারণ আমি শহরের লোক। আমার এসব দেখা অভ্যেস নেই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওদের মুখগুলো দেখে মনে হচ্ছিল, ওরা এই মৃত্যুকে 'ইটস্ অল ইন দা গেমে'র মতোই মেনে নিয়েছে। ওরা জানে এরকম হতেই পারে ; হয়ও।

ঠিক হল, হটবাবু, টিউলি, দুগা ওরা সকলে মিলে এখুনি জিপে করে কালিয়ার মৃতদেহ নিয়ে যাবেন পম্পাশরে, কালিয়ার গ্রামে।

কালিয়া ঘুমিয়ে থাকবে পম্পাশর আর লবঙ্গীর মাঝামাঝি কোনো ছায়াচ্ছন্ন জায়গায়। সেখানে আরামে শুয়ে শুয়ে ও কন্দমূলের গন্ধ পাবে নাকে। চারধারে মুতুরি ও শিয়ারি লতা গজিয়ে উঠবে। গিলিরি ফুলে এক-সময় ছেয়ে যাবে জায়গাটা। কখনও বা না-নউরিয়া ফুলের লাল লাল থোকা ফুটবে সেখানে। আজ থেকে একবছর, দু-বছর, তিনবছর পরে কালিয়ার কিশোর ছেলে শান্ত চোখে চেয়ে থাকবে তার বাবার স্মৃতির দিকে। ওর বাবার কাছ থেকে কিছুই পাবে না ও। ব্যাঙ্কের টাকা পাবে না, কভেনান্টেড চাকরি পাবে না। কাবাড়ির ছেলে কাবাড়ি তার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত একমাত্র সম্পত্তি—ট্রাকের ফেলে দেওয়া টায়ার দিয়ে বানানো বাবার এক জোড়া ছেঁড়া চটি এবং চক্‌চকে ধারালো টাঙ্গিটা হাতে নিয়ে কোনো ঠিকাদারবাবুর ক্যাম্পের সামনে এসে দাঁড়াবে ও। ওর বাবার মতো ও কূপ কাটবে, আফিং-এর গুঁড়ো সেদ্ধ করে খাবে জলে, খিদে নামক যন্ত্রণাটা নিবৃত্ত করতে। রাতের বেলা আগুনের খুব কাছে কুকুরের মতো ও শরীরটাকে কুণ্ডলী পাকিয়ে শীতের হাত থেকে বাঁচতে চাইবে। তারপর একদিন হাসতে হাসতে, সরল প্রতিবাদহীন হাসি দিয়ে সব দুঃখ ভুলিয়ে রাখতে রাখতে একদিন ওর বাবারই মতো, একটা ঠাট্টার মতো পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাবে।

পম্পাশরে যাবার আগে হটবাবু কটকে দুর্ঘটনার খবর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন অন্য এক ঠিকাদারের মারফত।

কাবাড়িরা সকলেই আলোচনা করছিল, কালিয়ার পরিবারকে কোনো সাহায্য দেবেন কি না বাবুরা। তারপর নিজেরাই বলছিল, বাবুরা লোক খুব ভালো।

কিছু টাকা আমি কালিয়ার পরিবারের জন্যে দিয়ে দিতে পারতাম। দিতে খুব ইচ্ছাও করেছিল। কিন্তু হটবাবু বললেন, সৎকার করার মতো অনেক টাকা ওঁর কাছে আছে। তাছাড়া বাবুরা কালই চলে আসবেন খবর পাওয়া মাত্র। বাবুরা নিশ্চয়ই বন্দোবস্ত করবেন। আপনার কাছ থেকে টাকা নিয়েছি শুনলে ওঁরা রাগ করবেন।

কালিয়ার মৃত্যুর জন্যে সেদিনের মতো ডেরার সব কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যে সব কাবাড়িরা ছিল তারা রান্নাবান্না করে খেয়ে এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসেছিল। কেউ কেউ বা নালার উপরে পরিষ্কার সাদা বালিতে অথবা পাথরে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কেউ টাঙ্গিতে ধার দিচ্ছিল। কেউ সাজিমাটিতে কাপড় কাচছিল নালায় নেমে।

আমি একটা বই নিয়ে ডেরার থেকে একটু দূরেই একফালি ফাকা ঘাসবনে শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলাম উপুড় হয়ে। কালিয়ার ব্যাপারটা মন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থেকে যাচ্ছিল না কিছুতেই। বারে বারেই ফিরে আসছিল।

বিকেল সাড়ে তিনটে-চারটে বাজে প্রায়। মনটা একটু চা-চা করছে। নকুল আজ নেই। এখনই উঠতে হয়। নিজেরই গিয়ে চা বানাতে হবে। নইলে চা নেই কপালে।

উঠব-উঠব ভাবছি।

গাছের ছায়াগুলো দীর্ঘতর হয়ে এসেছে ঘাসের গালচের ওপর। ময়ূর ডাকছে কেঁয়া-কেঁয়া করে জঙ্গলের গভীর থেকে। একটা কোটরা হরিণ বাঘমুণ্ডার দিক থেকে অনেকবার পরপর ডাকল। কালকের বাঘ ও বাঘিনীর মধ্যে কারো দেখা পেয়ে থাকবে বোধহয় ও।

ঘাসের ফালিটুকু ছেড়ে আমি উঠেছি, এমন সময় ডেরার দিক থেকে হঠাৎ একটা শোরগোল শোনা গেল। তারই মধ্যে একটি রমণীকণ্ঠের আওয়াজ।

আমি গিয়ে পৌঁছতেই যা শুনলাম, তাতে প্রায় বাক্‌রোধ হয়ে গেল।

বাঘমুণ্ডা গ্রামের দুটি মেয়ে সুঁড়ি পথ দিয়ে পুরুনাকোটে আসছিল। দু-জনের মধ্যে একজন আসন্নপ্রসবা। অন্যজন তার বর্ষীয়সী ননদ। পুরুনাকোটে একটা ফ্রি-ডিস্‌পেনসারি ছিল। সঙ্গে বোধহয় দু-বিছানার হাসপাতাল। গর্ভবতী মেয়েটির কি সব অসুবিধা থাকাতে ননদ আর বৌদি মিলে এখানে আসছিল পাঁচমাইল হেঁটে জঙ্গলের পথে। ডাক্তারখানায় দেখিয়ে তারপর এখানেই বৌদির দাদার বাড়িতে রাত কাটাবে ওরা। তারপর পরদিন সকালে আবার হেঁটে ফিরে যাবে। এই সঙ্গে পুরুনাকোটে সীতাহরণ পালা দেখবার লোভটাও ছিল।

মেয়েদের কথা কিছুই বলা যায় না। হয়তো অসুখটা একটা ছুতো, যাত্রা দেখাটাই আসল। আর সেই তরুণদের যাত্রার দলটি যে আরো কতদিন ধরে সীতাকে চুরি করবে তা আমার বোধগম্য হচ্ছিল না। রোজ রাতেই সীতা একবার করে চুরি যাচ্ছিল। তবে দণ্ডক বনের মতোই এ বনের পরিবেশ। সীতাহরণ এখানে যেমন জমে, তেমন শহরে জমে না।

বৌদি আর ননদ যখন নালার পিছনের পাকদণ্ডী পথ দিয়ে পুরুনা-কোটের দিকে যাচ্ছিল, তখন হঠাৎ বৌদির শরীর খারাপ হয়। ছাব্বিশ বছরের বৌদি নালার পাড়ে সেগুনের প্ল্যান্টেশানের মধ্যে জীবনে অষ্টমবার মা হয়, অবলীলায় একটি সুস্থ কিন্তু অপুষ্ট ছেলের জন্ম দিয়ে।

এ পর্যন্ত ঘটনাটা মসৃণভাবেই ঘটেছিল। বৌদি এবং ননদিনী দু-জনের কেউই বিন্দুমাত্র ঘাবড়ায়নি। দু-জনেই নিজেদের কর্তব্য যথাসময়ে এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করছিল। কিন্তু নাড়ীটা কাটার মতো কিছুই ছিল না ওদের সঙ্গে। জঙ্গলের মধ্যে থেকে ডেরার চারপাশে ছড়িয়ে-থাকা কাবাড়িদের কথাবার্তা শুনতে পেয়ে ননদিনী ওদের সাহায্য চায়। সাহায্য চাইতে আসতেই ওরা একসঙ্গে যখন কথা বলে ওঠে সকলে মিলে, তখনই আমি শুনতে পাই ওদের গলা দূর থেকে।

www.BanglaBook.org

আমি যখন গিয়ে পৌঁছলাম, তখন সার্জন পাইকারা সাজারী সমাধা করে ফিরে আসছে। তার চোখেমুখে বিস্ময় বা বীরত্বব্যঞ্জক কোনোরকম চিহ্নই নাই। এমন ভাব, যেন ও আকছার এরকম ভলান্টিয়ারিং করেই থাকে।

ও টাঙ্গি হাতে ফিরে আসতেই একজন কাবারী শুধালো, কী করে নাড়ী মটলি ?

পাইকারা বলল, ঐ মেয়েটা দু-হাত দিয়ে ধরল, আমি কেটে দিলাম ঘ্যাচ্ করে।

তারপরই বলল, ওকে একটু ফ্যান দিয়ে আসতে হবে। মেয়েটা বলছিল, খালাস যখন হলামই, তখন ভালো করে যাত্রাটা দেখব আজ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ফুটন্ত হাঁড়ি থেকে ঘটি করে এক ঘটি ফ্যান ঢেলে নিয়ে পাইকারা আবার নালা পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পাইকারা ফিরে আসার মিনিট পনেরো পরেই দেখলাম, ট্যাঁ ট্যাঁ করে টিয়াপাখির মতো কাঁদতে থাকা নবজাত শিশুটিকে কোলে নিয়ে একটি লাল শাড়ি পড়া মেয়ে এবং তার পিছনে গেরুয়া শাড়ি পরা আরেকজন ডেরা থেকে পঁচিশ-তিরিশ হাত সামনে দিয়ে নালার জল ও পাথর টপ্‌কাতে টপ্‌কাতে পাকদণ্ডী দিয়ে পুরুনাকোটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

পাইকারাকে কে যেন বলল, ভালোই হল শালা, তোর বৌ যখন বিয়োবে তখন আর দাই ডাকতে হবে না তোর। তুই তো সব শিখেই গেলি।

পাইকারা হাসল। তারপর বলল, তোর বৌ যখন বিয়োবে তখনও ডাকিস, তোর খরচাও বাঁচিয়ে দেব।

ওরা এমন করে ছেলেমেয়ে হওয়ার কথা বলছিল, যেন গরু মোষেরই বাচ্চার কথা বলছে। হটবাবু রাত ন'টা নাগাদ ফিরে এলেন। তাঁরা ফিরে আসার আরো তিন-চার ঘণ্টা পর প্রায় রাত এক নাগাদ রঘুবাবু এলেন, কটক থেকে জিপ নিয়ে। ঠিকাদারবাবুদের সিনিয়র পার্টনার।

খবর পাওয়ামাত্র উনি বেরিয়ে পড়েছিলেন।

রঘুবাবুর আসার খবর পেয়ে সব কাবাড়িরা ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে এল।

টিউলি খিচুড়ির হাঁড়ি চাপাল বাইরের আগুনে।

রঘুবাবু এসে বসলেন। ওঁকে খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। উনি অনেক কথা বলছিলেন—কিছু কিছু স্বগতোক্তির মতো।

রঘুবাবুর বিশেষ প্রিয় ছিল কালিয়া।

রঘুবাবু বললেন যে, কালিয়ার পরিবারকে এক হাজার টাকা দেওয়া হবে। ঐ টাকার অঙ্ক শুনে বেশিরভাগ কাবাড়ির মুখই আগুনের আলোয় এমন দেখাল যে, মনে হল ওদের আপশোস হচ্ছে কালিয়ার বদলে ওরা কেন গাছের নীচে পড়ল না।

ওদের জীবন আড়ম্বরহীন। চাহিদা সামান্য। প্রাপ্তিও সামান্যই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওদের কাছে একসঙ্গে হাজার টাকা হাতে পাওয়া, না চাঁদ হাতে পাওয়া !

রঘুবাবু বলছিলেন কালিয়া বহুদিনের লোক। কালিয়ার বিয়েতে তিনি বরযাত্রী গিয়েছিলেন। এখনও স্পষ্ট মনে আছে, সেই বিয়েতে হরিণের মাংস আর পানমৌরী খাওয়ার কথা। রঘুবাবু বললেন, কাল ভোরেই উনি পম্পাশর যাবেন।

শুধোলাম, টাকাটা কি কালিয়ার বৌকে দেবেন ?

রঘুবাবু বললেন, বৌকে টাকা দিলে কালিয়ার ভাইয়েরা দেখতে দেখতে নেশা করেই এ টাকা উড়িয়ে দেবে। তা না করে ভাবছি কালিয়ার বৌ ও ছেলের নামে নিজে দেখেশুনে কিছুটা জমি কিনে দেব। ভালো ধানের জমি। যাতে ওদের কোনো অসুবিধা না হয়।

তারপর বললেন, আসল ব্যাপারটা কি জানেন ? এই কাবাড়িরা টাকা জমালে হয়তো সকলেই কিছু টাকা জমাতে পারত। এরা, যাদের ভাগ-চাষ ছাড়া অন্য কোনো কাজ নেই—তাদের চেয়ে অনেক ওয়েল-অফ্‌। কিন্তু এত ছেলেপেলে হয় এদের এবং এত নেশা করে যে, সুদূর ভবিষ্যতেও আমি কোনো আশা দেখি না। একবার, এরা যখন বাড়ি যায়, নিজে হাতে কনট্রাসেপ্‌টিভের প্যাকেট কিনে কিনে প্রত্যেক বিবাহিত লোককে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, দু-তিনটির বেশি ছেলেপুলে হলে মাইনে কেটে দেব। নানারকম ভয় দেখিয়েছিলাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। এদের জনে জনে জিজ্ঞেস করুন, পঁচিশ বছরের ছেলের পাঁচটা করে ছেলেমেয়ে কম করে। কি করে এদের অবস্থা ভালো হবে বলতে পারেন ?

তারপর একটু থেমে মাথাভর্তি সাদা চুলে হাত বুলিয়ে বললেন, আমি ছেলেবেলা থেকেই এদের মধ্যে বড় হলাম, এদের মধ্যেই বাস করি। যখন বয়স অল্প ছিল তখন অনেক কিছু ভাবতাম, বুঝলেন। এটা হবে, সেটা হবে, এই লোকগুলোর ভালো হবে। কিন্তু কিস্‌-সু হল না মশায়। মোটা মোটা নেতাগুলো ফুলে কলাগাছ হল—ঘুষ-ঘাষ আর চুরি-জোচ্চুরিতে দেশটা ছেয়ে গেল। অল্প কয়েকজন লোক মিলে জনগণের নামে দেশটার সর্বনাশ করে ফেলল।

রঘুবাবুর খাওয়া-দাওয়া হতে হতে প্রায় দুটো বাজল। তারপরও ক্যাম্পের মধ্যে লন্ঠন ঝুলিয়ে উনি অনেকক্ষণ হিসাব-টিসাব দেখলেন কাঠের কাবাড়িদের। তারপর যখন লন্ঠনের ফিতেটা কমিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লেন তখন রাত প্রায় আড়াইটা।

এই পলিতকেশ তীক্ষ্ণনাশা বৃদ্ধকে মনে মনে আমি খুব সমীহ করি। যে-সব লোক নিজেরা নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের চেহারা দেখলেই বোঝা যায়।

উনি প্রথম যৌবনে যখন এখানে কাজ করতে আসতেন, তখন আসতেন গোরুর গাড়িতে। বেলা চারটের পর আর লোক খুঁজে পাওয়ার উপায় ছিল না। হাতী, বাইসন, বাঘ, বুনো মোষ ইত্যাদি ইত্যাদি এত ছিল এসব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জঙ্গলে তখন। বেলা চারটের সময়েই গোরুর গাড়ি থামিয়ে, বড় আগুন করে, শট্‌গানে গুলি ভরে রাখতে হত। রান্নবান্না হত, খাওয়া হত, তারপর রাতে ছইয়ের মধ্যে শুয়ে থাকতে হত, কত বিচিত্র অভিজ্ঞতার জন্য তৈরি হয়ে। কতবার বাঘ তার গাড়ির বলদ কিংবা মোষ নিয়ে গেছে, তার ইয়ত্তা নেই। হাতীরা একবার গোরুর গাড়ি নিয়ে ফুটবল খেলেছিল। উনি আগেই পালিয়ে গিয়েছিলেন। ওঁর টিনের তোরঙ্গটা একটা টেনিস বলের মতো হয়ে গিয়েছিল দুমড়ে মুচড়ে। সেই তোরঙ্গটা এখনও রেখে দিয়েছেন উনি। সকলকে দেখান।

একসময় তাঁবুর মধ্যে রঘুবাবুর নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। কখন আমি ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই।

রাত তখন কত হবে কে জানে!

হঠাৎ অনেকগুলো কুকুরের ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল। কুকুরগুলো একই সঙ্গে ডাকছে। মনে হল নালার দিক থেকেই ডাকছে। জলের মধ্যে লাফাচ্ছে, ঝাঁপাচ্ছে।

আমি উঠেই দেখলাম, রঘুবাবু আমার আগেই উঠেছেন।

কাবাড়িরাও সকলে আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে। সকলেই নালার দিকে চেয়ে আছে।

চাঁদটা তখন বেশ উপরে উঠেছে, কিন্তু নালার মধ্যে দু-পাশের বড় বড় গাছের ছায়া পড়েছে বলে কিছুই দেখা যায় না।

থ্রি-সিক্স্‌টি-সিক্স্‌ ম্যাগাজিন রাইফেলটা আর একটা পাঁচ ব্যাটারির বল্ডের টর্চ হাতে করে পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা অবস্থাতেই বাইরে এলাম আমি।

রঘুবাবু হাত দুটো পিছনে রেখে একটা পাথরের উপর দাঁড়িয়ে ঐদিকে তাকিয়ে আছেন।

আমি গিয়ে পৌঁছতেই বললেন, বুনো কুকুররা একটা সম্বরকে তাড়িয়ে নিয়ে এসে জলে ফেলেছে। গোটা কয়েককে মেরে দিন। এই কুকুরগুলোর জন্যে জংলী জানোয়ারদের আর বাঁচার উপায় নেই। এমনিতেই তো স্পট লাইটের শিকারিরা সম্বর প্রায় সব শেষ করে এনেছে।

টর্চের আলো ফেলা সত্ত্বেও কুকুরগুলোর কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। আলোতে পরিষ্কার দেখা গেল একটা মাঝারি সাইজের মাদী সম্বর জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। ও ভেবেছিল জলে গিয়ে পড়লে বুঝি কুকুরদের হাত থেকে বাঁচবে ও। কিন্তু লালচে বুনো কুকুরগুলো দূর থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে ওর কাঁধে পিঠে উঠে এক এক কামড়ে এক খাবলা মাংস তুলে নিচ্ছে।

টিউলিকে আলোটা ধরতে বলে, রাইফেল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পর পর আমি চারটে কুকুরকে মারলাম। দুটো তো শুনোই মরল। লাফিয়ে সম্বরটার ঘাড়ে পড়তে যাচ্ছিল, তখন গুলি করেছিলাম। সে দুটো কুকুর ঝপাং করে জলের মধ্যেই পড়ল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চারটে কুকুর পড়ে যেতেই এবং রাইফেলের আওয়াজে বন-পাহাড় গম্‌গম্‌ করে উঠতেই অন্যান্য কুকুরগুলো যেন ভোজবাজীর মতো অদৃশ্য হয়ে গেল।

সম্বরটা ঘ্যাক্‌ ঘ্যাক্‌ ঘ্যাক্‌ করে ডাকছিল। তার চোঙা ধাতব ডাক জল পেরিয়ে ওপাশের গাছে-গাছে ধাক্কা খেয়ে আবার এ পারে ফিরে আসছিল।

রঘুবাবু বললেন, সম্বরটাকে বাঁচান বোস সাহেব। মাদী সম্বর।

বাঁচান বললেই বাঁচানো যায় না। সম্বরের পায়ের চাঁটে চিতাবাঘের মাথার খুলি ফেটে যেতে দেখেছি আমি স্বচক্ষে। জ্যান্ত সম্বরকে ধরা বা তাকে ধরে আনার মতো ক্ষমতা কাবাড়িদের ছিল না। রঘুবাবু এ সম্বন্ধে আমার চেয়ে বেশি ওয়াকিবহাল ছিলেন। তবু মন নরম বলেই—উনি তখন সম্বরটার দুরবস্থা দেখে অমন একটা ইম্‌প্রাকটিকেবল্‌ অনুরোধ করেছিলেন। সম্বরটাকে বাঁচাতে আমিও কম চাইনি।

নিরুপায় হয়ে নদীতে নেমে গেলাম। আমার পিছনে টর্চ ধরে টিউলি এবং সঙ্গে দুর্গা।

কুকুরগুলো পালিয়ে যাবার পরও সম্বরটা কেন যে উঠে পালাচ্ছিল না আমি তাই-ই ভাবছিলাম। সম্বরটা তেমনিই জলের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল। এখন কোনো আওয়াজও করছিল না। একেবারে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল।

নদীতে নামতেই মনে হল, গোড়ালি ও পায়ের পাতা বুঝি কেউ কেটে নিল। শেষ রাতে নদীর ঠান্ডা জল থেকে ফ্রিজ খুললে যেমন ঠান্ডা ধোঁয়া বেরোয়, তেমন ধোঁয়া বেরোচ্ছিল।

ওদিকে এগিয়ে যেতে যেতেই দুর্গা আমার কানে কানে বলল, খাজুবাবু, তুমি বাবুর কথা শুনো না। সম্বরটাকে মেরে দাও। বহুদিন কাবাড়িরা এবং আমরাও পেটভরে মাংস খাই না। তুমি তো আজকাল শিকার করা ছেড়েই দিয়েছ। ও বাবু যা বলে বলুক, তুমি মেরে দাও। আমরা মজা করে খাই।

আমি জবাব না দিয়ে সম্বরটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম।

যতই এগোচ্ছিলাম, ততোই আমার মনে একটা সন্দেহ দানা বাঁধছিল!

আর একটু এগোতেই, টিউলির হাতের আলোটা ভালো করে পড়তেই দেখলাম, সম্বরটার চোখ দুটো খুবলে খেয়ে নিয়েছে কুকুরগুলো। আগে যেখানে চোখ ছিল, এখন সেখানে দুটি গোলাকার রক্তাক্ত গর্ত। ঘন রক্ত গড়িয়ে পড়ছে চোখের কোটর থেকে। সম্বরটার পিছের ও পেছনের অনেক জায়গায় খাবলা মাংস তুলে নেওয়া হয়েছে। ও আসলে অন্ধ হয়ে গেছে। অজানিতে পথ না দেখতে পেয়ে নদীতে এসে পড়েছে। তারপর বেশি জলে এসে পড়ে হয়তো আর উঠতে পারছে না এ অবস্থায়।

দুর্গা অনবরত আমার কাছে ফিস্‌ফিস করে বলে চলেছে, মেরে দিন। খাজুবাবু, মেরে দিন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না মেরে উপায় ছিল না। রঘুবাবু যাই-বলুন না কেন—। এ সম্বরকে বন্দী করা গেলেও একে বাঁচানো যাবে না।

গোড়ালি সমান জলে দাঁড়িয়ে, ভালো করে ওর গলায় নিশানা নিয়ে যাতে ওর কষ্ট তাড়াতাড়ি লাঘব হয়, এমনিভাবে একটা গুলি করলাম। সফ্‌ট-নোজ্‌ড্‌ বুলেট ছিল, কাটা কলাগাছের মতো সম্বরটা ঝপাং করে জল ছিটকে জলে পড়ল।

সম্বরটা পড়ে যেতেই কাবাড়িরা জ্বলন্ত কাঠ হাতে নিয়ে দৌড়ে এল এক সঙ্গে।

আমি উপরে উঠে এলাম।

রঘুবাবু তেমনিই হাত দুটো পিছনে রেখে দাঁড়িয়েছিলেন। মুখে কথা বলছিলেন না।

আমি ওঁকে বুঝিয়ে বললাম যে, কেন আমায় মারতেই হল সম্বরটাকে।

রঘুবাবু তবু বললেন, না মারলেই পারতেন।

রঘুবাবুর স্বর রীতিমতন কঠিন শোনাল। উনি আমার সঙ্গে এমন বিরক্ত হয়ে কখনও কথা বলেননি আগে।

কোনো দোষ খুঁজে পেলাম না আমার। অনেক চেষ্টা করেও। ওছাড়া আর কিছুই করার ছিল না।

রঘুবাবু তাঁবুর ভিতরে ঢুকে গেলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে কাবাড়িরা ধরাধরি করে সম্বরটাকে এনে আগুনের পাশে রাখল। যাতে কুকুরগুলো আবার ফিরে না আসে। কুকুরগুলো ফিরে এলেও আগুনের সামনে থেকে সম্বরটাকে ছোঁয়ার সাহস যে ওদের হবে না ওরা জানতো।

আমি তাঁবুর মধ্যে ঢুকে গেলাম। প্রায় আধঘণ্টা লাগল পা আবার গরম হতে।

তাঁবুর মধ্যে শুয়ে পরিষ্কার যেন দেখতে পাচ্ছিলাম, কুকুরগুলো নালার ওপাশের জঙ্গলের আড়াল থেকে আগুনের সামনে রাখা সম্বরটাকে দেখছে। ওরা শুয়ে-বসে ওদের জিভ চাটছে। কত মাইল যে সম্বরটাকে ওরা তাড়া করে নিয়ে এসেছিল তা ওরাই জানে। ওদের মুখের গ্রাস থেকে ওদের বঞ্চিত করে মানুষেরা যে কেন সম্বরটাকে তাদের খাদ্যে রূপান্তরিত করল ওদের সহজ পশুর বুদ্ধিতে ওরা তা বুঝতে পারছিল না।

ওদের খিদে পেয়েছিল। ঘামে ওদের সারা গা ভিজে গিয়েছিল। আগুনের আভায় ওদের চোখ জ্বলছিল, ওরা জিভ বের করে হ্যাঃ হ্যাঃ করে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল আর অভিশাপ দিচ্ছিল আমাদের।

সম্বরটা তাঁবুর কাছে এসে পড়েই যত গণ্ডগোল বাঁধল। নইলে আমাদেরও কিছু বলার ছিল না। জঙ্গলে স্বাভাবিক নিয়মে খাদ্য ও খাদক একই সঙ্গে থাকে। একজন অন্যজনকে খায়, অন্যজন আরেকজনকে। এমনি করেই প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় থাকে। মাঝ থেকে মানুষ এসে পড়েই এই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্বাভাবিক সাম্য নষ্ট করে।

তবে বুনো কুকুরের দলের মুখে মৃত্যু বড় যন্ত্রণার মৃত্যু। তিল তিল করে মৃত্যু। ভয়ার্ত, অন্ধ, আহত ও দিশেহারা সম্বরটার যন্ত্রণা থেকে যে ওকে একেবারে মুক্তি দেওয়া গেছে, এইটে ভেবেই মনটা একটু ভালো লাগছিল।

জিভ বের-করা বুনো কুকুরগুলোকে মনের চোখের সামনে ঠায় দাঁড় করিয়ে রেখেই এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে তাঁবুর বাইরে এসে দেখি, রঘুবাবু যে শুধু উঠেছেন, তাই নয়, মুখ ধুয়েছেন, প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে নিয়েছেন, দাড়িও কামিয়েছেন, চান করেছেন, পুজো করেছেন এবং পম্পাশর-এ যাওয়ার জন্যে তৈরিও হয়ে আছেন ইতিমধ্যেই জামা কাপড় পরে।

আমাকে দেখে উনি বললেন, জিপটা একটু নিয়ে যাব আমি, আমার জিপটা একটু গণ্ডগোল করছে, মেহেরচাঁদকে বলেছি দেখে-টেখে ঠিকঠাক করে রাখবে। আমি বিকেলের মধ্যেই ফিরে আসব।

বললাম, জিপ তো আপনারই, আমি তো চড়ছি শুধু।

উনি বললেন, এখন তো আপনারই। যতদিন আপনি থাকবেন,ততোদিন এটা আপনারই।

তারপর বৃদ্ধ রঘুবাবু একটু হাসলেন। তাঁর সুগৌর শীর্ণ মুখে এক স্বর্গীয় হাসি ফুটে উঠল। বললেন, ব্যাপারটা কি জানেন? আমাদের মতো অনেক লোক সারাজীবন বাঁশ আর কাঠ কেটেই কাটিয়ে দিয়েছে। আমরা বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই নিজেদের স্বার্থে। পয়সা রোজগারের ফিকিরে। আপনি যে এখানে আসেন, তা শুধুই ভালোবাসার তাগিদে। চোখ কান তো ঠাকুর সবাইকে দেন। চোখের ও কানের সদ্ব্যবহার আমরা ক-জন করতে পারি? চোখ ভরে দেখুন, কান ভরে শুনুন, ভালো করে চিনুন জঙ্গলকে, তারপর যদি কখনও পারেন তো লিখুন এই কালিয়াদের কথা, এই সম্বরটার কথা, এখানের জীবন, এখানের সবকিছুর কথা।

তারপর একটু থেমে বললেন, জানেন, বড় সুন্দর আমাদের দেশটা। বড় ভালো আমাদের দেশের সাধারণ লোকগুলো। দুঃখের কথা এই-ই যে, আমাদের নেতারা কোরিয়াতে, এবং পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে কী করে শান্তি আসে তা নিয়েই মাথা ঘামিয়েছেন, দেশের লোকদের কথা ভাবার সময় পাননি তাঁরা। বছরের পর বছর কেটেছে তাঁদের শুধুই ব্যালট-বাক্সের দিকে চোখ রেখে।

অনেক কথা একসঙ্গে বলে ফেলে রঘুবাবু থামলেন।

বললেন, কিছু মনে করবেন না, বুড় হয়েছি তো। একটু বেশি কথা বলে ফেলি—আজকাল বড় ক্রিটিকাল, সিনিকাল হয়ে গেছি। বুড় হলে বোধহয় মানুষ এরকমই হয়ে যায়।

রঘুবাবু তাঁর গরম আলোয়ানটা কাঁধে ফেলে জিপের স্টিয়ারিংয়ে গিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বসলেন। সত্তর বছরের বৃদ্ধ, সতেরো বছরের তরুণের মতো একগাল হেসে হাত তুললেন আমার দিকে, তারপর হটবাবুকে পাশে বসিয়ে নিজে জিপ চালিয়ে চলে গেলেন পম্পাশরে কালিয়ার গ্রামের দিকে।

মেহেরচাঁদ গাছতলায় বসে পেট্রলের বড় ড্রাম থেকে পেট্রল বের করে নিয়ে, জিপের প্লাগ পরিষ্কার করছিল পাট দিয়ে। ছুরি দিয়ে চেঁছে চেঁছে জমা কার্বন তুলছিল।

সেদিনের সেই খাটাস দেখে পালিয়ে আসার পর অবধি সে একটু মিইয়ে আছে।

কাবাড়িদের মধ্যে কে যেন ওকে উৎসাহিত করার জন্য বলল :

'মাচ্ছ খাইব ডাকুর, ঘইতা কইব ড্রাইভর
মাচ্ছ খাইব ইলিশী, ঘইতা কইব পুলিশী।

মেহেরচাঁদ ওড়িয়া বোঝে, বলতেও পারে। ও মানে বুঝে হাসল।

গ্রামের মেয়েদের কাছে ড্রাইভার আর পুলিশ কনস্টেবল-এর মত প্রার্থিত স্বামী আর কিছুই নেই এখানে। একজন ট্রাকের ড্রাইভার এখানে টাটা-বিড়লার মতো বড়লোক বলে গণ্য হয়। তাছাড়াও অতবড় দৈত্যের মতো বুক-ধড়ফরানো আওয়াজ-তোলা একটা যন্ত্রকে যে চালায়, এই বন-পাহাড়ের মেয়েদের কাছে সে তো দেবতা তুল্য। তাই এখানে এই ছড়াটা চলতি আছে। ছড়াটার মানে হল—

মাছ খেলে খাব বোয়াল মাছ,
আর বিয়ে করলে করব ড্রাইভারকে।
মাছ খেলে খাব ইলিশ মাছ,
বিয়ে করলে করব পুলিশকে।

মেহেরচাঁদের শিকারে খুব উৎসাহ। কেবলি বলে, চলিয়ে না সাহাব, জেরা হিরণ পিটাকে আঁয়ে। হিরণ্ অর্থাৎ হরিণ খাওয়ার বড় শখ মেহেরচাঁদের।

সেই কাবাড়ি বলল, তোমার জন্যে বাবু এত বড় একটা সম্বর মেরে রাখল, তাতেও হল না! তোমার হিরণ্ চাই? যাও না, কি রাঁধতে পারো, রাঁধো দেখি।

মেহেরচাঁদ হতাশ গলায় বলল, তোরা আবার খেতে জানিস নাকি? হয় ঝোল বানাবি, নয় নলা-পোড়া। কাবাব-টাবাব কিছুই তো বানাতে পারিস না তোরা। হতো আমার পাঞ্জাব তো দেখতিস এই সম্বর দিয়ে বড়া কাবাব, গুলহার কাবাব, বটি কাবাব, শাম্মী কাবাব কেমন বানাতাম, আর রাত ভর ভাঙরা নাচতাম—বলেই দু-হাত উপরে তুলে পায়ের পাতার উপর দাঁড়িয়ে একপাক ঘুরে গিয়েই সুর করে উঠল, ও ম্বোলে, ম্বোলে, ম্বোলে, ম্বোলে…

সম্বরটাকে ওরা নদীর মধ্যে নিয়ে গেছে—ভাঁটিতে—যাতে আমাদের ডেরার সামনের জল নোংরা না হয়। বালিতে ফেলে সেটাকে কাটাকুটি হচ্ছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গ্রামে যত লোক ছিল, সকলেই রাতের গুলির আওয়াজ শুনে আকাশ ফর্সা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এসে নদীর দু'ধারে শালপাতার দোনা নিয়ে বসে গেছে লাইন দিয়ে। বেশিরভাগই মেয়েরা।

এদিকে সম্বরটার চামড়া ছাড়িয়ে ফেলা হয়েছে। তার কাল্‌চে-লাল চামড়া ছাড়ানো নগ্ন শরীরটা পড়ে আছে ধবধবে সাদা বালির ওপর। ওদিকে ত কালে গা ঘিন্‌ঘিন করে।

দুর্গা লুঙি মুড়ে হাঁটু গেড়ে বসে সম্বরটার পেট ফাঁসিয়েছে ছুরি দিয়ে। তারপর বাহুমূল পর্যন্ত ঢুকিয়ে দিয়ে পেটের নাড়িভুঁড়ি, পিলেপট্‌কা সব টেনে টেনে বের করছে। গল্‌গল করে রক্ত বেরোচ্ছে—ঘন কালো রক্ত। পেটের মধ্যে নানারকম বায়বীয় ও তরলিমা শব্দ হচ্ছে। পেটটা চিরে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে একটা দুর্গন্ধে আকাশ বাতাস ভরে গেল।

এক ঝাঁক শকুন আর পাহাড়ী বাজ ঠিক সময় খবর পেয়ে এসে গেছে। এসে নালার ওপরের গাছগুলোর ডালে ডালে বিরক্ত দর্শকের মতো বসে আছে। দু-একটা সাহসী শকুন দু-এক পা করে এগিয়েও আসছে, তাদের লম্বা লম্বা বিদ্‌ঘুটে বিরল-লোম গলা নেড়ে নেড়ে। সঙ্গে সঙ্গে দুর্গা ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা অশ্লীল গালাগালি করে উঠছে। হুস্‌স্‌ হুস্‌স্‌ করে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে শকুনগুলোকে।

সমস্ত জায়গাটার বালি রক্তে, নাড়িভুঁড়িতে লাল হয়ে গেছে।

তাঁবুর সামনের বড় পাথরে পা ঝুলিয়ে বসে ওদিকে চেয়েছিলাম। আনমনোচোখে। উদ্দেশ্যহীনভাবে।

হঠাৎ দেখলাম, দুর্গা হাত দিয়ে টেনে সম্বরটার পেটের ভিতর থেকে দুটি বেড়ালের সাইজের অপরিণত মৃত বাচ্চা বের করল এক-এক ঝট্‌কায়। পিছল পিছল দুটো লাল রক্তমাখা বাচ্চা।

বের করতেই, মেয়েদের ভিড় থেকে একজন বুড়ি, "মত্বে দিয়ন্তু, মত্বে দিয়ন্তু" করতে করতে দৌড়ে এসে একটা বাচ্চাকে ছিনিয়ে নিল দুর্গার কাছ থেকে।

ওরা সকলে বুড়িটাকে তেড়ে গেল। বুড়িটাকে ওরা সকলে বাইয়ানী, বাইয়ানী বলে ডাকছিল।

বাইয়ানী মানে পাগলি।

বুড়িটা বাচ্চাটাকে বুকে করে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল নদীর মধ্যে তটভূমি ধরে।

দুর্গার এক অনুচর গিয়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে বালির মধ্যে ফেলে দিয়ে বাচ্চাটাকে নিয়ে এসে সম্বরটার পাশে রাখল।

বুড়ি কাঁদতে কাঁদতে উঠে এল বালি থেকে।

তার শনের মতো চুল, কুঞ্চিত কপাল, ছিন্নভিন্ন রঙ-ওঠা শাড়ি, এবং তার ঝুলে-পড়া কুঞ্চিত বুক সম্বরের গর্ভের রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল।

বাইয়ানী কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এসে আবার মেয়েদের মধ্যে বসল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অন্যরা সকলে ওকে গালাগালি করতে লাগল।

ওদের প্রত্যেকের চোখমুখ দেখেই মনে হচ্ছিল যে মাংসের মতো স্বাদু ও সার কোনো খাদ্যই ওদের কপালে জোটেনি বহুদিন। মাংসাশী জানোয়ারের মতো মাংসলোলুপ হয়েছিল ওরা।

অথচ এখন কেউই ভাগ পাবে না। সম্বরটা পুরো কাটাকুটি শেষ হবে, তারপর দুর্গারা নিজেদের জন্যে সিংহভাগ রাখবে। তারপর সমান ভাগে ভাগ হবে বাদবাকী মাংস অসংখ্য ভাগে। এক এক করে মেয়েরা শালপাতার দোনা নিয়ে এগিয়ে আসবে, আর দুর্গারা এক এক ভাগ তুলে দেবে ওদের প্রত্যেকের হাতে।

ওরা সেই মাংস নিয়ে বাড়ি যাবে। তারপর কোর্মা নয়, কাবাব নয়, স্রেফ জলের মধ্যে সেদ্ধ করে অথবা আগুনে ঝলসে নুন দিয়ে কামড়ে কামড়ে সেই আন্ডারডান্ মাংস খাবে। তখন ওদের চোখমুখ দেখলে মনেই হবে না, ওরা বিংশ শতাব্দীর মানুষ। মনে হবে, ওরা সব প্রাগৈতিহাসিক গুহামানবী।

ওদের প্রায় সমস্ত জানোয়ারের মাংসই খেতে দেখা যায়। এমন কি বাইসনের মত শক্ত পেশীর জানোয়ারের মাংসও ওরা কাড়াকাড়ি করে খায়। বাইসনকে ওরা বলে গব্ব। কোথাও গব্ব শিকার হলে শ'য়ে শ'য়ে মেয়ে-পুরুষ এসে জোটে পাঁচ-দশ মাইল দূর দূর থেকে হেঁটে।

ওরা বাঘের মাংসও খেতে ছাড়ে না। খায় বলা ঠিক নয়, চোষে বলা ভালো। কারণ একমাত্র পেট ছাড়া বাঘের শরীরে মাংস বলতে বা চর্বি বলতে আমরা যা বুঝি তা বিশেষ কোথাওই থাকে না। যা থাকে, তা কালচে লাল দড়ির মত পাকানো পাকানো পেশী। সেই পেশী সহজে সেদ্ধও হয় না, কেউ খেতেও পারে না তা। নাগারা এবং অনেক আদিবাসীরা খায়। সেদ্ধ করতে চাইলে রাবারের মতো হয়ে যায়; ওরা তবু ছাড়ে না। ওদের দাঁত লাফিয়ে ওঠে। তবু ওরা কামড়াতে থাকে।

মাংস কাটা হয়ে যাবে, ভাগ হয়ে যাবে, কিছুই পড়ে থাকবে না—এমন কি নাড়িভুঁড়ি, হাতপায়ের ক্ষুর সবই ছিনিয়ে নেবে ওরা। চামড়াটা ডেরার কাছে নুন লাগিয়ে শুকুতে দেওয়া হবে কোনো পাথরের উপর। লোকজন চলে গেলে, শকুনিগুলো এক পা এক পা করে এগিয়ে এসে যেখানে সম্বর কে কাটা হয়েছিল সেখানে এসে দাঁড়াবে। তারপর ওদের লম্বা লম্বা গলা তুলে মানুষ নামক বুভুক্ষু, সর্বগ্রাসী জন্তুগুলোকে অভিসম্পাত দেবে। তারপর একে একে আবার উড়ে যাবে। আবার ছোট ছোট কালো বিন্দুর মতো ঘুরে ঘুরে উড়বে নীল আকাশে অন্য কোনো পূতিগন্ধময় মৃতদেহের জন্যে। রাত হয়ে গেলে রক্তের গন্ধ পেয়ে হায়না আসবে। জায়গাটাকে শুঁকে চলে যাবে। মাঝরাতে তার হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ বুক কাঁপানো হাসিতে ডেরার সকলের ঘুম চটে যাবে।

বেশ বেলা হয়ে গেছে। এখনও নদীর মধ্যে ক্ষুধাতুর মাংসলোলুপ

www.BanglaBook.org

মেয়েগুলোর কামড়াকামড়ির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে একপাল মাদী-শিয়াল মিলন-মাসে শোর তুলেছে। ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগে না। মন খারাপ লাগে। কিরকম অপরাধবোধ জাগে।

চান করতে যাব ভাবছি বোস্টম নালায়, এমন সময় একজন ফরেস্ট গার্ড সাইকেল চড়ে এল। বলল, ডি. এফ. ও. সাহেব এসেছেন। আপনাকে খবর দিতে বললেন। উনি বাংলোতে আছেন।

আমি বললাম, তোমার সাইকেলের ক্যারিয়ারে বসি ?

ও বিশ্বাস করল না। ভাবল ঠাট্টা করছি। বলল, আপনি তো জিপে আসবেন।

বললাম, আজ জিপ নেই। তারপর ওর ক্যারিয়ারে বসে ফরেস্ট বাংলোয় এলাম।

দেখলাম বারান্দায় খুব ভিড়। ডি. এফ. ও. সাহেব এসেছেন – তাই এ অঞ্চলের নানা জায়গার রেঞ্জাররা এসে জুটেছেন।

এই ডি. এফ. ও সাহেব খুব উৎসাহী লোক ছিলেন। জঙ্গলকে সত্যি সত্যি ভালোবাসতেন উনি।

বাংলোয় পৌঁছতেই বললেন, খজুবাবু, আপনি এদের সঙ্গে গেলে ভালো হয়।

শুধোলাম, ব্যাপার কি ?

উনি বললেন, আগে চা খান, তারপর বলছি।

চা খাওয়া হলে, উনি বললেন, এক সার্কাস কোম্পানি একটি বাচ্চা হাতী ধরার পারমিশান্ নিয়ে এসেছেন। ওঁরা বলছেন, খেদা না করে, পোষা হাতীর কোনোরকম সাহায্য না নিয়েই ওঁরা হাতী ধরবেন। আমি বলে দিয়েছি, রাইফেল-টাইফেল নিয়ে যাওয়া চলবে না। শেষে বাচ্চা হাতী ধরতে এসে আমার জঙ্গলের হাতীদের আহত করে কি মেরে চলে যাবেন এঁরা, সেটি হচ্ছে না।

সার্কাসের দলের লোক সবিনয়ে বললেন, না আজ্ঞে, তা কখনও করি ?

ডি. এফ. ও. সাহেব আমাকে বললেন, আপনি যদি আমার রিপ্রেজেনটেটিভ হয়ে ওদের সঙ্গে যান, তাহলে খুব ভালো হয়, আমার আজই বোধে যেতে হবে কাজে। অবশ্য আপনার সঙ্গে রেঞ্জার সাহেব, ফরেস্ট গার্ড এঁরা সবাই-ই থাকবেন।

আমি রাজী হলাম। কিন্তু বললাম, কোনো আয়োজন না করে, খেদা না করে, কি করে দলের মধ্যে থেকে হাতীর বাচ্চা ধরা যাবে তা তো আমি বুঝতে পারছি না।

সার্কাস কোম্পানির প্রতিনিধি বললেন, সে আপনি দেখতেই পাবেন। আমি ধরলেই তো হল। দেখবেন, যখন ধরে ট্রাকে তুলে নিয়ে যাব কটক, তখন নিজের চোখেই তো দেখতে পাবেন।

ভদ্রলোক এত নিশ্চিন্তভাবে যখন কথাটা বললেন, বুঝলাম যে নিশ্চয়ই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কোনো গুপ্তবিদ্যা জানা আছে।

ডি. এফ. ও সাহেব আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, মশাই আমারও কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে। মনটা ভালো লাগছে না। তাই-ই তো আপনাকে খবর দিলাম। আপনার কাছে পরে এই গুপ্তবিদ্যাটা জানা যাবে—আগে আপনি তো জানুন।

এই বলে ডি. এফ. ও সাহেব জিপ নিয়ে চলে গেলেন বোধে।

আমি শুধোলাম, আপনারা কি এক্ষুণি বেরোবেন?

সার্কাস কোম্পানীর লোক প্রায় আমাকে ধমকে বললেন, তবে না তো কি?

বললাম, চান-খাওয়া যে হয়নি এখনও। কতক্ষণে ফিরতে পারবেন?

ভদ্রলোক বিদ্রূপের গলায় বললেন, সে তো আমাদেরও কারোই হয়নি। যাব আর আসব—এই আর কি। কতক্ষণেরই বা ব্যাপার।

রেঞ্জারবাবু, ফরেস্টারবাবু, দুজন ফরেস্ট গার্ড সবাই-ই চললেন সঙ্গে। তার ওপর ওদের প্রায় জনা কুড়ি লোক ট্রাকের মাথায় দড়ি-টড়ি বাঁশ-টাঁশ সমেত।

বেরোবার আগে ফরেস্টারবাবু আর রেঞ্জারবাবুর মধ্যে কি সব ফিস্‌ফিস করে কথা হল। পরমুহূর্তেই একজন ফরেস্ট গার্ড চলে গেল তার বাড়িতে। তারপর ফিরে এল তার গাদা বন্দুকটা নিয়ে।

রেঞ্জার বললেন, যাই বলুন ঋজুবাবু, এদের ভাবগতিক ভালো লাগছে না। একেবারে খালি হাতে গিয়ে কি প্রাণে মরব? আমার আবার পায়ে আর্থারাইটিস্। গাছে চড়তে পারি না। দৌড়তেও কষ্ট হয়। বড় সাহেব যাই-ই বলুন। ফিরে এসে জবাবদিহি করব।

আমারও ঐ কথাটা মনে হচ্ছিল। কিন্তু অত লোক সাহস করে যাচ্ছে খালি হাতে, তার মধ্যে আমি একাই ভয় পেয়েছি এ কথা স্বীকার করতে লজ্জা করছিল।

রেঞ্জারবাবু হঠাৎ নিজের মনেই বললেন, আরে, পঁচিশজন মানুষের সাহস যোগ করলে কি একটা হাতীর সাহসের সমান হবে না?

অতএব অন্যত্র, অভুক্ত আমরা সকলে, বেলা দশটা নাগাদ ট্রাকে করে সার্কাস কোম্পানির লোকেদের সঙ্গে সার্কাস করতে করতে রওয়ানা হলাম বাঘমুণ্ডার দিকে, জগন্নাথপুরের দিকের রাস্তা দিয়ে।

ট্রাক যতদূর যেতে পারে গেল।

তারপর ট্রাক থেকে নেমে আমরা পঁচিশজন বীরপুরুষ একটা ভীতু হাতীর বাচ্চাকে ধরবার জন্যে এগোতে লাগলাম।

আমি কিন্তু বীরপুরুষ নই। বাঘ ডাকলে, হাতী শুঁড় তুলে চিৎকার করলে আমার সত্যিই ভয় করে। ছেলেবেলাতেও করত; আজও করে। তার উপরে একেবারে খালি হাতে। তাই সকলের পেছন পেছন চললাম।

হাঁটতে হাঁটতে ভেবে পাচ্ছিলাম না এ লোকটা হাতীর দলের মধ্যে থেকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কি করে বাচ্চা ধরবে। কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিলাম না।

রেঞ্জার সাহেব ফরেস্ট গার্ডকে ডেকে তার বন্দুকটা গেদে নিতে বললেন। বললেন, খুব বেশি করে বারুদ গাদো। তারপর সবচেয়ে বড় গুলি লাগাও।

কথামত ফরেস্ট গার্ড গাণ্ডে-পিণ্ডে গাদাগাদি করে বন্দুক গাদলেন। ক্যাপ লাগালেন নীচে। তারপর ইয়াব্বড়া এক গোল সিসের বল গাদলেন শেষে।

জঙ্গল আস্তে আস্তে গভীর হয়ে আসছিল। এখন প্রায় দিনের আলো ঢোকে না এমন জঙ্গলে ঢুকে গেছি আমরা।

হাতীর চিহ্ন দেখে দেখেই এগোচ্ছিল লোকটি।

বেশ অনেকখানি হরজাই জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে গিয়ে এক গভীর বাঁশের জঙ্গলের সীমান্তে এসে যেই প্রথমবার হাতীর দলের আওয়াজ পেলাম— তখনই বুঝলাম যে, লোকটা তাহলে বুজরুক নয়। এত সহজে, এত তাড়াতাড়ি যে সোজা হাতীর দলের কাছে নিজের দল নিয়ে এসে পৌঁছতে পারে, তার পক্ষে গুপ্তবিদ্যা জানাটাও আশ্চর্য নয়।

হাতীগুলো পাহাড়ের নীচের বাঁশের জঙ্গলে কচি কচি বাঁশ ভেঙে খাচ্ছিল।

রণক্ষেত্রে পৌঁছে আমরা যারা নিরস্ত্র দর্শক তারা স্বাভাবিক কারণে পিছিয়ে পড়লাম। কিন্তু রেঞ্জার সাহেব সরকারি কর্মচারী এবং তদুপরি বর্তমান সমাবেশে সর্বোচ্চ পদাধিকারী। তাই তাঁকে সার্কাস কোম্পানির মাতব্বরের সঙ্গেই থাকতে হল। কিন্তু তিনি বন্দুকধারী গার্ডকে পাশে পাশে সর্বক্ষণ নিয়ে চললেন। বললেন, খবরদার! বিনা কারণে গুলিগোলা ছুঁড়বি না।

গার্ড বেচারা একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। সে কোন কারণে এবং কতখানি সিরিয়াস কারণে গোলাগুলি ছুঁড়বে তা বুঝতে পাচ্ছিল না। তাছাড়া একনলা গাদা বন্দুকে গুলি তো একটাই। গোলাগুলির প্রশ্নই ওঠে না।

কিছুদূর যাবার পরই দলটার খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম আমরা।

সামনে তাকিয়ে দেখলাম সার্কাস কোম্পানির মাতব্বর বুক ফুলিয়ে আরো এগিয়ে চলেছে সামনে।

দলে মাত্র একটিই বাচ্চা হাতী ছিল, বাচ্চা মানে, সবে মায়ের দুধ-ছাড়া বাচ্চা। বাচ্চাটা এ হাতীর পায়ের মধ্যে দিয়ে গলে গিয়ে অন্যজনের পায়ের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসছিল। দলের মদ্দাটা প্রকাণ্ড দাঁতাল। একটা দাঁতাল সর্দার আর তিন-চারটি মাদী হাতী ছিল এখানে বাচ্চাটা সমেত। দলের অন্যান্যরা বোধহয় পাহাড়ের ওপারে চরছিল।

কেন যেন আমার ভয় ভয় করতে লাগল। মনের মধ্যে একটা 'কু' ডাক দিতে লাগল। কিন্তু কি ঘটে সেটা দেখার লোভও সামলাতে পার-

www.BanglaBook.org

ছিলাম না।

তাড়াতাড়িতে জুতো খুলে আমি একটা খুব বড় তেঁতরা গাছে তর-তড়িয়ে শাখামৃগের মতো উঠে গেলাম। যখন একটা গ্রান্ড স্ট্যান্ড ভিউ পাওয়ার মতো ডালে আরাম করে বসেছি, তখন হঠাৎ সর্দার দাঁতাল এদিকে ঘুরে শুঁড় তুলে প্যা-এ-এ-এ করে ডাকল।

চারধারে চেয়ে দেখি—উপভোগ্য এক দৃশ্য। দাঁতালের ঐ এক বৃংহণেই সার্কাস কোম্পানির বেশির ভাগ লোক সার্কাস করতে করতে চতুর্দিকের গাছে চড়াও হয়েছে। যে-গাছে তাকাই, সে গাছেই মানুষ। বাঁদরদের এ জঙ্গল থেকে উদ্বাস্তু করে আমরা জঙ্গল জাঁকিয়ে জমজমাট হয়ে বসেছিলাম।

সার্কাসের সেই মাতব্বরের কিন্তু তখনও ডোন্ট-কেয়ার ভাব। তার সঙ্গে আরও দুজন সাহসী অনুচর। পিছনে রেঞ্জার সাহেব ও তাঁর বডিগার্ড।

কোঁচড় থেকে আছাড়ি-পটকা নিয়ে মাতব্বর চতুর্দিকে আছড়ে মারতে লাগলেন। তাতে হাতীগুলো একটু ভয় পেয়ে পাহাড় চড়তে শুরু করল দৌড়ে দৌড়ে। বাচ্চাটা সামান্য পেছিয়ে পড়ল। আর অমনি মাতব্বর এক দৌড়ে গিয়ে তার গলায় সাদা-রঙা নাইলনের দড়ির ফাঁস পড়িয়ে দিল। ভদ্রলোকের যে সাহস আছে, তা আমাদের প্রত্যেকেরই স্বীকার করতে হল। নেহাত হাত ছেড়ে দিলে ডাল থেকে পড়ে যেতাম, নইলে আমি হাততালিও দিতাম।

বাচ্চাটার গলায় মোটা দড়ির ফাঁস লাগাতেই মাতব্বর ও তার অনু-চরদ্বয় দড়ি ধরে "হেঁইয়ো" বলে টান লাগাল। এবং এক হাতে দড়ি ধরে অন্য হাতে মুহুর্মুহু আছাড়ি-পটকা ফাটাতে লাগল।

বাচ্চাটা টানাটানিতে বেশ কয়েক গজ এদিকে চলেও এল। কিন্তু পরক্ষণেই "পাদমেকং ন গচ্ছামি" বলে মাটিতে সে জেদী মেয়ের মতো থেবড়ে বসে পড়ল। বাচ্চা হলেও, হাতীরই তো বাচ্চা—তার ওজন কম নয়।

সেই অধঃপতিত অবস্থা থেকে তাকে উত্থিত করার চেষ্টায় গলার দড়িতে প্রচণ্ড টান লাগানো হল। আর অমনি বাচ্চাটা চেঁচিয়ে উঠল অদ্ভুত একটা সংক্ষিপ্ত আওয়াজ করে।

রেঞ্জার সাহেব যুদ্ধে জিত হয়ে গেছে ভেবে বটুয়া থেকে পান বের করে গুন্ডি খাচ্ছিলেন এবং বৃক্ষারূঢ় আমাদের সাহসের অভাবের কথা ভাব-ছিলেন।

এমন সময় বাচ্চার গলা শুনে বাচ্চার মা ঘুরে দাঁড়িয়ে পাহাড় জঙ্গল ভেঙে দৌড়ে আসতে লাগল।

হাতীকে জঙ্গলের মধ্যে চার পা তুলে যাঁরা দৌড়তে না দেখেছেন তাঁরা অনুমানও করতে পারবেন না যে, হাতী কত জোরে দৌড়তে পারে। হাতীর দৌড়ের ভঙ্গীটা খুব হাস্যকর।

সেই মাদী হাতীটা বেগে পাহাড় বেয়ে নেমে আসছিল।

সার্কাসের মাতব্বর সমানে তখনও আছাড়ি-পটকা আছড়ে যাচ্ছেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু গাছ থেকে হাতীটাকে দেখে আমার মনে হল যে, তখন অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক গান দিয়েও তাকে থামানো যাবে না—। আছাড়ি-পটকা তো দূরস্থান।

মাতব্বর শেষ পর্যন্ত দড়ি ধরে দাঁড়িয়েছিল। রেঞ্জার সাহেব ততক্ষণে সার্কাসওয়ালার বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন। উনিও তার প্রায় গায়ে লেগে দাঁড়িয়ে রইলেন।

হাতীটা প্রায় এসে পড়েছে, যখন একবারে কাছে এসে পড়েছে, তখন হঠাৎ সেই মাতব্বরটা অমনি মিলখা সিংকেও লজ্জা দিয়ে এমন জোরে দৌড় লাগালেন দড়িটড়ি ফেলে যে, তা বলার নয়।

কিন্তু রেঞ্জার সাহেব মিলখা সিং নন। তার উপর তাঁর পায়ে আর্থ-রাইটিস্। সেই মাতব্বরের বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে তিনি ওয়াকি-বহাল হতে না হতে হাতীটা প্রায় তাঁর উপর এসে পড়ল। তখন বাচ্চাটাকে পিছনে ফেলে হাতীটা সামনে এগিয়ে যাচ্ছে প্রতিহিংসার জন্যে। তার উৎক্ষিপ্ত গোলাকার শুঁড় একটুর জন্যে রেঞ্জার সাহেবের মাথা ফসকে গেল।

আমরা রেঞ্জার সাহেবের ভয়ার্ত গলা শুনলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিশ্বস্ত গার্ড প্রায় হাতীর কানে গাদা-বন্দুকের নল ঠেকিয়ে গুলি করল।

গুলির শব্দ রেঞ্জার সাহেব আর ফরেস্ট গার্ডের পালিয়ে যাবার শব্দের সঙ্গে মিশে গেল।

আমরা কেউ তারপর যা ঘটল তার জন্যে একেবারেই তৈরি ছিলাম না।

বাচ্চার মা-হাতীটা কয়েক সেকেন্ড একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। তার শরীরটা টলতে লাগল। তারপর অতবড় হাতীটা আস্তে আস্তে বসে পড়ল মাটিতে। হাতীটা বার বার মাটি ছেড়ে ওঠবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু পাগুলো একটু নড়ল। তারপর সব স্থির হয়ে গেল।

একটু পর বাঁ কানের ফুটো দিয়ে কালচে রক্ত গড়িয়ে আসতে দেখা গেল বাইরে।

ইতিমধ্যে মদ্দা দাঁতাল হাতীটা ফিরে এসেছে। এসেই সে রেঞ্জার সাহেব-দের দিকে অনেকখানি ধেয়ে গেল। তারপর ফিরে এল মাদী হাতীটার কাছে।

আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসেছিলাম।

একটা মূর্খ বাহাদুরীপ্রবণ লোকের বাড়াবাড়ির জন্যে যে এক্ষুনি একটা হত্যাকান্ড ঘটে গেল চোখের সামনে, এক্ষুনি যে দু'জন মানুষের মৃত্যু আমাদের দেখতে হতো, একথা ভেবে ঐ মাতব্বরকে ধরে আমার চাবকাতে ইচ্ছে করছিল।

বেচারী ডি. এফ. ও. সাহেব। এত চেষ্টা করেও তিনি তাঁর জঙ্গলের একটি হাতীর মৃত্যু রোধ করতে পারলেন না।

আমরা চুপ করে বসেছিলাম। নিষ্কম্প হয়ে।

দাঁতাল হাতীটা যেন বিশ্বাস করল না যে, তার সঙ্গিনী মরে গেছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাচ্চাটা এসে তার মায়ের পেটের কাছে ঘুরতে লাগল। তখনো তার গলায় দড়ির সেই ফাঁসটা লেগে ছিল। ঐ ফাঁস মানুষের লাগানো। মানুষ ছাড়া আর কেউ ও ফাঁস খুলতে পারবে না। ও যেখানেই যাচ্ছিল গলার সঙ্গে বাঁধা দড়িটা সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল পিছন পিছন। যদি এ বাচ্চাটা বড় হয়, এ দড়িটা যতদিন না ঝড়-জলে ধুলোয় ক্ষয়ে যায়, ছিঁড়ে যায়, ততদিন ওর গলাতে ওটা কেটেই বসে থাকবে।

মন্দা দাঁতালটা মাদী হাতীটার চারপাশে ঘুরল বার বার। তার প্রকাণ্ড দাঁত দিয়ে ওকে ওঠাবার, দাঁড় করাবার চেষ্টা করল। তাতেও যখন সঙ্গিনী কথা বলল না, নড়ল না চড়ল না, তখন সে এক আশ্চর্য কাণ্ড করল। তার প্রকাণ্ড লিঙ্গ উদ্যত করে সে পেছন থেকে হস্তিনীর যোনি স্পর্শ করল। অনেক চেষ্টা করল সঙ্গিনীর ঘুম ভাঙাতে। বারবার চেষ্টা করল।

এতেও যখন হস্তিনী সাড়া দিল না, তখন হঠাৎ যেন দাঁতাল হাতী ক্ষেপে গেল। ক্ষেপে গিয়ে দূর থেকে এক দৌড়ে এসে দুটো দাঁতই ঢুকিয়ে দিল শায়িতা হস্তিনীর পেটে। নদ্ নদ্ শব্দ করে ভসস্ আওয়াজে দুর্গন্ধ সমেত হাতীর কয়েক মণ নাড়িভুঁড়ি সব মাটিতে নেমে এল। অত বড় বড় দাঁতে প্রায় পুরো পেটটাই ফেঁসে গেল হস্তিনীর।

হাতীটা কেন এমন করল তা বলার মতো আমার জ্ঞান ছিল না; আজও নেই। কিন্তু দেখলাম সে করল।

তারপর মা-হারা বাচ্চাটাকে, গলায় সভ্য মানুষের উপহারের দড়ি-বাঁধা অবস্থায় পায়ে পায়ে নিয়ে, দাঁতাল সর্দার ধীর পায়ে পাহাড় পেরিয়ে, সঙ্গিনীর দিকে আর একবারও পিছন ফিরে না চেয়ে, ওদিকের উপত্যকায় তার দলের সঙ্গে মিলিত হতে গেল।

পাহাড়ের নীচে ছায়া ঘন হয়ে এসেছিল। দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল হতে চলল। কিন্তু গাছ থেকে নামার কথা কারোরই মনে হচ্ছিল না। ঘটনা-পরম্পরার অভাবনীয়তায় ও বীভৎসতায় আমার সমস্ত বোধ ভোঁতা হয়ে ছিল।

দাঁতাল হাতী বাচ্চাটাকে নিয়ে চলে যাবার প্রায় আধঘণ্টা পর গাছ থেকে নামলাম। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ী বাজ আর শকুনরাও এসে নামল আকাশ থেকে। ওদের চোখে কিছুই অদেখা থাকে না। জঙ্গলের গভীরে যে ঘটনাই ঘটুক না কেন, উপরের পাতার চন্দ্রাতপে যদি কিছুমাত্র ফাঁক থাকে, তা হলে তা এদের নজর এড়ায় না।

বেচারী হাতী-মা। ওর একমাত্র অপরাধ এই-ই ছিল যে তার বাচ্চাকে সে ভালোবাসতো। একটা প্রাণহীন নিস্তব্ধ কালো টিলার মতো সে গভীর সবুজ জঙ্গলের মধ্যে স্থির হয়ে পড়ে রইল। সে আর কখনও উঠবে না।

পাহাড়ের ওপারে ঘনায়মান ছায়ার মধ্যে মধ্যে তার আদরের বাচ্চাটা এতক্ষণ তার দলের সঙ্গে কোনো গভীরতর জঙ্গলের নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে হেঁটে যাচ্ছিল। যেখানে নোংরা পা পড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আজ সকালেই শ্যামলবাবু খবর পাঠিয়েছিলেন যেন রাতে ওঁর ওখানে খিচুড়ি খাই আর শুয়োর মারার জন্যে বসি।

সন্ধের পর রাইফেল কাঁধে নিয়ে গরম কাপড়-জামা আর একটা কম্বল কাঁধে ফেলে রওনা হলাম শ্যামলবাবুর তৈলার দিকে।

ঘোর অন্ধকার চতুর্দিকে। ঝিঁঝিদের একটানা ডাকে অন্ধকারটা যেন চারিয়ে উঠছে। পথের পাশের মিট্‌কুনিয়া গাছ থেকে একটা বড় প্যাঁচা দুর-গুম্‌-দুরগুম্‌ দুরগুম্‌ করে উঠল। বাঘমুণ্ডার দিক থেকে হাতীর বৃংহণ শোনা গেল।—দূরের মার্সিডিস ট্রাকের হর্নের আওয়াজের মতন। বোণ্টম-নালার কজওয়ের সামনে এক ঝাঁক চিতল হরিণ দৌড়ে রাস্তা পার হল ডান-দিক থেকে বাঁদিকে। শিঙাল হরিণটা জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়ে এদিকে মুখ ঘুরিয়ে ডাকতে লাগল। টাঁউ-টাঁউ-টাঁউ।

শ্যামলবাবুর তৈলায় পৌঁছনোর আগে থেকেই তাল-পট্‌কার আওয়াজ শোনা যেতে লাগল মাঝে-মাঝে। ওঁরা প্রায় পনেরো মিনিট পর পর তাল-পট্‌কা ফাটাচ্ছিলেন জানোয়ারদের ভয় পাওয়াবার জন্যে।

তৈলা মানে, জঙ্গলের বুক থেকে ছিনিয়ে নেওয়া চাষের জমি। একসারি মাটির ঘর—খড়ের ছাউনি দেওয়া। একপাশে মাটির বারান্দা। একটা ঘরে রান্না হয়, একটা ঘরে মুহুরীরা শোয়, একটা ঘর অনিবাবুর। অন্য ঘরে শ্যামলবাবু থাকেন।

শ্যামলবাবুর ঘরের মধ্যে লণ্ঠন জ্বলছিল বাঁশের মাচার উপর। মাটির দেওয়ালে দুটি পেরেক পোঁতা—তাতে দড়ি টানানো—তার উপরে জামা-কাপড় ঝোলানো। মাটির কলসীতে পানীয় জল। মাচার উপরে শ্যামলবাবুর বিছানা পাতা। দেওয়ালে মদের কোম্পানির বুক-দেখানো উরু-দেখানো মেয়ের ছবিওয়ালা গরম ক্যালেন্ডার ঝুলছে। এক কোণে ওঁর সাইকেলটা ঠেস্‌ দিয়ে দাঁড় করানো। লণ্ঠনের আলো ক্রোমিয়াম-প্লেটিং করা হ্যান্ডেলে চক্‌-চক্‌ করছে।

শ্যামলবাবু উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। বললেন, চা খাবেন নাকি এক কাপ? রান্নার এখনও দেরী আছে।

তারপর বললেন, চলুন, বারান্দায় বসি, চেয়ারে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বারান্দায় বসে ডালের বড়া দিয়ে চা খেতে খেতে অনেক গল্প হল শ্যামলবাবুর সঙ্গে।

শুধোলাম, অনিবাবু কোথায়? তাঁকে দেখছি না যে।

শ্যামলবাবু বললেন, উনি একটু টিকরপাড়া গেছেন চা বিক্রি করতে। যদি মাছ পান তো নিয়ে আসবেন। আনলে, কাল মাছ পাঠাবো আপনাকে।

আজ রাতে বোধহয় বৃষ্টি হবে। আকাশ মেঘে ঢেকে গেছে। সব তারাদের দেখা যাচ্ছে না। শুধু কালপুরুষকে দেখা যাচ্ছে। কোমরে তরোয়াল ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অতন্দ্র প্রহরী। ঝুরুঝুরু করে একটা হাওয়া দিচ্ছে থেমে থেমে। হাওয়ায় দূরাগত শীতের বৃষ্টির গন্ধ। বাঁশবনে কট্‌কটি আওয়াজ উঠছে। তক্ষক ডাকছে থেকে থেকে। কট্‌কটে ব্যাঙ পাথরের নীচ থেকে বৃষ্টির আভাস পেয়ে ডেকে উঠেছে কটর্‌ কটর্‌ করে। সমস্ত জঙ্গল প্রকৃতির স্বগতোক্তিতে ভরে গেছে।

পাশের ঘরে মুহুরীদের মধ্যে কে যেন একটা ঢোল বাজিয়ে গান গাইছে। গানটার সুরটা ভারী মিষ্টি।

আমি শুধোলাম, কে গাইছে গান? ডাকুন না শোনা যাক।

শ্যামলবাবু হাসলেন, বললেন, আমার মুহুরীদের রস তো কম নয়। সারাদিন খাটেপেটে, সন্ধের পর গান বাজনা হয়। শুনতে পাই, যখন আমি থাকি না, তৈলার মধ্যে সারারাত ক্যাবারে হয়। সব শালা হারামী। আমি না থাকলেই সাপের পাঁচ পা দেখে।

আমি হেসে উঠলাম। বললাম, ক্যাবারে হয় মানে?

শ্যামলবাবু তাচ্ছিল্যের গলায় বললেন, কোনো মেয়েকে নিয়ে আসে আশ-পাশের গ্রাম থেকে আট-আনা একটাকা দিয়ে—সকলে মিলে পানমৌরী খায়—তারপর এরা মাদল পেটে, গান গায় আর সে উদোম হয়ে আগুনের চারধারে ঘুরে ঘুরে সারারাত নাচে। এই জঙ্গলে পাহাড়ে এদের তো কোনো রিক্রিয়েশান নেই। একটানা ন'মাস, এক বর্ষার সময় ছাড়া এরা ঘর-সংসার ছেড়ে জঙ্গলেই কাটায়। সিনেমা নেই, থিয়েটার নেই, লেখাপড়া জানে না যে বই পড়বে, আর জানেও বা যদি, তো বই কোথায়? এইসব নিয়েই থাকে। সময় কাটায়।

আমি বললাম, আপনার মুহুরীরা সকলেই তো কাগজপত্র নিয়ে কি সব লেখালেখি করে দেখি। লেখাপড়া জানে না কিরকম?

শ্যামলবাবু জোরে হেসে উঠলেন। বললেন, ও লেখাপড়া কাঠের হিসাব। কত গাছ মার্কা হল, কত বর্গফুট কাঠ কাটা হল, গাদা-দেওয়া রইল কত বর্গফুট, লরীতে চালান হল কত, এই সব হিসেব। ঐ অঙ্কটাই জানে ওরা, কাঠের অঙ্ক। তবে হ্যাঁ। এদের মধ্যে একজন কবিও আছে। যে গান শুনছিলেন, তা সেই কবির স্বরচিত গান।

বললাম, বলেন কি? ডাকুন ডাকুন, কবির শ্রীমুখে তার স্বরচিত গান শোনা যাক।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শ্যামলবাবু ডাকতেই ওরা সদলে এল।

কিন্তু আমাকে দেখে লজ্জায় কাঁচুমাচু হয়ে রইল। কিছুতেই গান গাইতে চাইল না। শেষ অনেক পীড়াপীড়িতে কবি গানটা গাইল :

"লহ লহ লহ মারিস
কষ্ট দেই করি কিল্পা না আস।—প্রেমিকা

তম ঘরে যেয়ঁ কালিয়া কুকুর
কাটি খাউথেলা মোর মাংস।—প্রেমিক

লম্বা লাজিয়া পুতুকা মুহ
কার্য ভাঙিলু মোর
যেখে আস্বিব ভাদ্রব মাস
পেট ছান্দিবি তোর।—প্রেমিকা

নই নই আসে, ছপি ছপি আসে
মুই ভাব থাই চোর
তোর সঙ্গে যেখে ভাব পীরতী
লাজ মারি যাউ মোর॥—প্রেমিকার কুকুর

গানটির সুর যেমন মিষ্টি, তেমনি কবির গলার স্বর, তেমন অরিজিনাল কথা। গানটির একটু ব্যাখ্যা দরকার।

জঙ্গলের মধ্যে প্রেমিকার ছোট্ট কুঁড়ে। কুঁড়ের সামনে দিয়ে নালা বয়ে চলেছে। আদুল-গায়ে লাল শাড়ি পরা প্রেমিকা তার গোবর-লেপা আঙিনায় ঘোরে ফেরে, ঘর গেরস্থালির কাজ করে, হাওয়ায় হাওয়ায় হলুদ বাঁশপাতা, সাদা সাদা শালের ফুল উড়ে পড়ে আঙিনায়, তার নতুন যৌবনে দোলা লাগে, চলকে চলকে ওঠে তার উপচীয়মান বুক, চমক লাগে তার নিভৃত নিতম্বে : গুনগুনিয়ে গান গায় সে।

কথা ছিল যে, সন্ধ্যার কোনো এক যামে তার প্রেমিক আসবে তার কাছে।

ভালো করে চান করেছিল সে ছায়াচ্ছন্ন নালার বহমান জলে সাবজিমাটি দিয়ে, নিমতেল মেখেছিল তার কোমর সমান জঙ্গলের গন্ধ-ভরা চুলে, করোঞ্জের তেল মেখেছিল সে মুখে, প্রদীপের আলোয় কাজল তুলে সে কাজল পরেছিল চোখে, চন্দনের গুঁড়ো মেখেছিল সারা গায়ে। সে তার সমস্ত শরীর ও যুবতী মনের সুখকর যন্ত্রণা নিয়ে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করেছিল প্রেমিকের। কিন্তু সময় মতো প্রেমিক এল না। সে অধন্য হয়ে গেল সেই সুগন্ধি রাতে।

এই জঙ্গল-পাহাড়ের মেয়েরা প্লেটোনিক ভালোবাসায় বিশ্বাস করে না। তারা কোনোরকম ভণ্ডামিতে, ভানে বিশ্বাস করে না। তারা যাকে চায়,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাকে সমস্ত মন ভরে, সমস্ত শরীর ভরে শ্রাবণের বৃষ্টির মতো, শীতের কুয়াশার মতো, গ্রীষ্মের রোদের মতোই চায়। তারা রাতের বিছানার ভালোবাসা একজনের জন্যে রেখে, অন্যজনকে বালিগঞ্জী নেকুপুষমুন্দ মনের বিচিত্র ভালোবাসায় ভুলিয়ে রাখতে চায় না। তারা গাছেরটা এবং তলারটা একই সঙ্গে খায় না। খেতে জানে না। এইটুকু সততা তাদের থাকে।

এইবার গানের কথায় আসি।

প্রেমিক রাতে আসেনি, কিন্তু পরদিন সকালে সে এসে হাজির এক আকাশ আলোর মধ্যে। রাতের অন্ধকারে যে মুকুলগুলি ফোটে, যে পাপড়িগুলি খোলে, দিনের আলোয় তারা চোখ বোঁজে—লজ্জায় তারা মুদ্রিত হয়।

তাই প্রেমিককে দেখে পরম উষ্মাভরে প্রেমিকা বলল, নদীর ঢেউয়ের মতো সময় বয়ে গেল, তুমি সময় দিয়েও সময় মতো এলে না কেন?

তখন প্রেমিক বলল, আমি এসেছিলাম ঠিকই, কিন্তু তোমার বাড়ির যে কালো কুকুর—সে একটু হলে আমার মাংস ছিঁড়ে খেয়েছিল আর কি!

প্রেমিকা কুকুরের কুকীর্তির কথা জানতে পেরে খুব রেগে বলল কুকুরকে—ওরে লম্বালেজওয়ালা গোমড়া-মুখো কুকুর, তুই যখন আমার এমন সর্বনাশ করলি, তোকেও আমি দেখে নেবো। আসুক ভাদ্রমাস, তোদের মিলন মাস; তখন তোর পেট বেঁধে রাখব আমি।

কুকুর এ কথা শুনে খুব বিচলিত ও লজ্জিত হল।

বলল, আমি কি আর জানি যে, এ তোমার প্রেমিক। যেমন করে চুপি চুপি, লুকিয়ে লুকিয়ে ও আসছিল, আমি তো ভেবেছিলাম, সে কোনো চোর। আমি যদি জানতাম তোমার সঙ্গে তার ভাব-পিরীত, তাহলে আমার লেজ মাড়িয়ে গেলেও আমি কিছু বলতাম না।

গান-টান শুনিয়ে ওরা আবার ওদের ঘরে চলে গেল হাসাহাসি করতে করতে।

ইতিমধ্যে রাতও হয়েছে অনেক। রান্নাও হয়ে গেছে।

আমরা শ্যামলবাবুর ঘরে মেঝেতে কম্বল পেতে পেতে বসলাম।

গরম গরম খিচুড়ি, আলুভাজা, ডিমভাজা আর সঙ্গে একটু কষামাংস।

শুধোলাম, কিসের মাংস এটা?

শ্যামলবাবু পরিবেশনকারীর দিকে আড়চোখে তাকালেন, তারপর বললেন, কি রে? ঋজুবাবুকে বলেই দি, কেমন? উনি তো ঘরের লোক।

তারপর বললেন, আজ সকালে সেখানে ফেলিং হচ্ছিল, তার কাছেই একটা খরোশ্টি মেরেছিল এক মুহুরী তীর-ধনুক দিয়ে। চুরি করে। এ তারই মাংস। দেখছেন না কি নরম! ভালো করে খান। হারামীকে খেয়ে, হারামীকে মারার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা যাক। তবে ভুল করেও রেঞ্জার সাহেব বা ডি. এফ. ও. সাহেবকে বলবেন না কিন্তু।

আমি হাসলাম, বললাম, খেয়েই যখন ফেলেছি, এখন আর কি করে বলি? বললে তো নিমকহারামী হবে।

www.BanglaBook.org

খাওয়া-দাওয়ার পর শ্যামলবাবু বললেন, এবার একটা ছোট্ট ঝিউটিস্লিপ দিয়ে নিন। তারপর আমিই তুলে দেবো আপনাকে। আমিও বসব আপনার সঙ্গে কুপরীতে।

বললাম, যা আজ্ঞা করবেন।

তারপর জামাকাপড় পরেই কম্বলটা গায়ে দিয়ে শ্যামলবাবুর পাশে তার মাচায় শুয়ে পড়লাম।

যখন শ্যামলবাবু আমাকে ঠেলে তুললেন তখন রাত প্রায় একটা। ইতিমধ্যে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। ঠাণ্ডাটা আরো জোর হয়েছে। মাটির ঘর থেকে, বাইরের জঙ্গল থেকে বৃষ্টিভেজা মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ বেরুচ্ছে।

শ্যামলবাবু একটা মাটির হাঁড়িতে কাঠকয়লার আগুন করে নিলেন। তারপর হাঁড়িটা নিয়ে চললেন আমার সঙ্গে সঙ্গে।

আমরা টর্চ জ্বালিয়ে তৈলার মধ্যে দিয়ে তৈলার পিছনে জঙ্গলের দিকে যেতে লাগলাম। কতগুলো খরগোশ কান উঁচু করে চীনাবাদামের খেতে চীনাবাদাম খাচ্ছিল।

শ্যামলবাবু বললেন, হারামীর বাচ্চারা সব নষ্ট করে দিল। বলেই, সরাটা মাটিতে নামিয়ে রেখে হাততালি দিয়ে ওদের তাড়িয়ে দিলেন।

কুপরীটা একেবারে জঙ্গলের গা ঘেঁষে বানানো। খড়ের চাল, এক কোমর উঁচু, ভিতরে কাঁচা বাঁশের মাচা।

আমরা দুজনে পাশাপাশি বসলাম। মধ্যে হাঁড়িটা রেখে।

রাইফেলের ম্যাগাজিন খুলে গুলি ভরে নিলাম। চেম্বারে একটা ও ম্যাগাজিনে পাঁচটা। থ্রি-সিক্সটি-সিক্স রাইফেলটা নিয়েই এসেছিলাম।

প্রথম আধঘণ্টা কোনো জানোয়ারের সাড়াশব্দ পেলাম না।

বোল্টমনালাটা তৈলার পিছন দিয়ে ঘুরে ঢুকে গেছে সেগুনের প্ল্যান-টেশানে। নালার ওপাশ থেকে একটা কোট্‌রা ডাকতে লাগল বার বার ভীত স্বরে।

বোধহয় বাঘ কি চিতা দেখে থাকবে।

একটা সজারু এল তৈলার বেড়া গলে। বেশ বড় শজারু।

শ্যামলবাবু কম্যান্ড করলেন, বললেন, মারুন।

রাইফেলে আলো লাগানোই ছিল আমার। রাইফেল তুলে গুলি করলাম। শজারুটা লক্ষ্মী ছেলের মতো পড়ে গেল। পড়ে গিয়েই ওঠবার চেষ্টা করল কিছুক্ষণ। তার গায়ের কাঁটার ঝর্‌ঝর্‌ শব্দ শোনা গেল।

তারপর আবার সব চুপচাপ।

আমরা আজ কুপরীতে পাহারায় বসেছি বলে তৈলার লোকেরা আরামে ঘুমোচ্ছিল। নইলে সারারাত জেগে ওরা তালপটকা ফাটায়। মুহুরীদের ঘর থেকে ফিতে কমিয়ে-রাখা লণ্ঠনের আলো মাটির দেওয়ালের ফাঁক-ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল। এই শীতার্ত জঙ্গলের রাতে কাছেপিঠে যে মানুষ আছে, শোওয়ার মতো একটা ঘর আছে, তাতে আগুন আছে, এ কথা জেনেও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভালো লাগে খুব।

কিছুক্ষণ পর একদল বাইসন এল নালার দিক থেকে। তাদের ভারী শরীরে চলাফেরার শব্দ পাওয়া গেল নালার পাথরে পাথরে। তারপর তারা তৈলার বেড়ার কাছে এসে দাঁড়াল। কিন্তু ভিতরে ঢুকল না। নাক দিয়ে ফোঁ-ফাঁ করে আওয়াজ করতে লাগল। একটা মাদী বাইসন বোঁ-য়া-ও-ও করে ডেকে উঠল একবার। তারপর সদলবলে তৈলার পিছনের জঙ্গলে ঢুকে গেল।

ফরেস্ট অফিসের কাছেই কয়েক ঘরের একটা বস্তি ছিল। হঠাৎ সে বস্তি থেকে একটা শোরগোল উঠল। নারী ও পুরুষকণ্ঠের আওয়াজ শোনা গেল। শ্যামলবাবু বাঁ কানে হাত চেপে, ডান কান ওদিকে ঘুরিয়ে শোর-গোলের মর্মোদ্ধার করলেন।

বললেন, একটা মাগী এখুনি বিয়োল।

তারপর বললেন, শালার এই পোড়া দেশে মিনিটে মিনিটে বাচ্চা পয়দা হয়। শুয়োরদেরও হার মানালাম আমরা। অন্য কাজ পারি আর না পারি, আমরা সবাই এই একটি কাজে খুব দড়।

ওঁর কথা বলার ধরনে আমার হাসি পেয়ে গেল। জঙ্গলে জঙ্গলে থেকে ভাষাটাও একেবারে চাঁছাছোলা হয়ে যায়। কোনো রাখা-ঢাকার প্রয়োজন নেই। আমরা যাকে "ম্যানারস্" বলি তা এখানে অনেকদিন আগেই তামাদি হয়ে গেছে।

তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ।

শুয়োরদের এখনও পাত্তা নেই কোনো। চারদিকে নিস্তব্ধ। শুধু এক-টানা ঝিঁঝির ডাক, বৃষ্টিভেজা জঙ্গলে হাওয়াটা খস্‌খস্ আওয়াজ তুলে দমকে বয়ে যাচ্ছে। হিস্-হিস ফিস্-ফিস উঠছে অস্ফুট কথার মতো। একটা একলা টি-টি পাখি টিটির-টী—টিটির-টী—টি-টি—টি-টি করে ঝাঁক দিয়ে দিয়ে ডাকছে পিছনের বৃষ্টিভেজা জঙ্গলে।

প্রায় ঘন্টাখানেক পর ঐ বস্তিটা থেকে আবার একটা একলা মেয়ে-গলার তীক্ষ্ণ চিৎকারটা ভেসে এল।

পরক্ষণেই সেই চীৎকারটা কান্না হয়ে গলে পড়ল। তারপর গড়িয়ে গেল ভেজা বনে বনে।

কয়েকটা লোক একসঙ্গে স্বপ্নের মধ্যে কথা বলার মতো অসংলগ্ন কথা বলে উঠল—তারপর সেই মেয়েটির কান্নাটা ঝিঁঝির শব্দের সঙ্গে, হাওয়ার শব্দের সঙ্গে, রাতের বনের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেল। তাকে আর কোনো মানুষীর কান্না বলে আলাদা করে চেনা গেল না।

শ্যামলবাবু তখনও বাঁ কানে হাত চেপে ডান কানটা শিয়ালের মতো খাড়া করে বসেছিলেন।

একটু পর কানের থেকে হাত সরিয়ে বললেন, শুনলেন?

বললাম, আমি বুঝতে পারিনি। অত ভালো ওড়িয়া জানি না আমি, যে দূরের বিলাপের মানেও বুঝব।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তারপর বললাম, কি হল ? বলাৎকার-টলাৎকার নাকি ?

শ্যামলবাবু বললেন, আরে না ; বল থাকলে তবে না বলাৎকার করবে। লোকগুলোকে দেখেন না ? আফিং-এর গুঁড়ো খেয়ে খেয়ে কেমন বেঁকে গেছে।

আবার শুধালাম, তাহলে চিৎকারটা কিসের ?

ঐ মাগীর চিৎকার। ও কিচ্ছু না।

আহা। চিৎকারটা কিসের জন্যে তাই-ই বলুন না। ফিসফিস করে আমি বললাম শ্যামলবাবুকে।

শ্যামলবাবুর চোখ দুটো জ্বলে উঠল অন্ধকারে। বললেন, সত্যিই শুনবেন ? শোনবার মতো কলজে আছে তো আপনার ?

আমি বললাম, কি হেঁয়ালি করছেন। বলুনই না।

উনি বললেন, যে মাগী বিয়োলো একটু আগে, তার বাচ্চাটার নরম তুলতুলে লাল মাথাটা একটা বড় ছুঁচো এসে এক্ষুনি খেয়ে গেল—মানে ঘিলু-টিলু সব। বাচ্চাটা বেঁচে গেল। এই বিরাট গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হতে হল না শালাকে। ও শালা জানতেও পেলো না যে, কত বড় বাঁচা ও বেঁচে গেল এ জন্মে।

আমি চুপ করে রইলাম। গলা শুকিয়ে এল। বুকের মধ্যে কিরকম করতে লাগল যেন আমার।

শ্যামলবাবু বললেন, মন খারাপ হল না কি ? মন খারাপের কি ? আমাদের মেয়েরা সব সুজলা-সুফলা। দশমাস দশদিন পর দেখবেন ও আবার বিয়োবে। সে পুতের মাথা ছুঁচোয় নাও খেতে পারে। অত হতাশ হবার কি আছে ?

ব্যাপারটার অভাবনীয়তা আর অবিশ্বাস্যতা আমাকে এমন করে আচ্ছন্ন করে ফেলল, স্তম্ভিত করে ফেলল যে, তা আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না।

অনেক অনেক ক্ষণ আমি স্থাণুর মতো বসে রইলাম। শীত আমাকে ছেড়ে চলে গেল। ভীষণ একটা গরম, একটা অসহায় উপায়হীন ক্রোধ আমাকে ঘামিয়ে তুলল। ক্রোধটা কার ওপর তা আমি বুঝতে পারলাম না।

শেষরাতে শুয়োর এল। হোঁৎকা-হোঁৎকা কচু-খেকো, ঘেঁচু-খেকো, গু-খেকো শুয়োর। একদল। ধাড়ি, মাদী ; বাচ্চাকাচ্চাসমেত। খচর্-খচর্-খচর্-খচর্ ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করে তারা তৈলায় ঢুকল।

শ্যামলবাবু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

বললেন, মারুন, মারুন, একটা হারামীও যেন না পালাতে পারে।

রাইফেল তুলে আমি পর পর গুলি করে যেতে লাগলাম। গুলি করি, বোল্ট খুলি, গরম ফাঁকা খোলটা ছিট্‌কে বেরিয়ে যায়, আবার বোল্ট চেপে নিয়েই গুলি করি। পাঁচটা গুলি চোখের নিমেষে শেষ হয়ে গেল।

মুখ নীচু করে যখন আবার গুলি ভরছি, ততক্ষণে শুয়োরের দল তৈলার বেড়া পেরিয়ে চলে গেছে।

মুখ তুলে দেখি চারটে ধাড়ি শুয়োর পড়ে রয়েছে। বাদবাকী একটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গুলি হয় মিস্ করেছি, নয় শুয়োর আহত হয়ে পালিয়ে গেছে। রাইফেলের মার। গুলি যদি লেগে থাকে, মোটামুটি ভালো জায়গায়, তবে পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই সকালে এদিকে-ওদিকে।

শ্যামলবাবু উত্তেজনায় ঝুপরী থেকে লাফিয়ে নামলেন। শুয়োরগুলোর দিকে দৌড়ে গেলেন।

আমি বললাম, কাছে যাবেন না, বেঁচে থাকলে আপনাকে একেবারে চিরে দেবে।

শ্যামলবাবু কথা শুনলেন না। শুয়োরদের কাছে গিয়ে তাঁর রোগারোগা লুঙি-পরা পায়ে লাথি মারতে লাগলেন।

তাড়াতাড়ি রাইফেল রি-লোড করে আমি যখন ঝুপরী থেকে নেমেছি ততক্ষণে যা হবার তা হয়ে গেছে।

একটা বড় দাঁতাল শুয়োর—বুকে গুলি লাগা সত্ত্বেও শ্যামলবাবু তার কাছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝট্‌কায় উঠে ওঁর উরুতে মেরে দিয়েছে।

শ্যামলবাবু ছিটকে পড়লেন দূরে হাত-পা ছড়িয়ে। লুঙি উড়িয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে শুয়োরটাকে গুলি করলাম আমি। ওটা পড়ে যেতে, রাইফেল রেডি করে ধরে অন্যান্যগুলোরও কাছে গেলাম। একটা তখনো বেঁচে ছিল—ঝুঁকি না নিয়ে আর একটা গুলি করে দিলাম ওর গলায়।

গুলির শব্দে ও চীৎকার-চেঁচামেচিতে তৈলা থেকে সবাই দৌড়ে এল।

শ্যামলবাবুকে কাঁধে করে ভিতরে নিয়ে যাওয়া হল।

রক্তে ভেসে যাচ্ছিলেন উনি। বাম উরু থেকে শুরু করে কুচ্‌কি অবধি একটা গভীর ক্ষত লম্বালম্বি চলে গেছে।

তক্ষুনি একজন মুহুরী সাইকেলে লন্ঠন ঝুলিয়ে চলে গেল আমাদের ডেরায়—পাইকারাকে সঙ্গে করে জিপ নিয়ে আসতে। আঙুলের হাসপাতালে ওঁকে নিয়ে যেতে হবে।

শ্যামলবাবু মাচার উপরে শুয়ে ছিলেন। মুখে সেই ম্ব্যার্থক হাসি। হাসি মোছেনি তখনো। উনি চেঁচিয়ে বললেন, আরে কার কাছে পানমৌরী আছে? পানমৌরির বোতল আন শালারা।

একজন মুহুরী লেবেল-মারা পানমৌরীর বোতল নিয়ে এল।

আমি শ্যামলবাবুর দাড়ি-কামানোর ঝোলা থেকে ডেটলের শিশি বের করে ক্ষততে ডেটল দিচ্ছিলাম। জ্বালায় শ্যামলবাবু নীল হয়ে গিয়েছিলেন।

একটু পর সামলে নিয়ে, শুয়ে শুয়েই ঢক্‌ঢক করে পানমৌরী খেতে লাগলেন।

তারপর নিজেই বললেন, তোরা সব ঘর থেকে যা—হাওড়া ছাড় আমায়—আমার গরম লাগছে।

ওরা সকলে ঘর থেকে চলে গেলে, হঠাৎ শ্যামলবাবু বললেন, অজুবাবু শুয়োরে কিরকম আওয়াজ করে শুনেছেন?

আমি অবাক হলাম। বললাম, কি রকম? ঘোৎ-ঘোৎ?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শ্যামলবাবু হাসলেন। বললেন, আপনি নিশ্চয়ই গান জানেন না। আপনার কান নেই।

আমি আরো অবাক হয়ে বললাম, তাহলে কিরকম আওয়াজ করে?

শ্যামলবাবু বললেন, ভালো করে কান-খাড়া করে শুনবেন। দেখবেন ওরা বলছে, ভোট দাও। ভোট দাও। ঘোঁৎ-ঘোঁৎ নয়। ভোট দাও।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পাইকারা জিপি নিয়ে এল।

শ্যামলবাবু বললেন, দেখুন তো! আপনাকে কি ঝামেলায় ফেললাম।

বললাম, তা তো ফেললেনই। কি দরকার ছিল গুলি-খাওয়া শুয়োরটাকে লাথি মারতে যাবার?

শ্যামলবাবু চুপ করে থাকলেন। জবাব দিলেন না।

পাইকারা আর ওঁর একজন মুহুরী পিছনে বসল।

শ্যামলবাবু বললেন, আধবোতল পানমৌরী খেয়ে আমি ফিট্। আপনি জিপ চালান, আমি আপনার পাশে বসে গান গাইতে গাইতে যাব।

বললাম, থাক, আর গান গাইতে হবে না। মানে মানে চলুন তো দেখি হাসপাতাল।

শ্যামলবাবুর চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই কতখানি জীবনীশক্তি রাখেন ভদ্রলোক। ঐ অবস্থায় অনেক তাগড়াই লোককে নেহাত শক্-এই মরে যেতে দেখেছি। কিন্তু শ্যামলবাবুকে সামনের সিটে উঠিয়ে দেওয়ার পর উনি একটু কাত হয়ে আমার দিকে ঝুঁকে বসলেন, ডান হাতে পানমৌরীর বোতল নিয়ে।

জিপটা স্টার্ট নিতেই শ্যামলবাবুর বেসুরো গলার গান শুরু হল:

শ্যামা মা যে আমার কালো…
কালোরূপে দিগম্বরী,
হৃদিপদ্ম করে যে আলো রে,
শ্যামা মা যে আমার কালো…

পম্পাশরে একে পৌঁছতে পৌঁছতেই পুবের আকাশে আলো ফুটে উঠল। অঙ্গুলে পৌঁছতে পৌঁছতে বেশ রোদ উঠে গিয়েছিল।

ডাক্তার ভালো করে দেখেশুনে জায়গাটাতে ডিস-ইনফেকট্যান্ট লাগিয়ে সেলাই করে দিলেন। ব্যান্ডেজ করে দিলেন জায়গাটা ভালো করে। তারপর বললেন, ভবিষ্যতে লাথালাথি করার ইচ্ছে হলে আমাকে বলবেন, আমার বাড়ির গাছ থেকে গোটাকয় বড় বড় কাঁচা বাতাবীলেবু পাঠিয়ে দেবো—যত খুশি কিক প্র্যাকটিস্ করতে পারেন। এ-পর্যন্ত অনেক শুয়োর-চেরা কেস্ দেখেছি মশাই, কিন্তু শুয়োরকে লাথি মারতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এমনটি দেখিনি।

ডাক্তারবাবু ইঞ্জেকশান দিলেন, ওষুধও খাওয়ালেন। এবং সঙ্গেও অনেক ইঞ্জেকশান ও ওষুধ দিয়ে দিলেন।

শ্যামলবাবু আমায় বললেন, টাকাটা ওখানে ফিরে আমি ফেরত দিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেবো আপনাকে। যা খরচ হল, তা একমণ কুল্‌থীর দাম। কোনো মানে হয়? একটা ঠ্যাং বাঁচাতে একমণ কুল্‌থী নষ্ট? আবারও নাকি সাতদিন পরে দেখাতে আসতে হবে!

ফেরার সময় আমি বললাম, ডাক্তারবাবু কি বললেন, মনে থাকবে তো?

শ্যামলবাবু সখেদে বললেন, লাথি কি ওদের মারতে চাই? না চেয়েছিলাম কখনও? যে-সব মুখে মারতে চাই, সে-সব মুখে লাথি মারার সুযোগ কোথায় আমাদের মতো হোটখাট নগণ্য জঙ্গলী লোকদের?

একটু চুপ করে থেকে বললেন, আসলে ব্যাপারটা কি জানেন ঋজুবাবু, লাথি আমরা প্রত্যেকেই মারতে চাই কখনও কখনও কাউকে কাউকে। শুয়োর-গুলো উপলক্ষ মাত্র। এই লাথি মারার ইচ্ছাটা আমাকে মাঝে মাঝে পাগল করে তোলে, একেবারে উন্মাদ করে তোলে। কিন্তু এই একার দুব্‌লা পায়ে আর জোর কতটুকু?

তারপরই বললেন, আপনার লাথি মারতে ইচ্ছা করে না?

আমি উত্তর না দিয়ে স্টিয়ারিং ধরে সামনে রাস্তায় চেয়ে রইলাম।

দেখতে দেখতে আবার পূর্ণিমা ঘুরে এল।

এসে অবধি সুযোগ খুঁজছিলাম চাঁদনী রাতে একা একা জঙ্গলে ঘোরবার। ইস্‌স্‌, কতদিন কতদিন, যে এমন ঘুরিনি! প্রকৃতির বুকে এলে আমি যা শান্তি পাই এমন আর কোথাওই পাই না। একদিন বলেছিলাম, তোমাকে আমি প্রকৃতির চেয়েও ভালোবাসি। সে কথা মিথ্যে কথা। প্রকৃতির মতো ভালোবাসতে পারিনি আমি এ পৃথিবীর কোন নারীকেই। কোনো নারীকেই। প্রকৃতি কখনও নিষ্কি-হাতে মেছুনীর মতো ভালোবাসতে জানেনি। কি পেয়েছে আর কি দিয়েছে তার হিসাব করেনি। যে-ই তাকে উজাড় করে ভালোবেসেছে, তাকেই সে ভালোবাসা সে শতগুণে ফিরিয়ে দিয়েছে। পৃথিবীর যে-কোনো নারীর চেয়ে প্রকৃতি বিশ্বস্তা। প্রকৃতিই একমাত্র সুন্দরী, সুগন্ধী, সুবেশা নারী, যে কখনও বিশ্বাস ভাঙেনি কারো।

খাওয়া-দাওয়ার পর বেরিয়েছিলাম, সারা রাত ঘুরে বেড়াব বলে। কোনো উদ্দেশ্য অথবা কোনো গন্তব্য ছিল না। একা একা বসে এক বোতল স্কচ-হুইস্কি খাওয়ার নেশার মতো তারিয়ে তারিয়ে সময় নিয়ে আজ প্রকৃতির

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নেশায় বুঁদ হবো ভেবেছিলাম।

এ নেশার কাছে অন্য সব নেশা হেরে যায়। এল-এস-ডি, মারিজুয়ানা, হুইস্কি, স্লিপিং পিল—কোনো কিছুই এ নেশার সমকক্ষ নয়। এ নেশায় জ্ঞান টন্‌টন করে, কিন্তু শরীর ক্লিষ্ট হয় না। শুধু মন এক অদ্ভুত স্বর্গীয় আবেশে আবিষ্ট হয়। যে এ নেশা করেছে, এ নেশায় মজেছে যে, শুধু সেই-ই জানে এ নেশার তাৎপর্য।

জঙ্গলে পাহাড়ে এলেই আমার বিভূতিবাবুর কথা বড় মনে পড়ে। তাঁর জীবিতাবস্থায় তাঁকে দেখার বা তাঁর সঙ্গে আলাপিত হওয়ার কোনো সুযোগ হয়নি আমার। তিনি যখন মারা যান তখন আমার বয়স বেশি নয়। কিন্তু আমার মনে তিনি চিরদিনই আছেন। যখনি ইচ্ছা, তখনি ওঁকে আমি রেজারেকটেড্ করে নিই। তাঁর পাশে পাশে জঙ্গলের পথে চলি। মহালিখা-পুরের পাহাড়, নাড়া বইহার, লবটুলিয়া ছইহার, সরস্বতী কুণ্ড এরা সব আমার মনে প্রোথিত হয়ে রয়েছে। যেমন রয়েছে আরো লক্ষ লক্ষ পাঠক-পাঠিকার মনে।

ভারী ইচ্ছে হয় এ পোড়া চোখ যা দেখে, এ কান যা শোনে, এ মন মনে মনে যে ভাবনার জাল বোনে তা পাঠক-পাঠিকার মনেও পৌঁছে দিই। কিন্তু আমার সে সাধ্য কোথায়? বিভূতিবাবু তো গণ্ডায় গণ্ডায় জন্মাবেন না বাংলায়। উনি উনিই। ওঁর চোখ পাইনি, পাইনি ওঁর কলম, আমার মতো সাধারণ অক্ষম একজন উত্তরসূরি শুধু যন্ত্রণাই পাই, যখন বুঝি কিছুই তো হল না। কিছুই পারলাম না।

উনি শুধু বাজাতেন না, উনি নিজেও বাজতেন তার সঙ্গে। আর বাজনা এবং বাজিয়ের সমস্তটুকু অনুভূতি পৌঁছে দিতে পারতেন পাঠক-পাঠিকার মনে মনে। আমি কখনও ওঁর মতো বর্ণনা দিতে পারব না জঙ্গলের, যেমন পারব না আমীর খাঁ কি ভীমসেন যোশী তাঁদের শ্রোতাদের যে চরম সুখের স্বর্গে পৌঁছে দেন, সেই স্বর্গে পাঠক-পাঠিকাকে পৌঁছে দিতে। আমার সাধ্য যে বড়ই সীমিত।

বিভূতিবাবুর লেখার কথা মনে হলেই বড় হীনমন্য বোধ করি। তাছাড়া, উনি যে-চোখে প্রকৃতিকে দেখেছিলেন, আমার যে সে অনাবিল চোখ নেই। ওঁর নায়ক এমন চাঁদনী রাতে ঘোড়ায় চড়ে জঙ্গলের আলোছায়ার বুটিকাটা পথে যেতে যেতে পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সম্বরকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁর চোখে প্রকৃতি এক সুন্দরী মোহময়ী রহস্যময়ী নারী। দুঃখের বিষয় এই যে, আমি যে কবির চোখে দেখতে পারিনি প্রকৃতিকে। রাতের সম্বরের রূপ দেখেই আমি ক্ষান্ত হইনি, তাকে গুলি করে মেরেছি, তার চামড়া ছাড়িয়েছি নিজে হাতে। তার পেট চিরে ফেলার পর যে একটা বদ গন্ধ বেরোয় সে গন্ধে বহু বহুবার আমার নাক ভরে গেছে। তাই আমার নাকে বুনো-ফুলের গন্ধ আর লাগবে না ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম, আমার নাকও কসাইয়ের নাক হয়ে গেছে। তবু কি আশ্চর্য! এখনও ফুলের গন্ধ আমাকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তেমনি করেই আচ্ছন্ন করে!

বিভূতিভূষণ যে রমণীকে সুন্দর পোশাকে, সুগন্ধি মহিমায় চাঁদনী রাতে রহস্যময়তার প্রতীক হিসেবে দেখেছেন, তাকে আমি রমণ করেছি। তার সমস্ত রহস্য উন্মোচন করেছি। তার বুকের লাল তিলে চুমু খেয়েছি তার স্তনাগ্র দাঁতে কেটেছি। তার বাহুমূলে নাক রেখেছি। তার চিকন কালো পেলব জঘনের নরম রোমে মুখ ডুবিয়েছি, তার কানের লতিতে সুড়সুড়ি দিয়েছি, তার গ্রীবায় আলতো করে ঠোঁট ছুঁইয়েছি। অথচ প্রকৃতি এমনই এক আশ্চর্য নারী যে, সে কখনও ফুরোয়নি, কখনও পুরোনো হয়নি; তাই তো বারে বারে তার চেনা বুকে ফিরে আসা, তার শরীরে নিত্য নতুন যাওয়া। এক নির্মোহ, নির্বেদ, নিষিদ্ধ আনন্দের সঙ্গে তাকে বার বার নতুন করে ফিরে ফিরে পাওয়া।

দুশ্চরিত্র—আমার এই চোখ আবিল হয়ে গেছে। নারীর বহিরঙ্গ রহস্যময়তায় মন ভরেনি আমার। নগ্নতায় নামিয়ে এনে বারবার আতিপাতি করে চিনছি আমি, খুঁজেছি তার শরীরের সব ভাঁজ, বাকি রাখিনি কিছুই; সব সময় ভয়ে মরেছি যে, সে বুঝি আমাকে তার সম্পূর্ণতায় ধরা দিল না। কিছু বুঝি বাকি থেকে গেল।

বোস্টমনালার পাশ দিয়ে, শ্যামলবাবুর তৈলাব সামনে যে পাকদণ্ডী পথটা ছোটকুঁইয়ে চলে গেছে, সে পথে রওনা হলাম পায়ে হেঁটে। ইচ্ছে ছিল ছোটকুঁই থেকে টুল্বকা অবধি যাব, আবার ফিরে আসব। সারা রাতের টহল।

পাকদণ্ডী পথটা গেছে গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। মাঝে মাঝে পাহাড়ি ঝর্ণা তির্‌তির করে বয়ে গেছে পথের উপর দিয়ে। এ পথে দিনান্তে কেউ কখনো যায় না। তখন রাতের প্রাণীদের যাতায়াতের সড়ক এটা।

চতুর্দিকেই ঘন জঙ্গল, মাথার উপর জঙ্গলের চন্দ্রাতপ, চাঁদের আলো চুঁইয়ে আসছে সামান্য পাতার ফাঁক-ফোঁক দিয়ে। এ পথে অন্য কোনো ভয় নেই। একমাত্র ভয়, বাঘ চিতা কি ভাল্লুকের মুখোমুখি পড়ে যাওয়া। পথটা এত সরু যে, কাছাকাছি মুখোমুখি পড়ে গেলে অতর্কিতে ঘাবড়ে গিয়ে তারা আক্রমণ করে বসতে পারে তাদের সহজাত বাঁচার বোধে।

পথের দু-পাশে লজ্জাবতীর জঙ্গল। কাঁটকারীর ঝোপ-ঝাড়। কতগুলো জায়গায় বনতুলসীতে ছেয়ে গেছে। আকন্দর ডালপালা ছড়িয়ে গেছে চার দিকে। মাঝে মাঝে কেরকেরী লতার ঝাড়। এই কেরকেরী আকন্দ এসব দিয়ে এখানে গাদা বন্দুকের বারুদ তৈরি করে স্থানীয় লোকেরা।

এগুলো ঝোপ-ঝাড়। লতাপাতা—নীচে নীচে। তাছাড়া মাথা উঁচু করে আছে চারপাশে কত রকম সে গাছ! কুমারী জঙ্গল। এসব জায়গায় এখনো কুপ্ দেননি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট। শাল, সেগুন, বাতুরা, রশি বন্ধন, তেঁতরা গামহার, মিটকুনিয়া, শলাই, কুচিলা, শিশু আরো কত শত হরজাই গাছে জড়াজড়ি করে হাত ধরাধরি করে আছে বন।

এক জায়গায় ঝর্ণার নীচে অনেকখানি জায়গায় ঘাস গজিয়েছে কচি কচি।

www.BanglaBook.org

একটা কোট্‌রা পট্‌পট্‌ করে ঘাস খাচ্ছিল। মোড়ের মাথায় আমাকে দেখতে পেয়েই খ্বাক্‌ খ্বাক্‌ করে দৌড়ে পালাল ঝোপ-ঝাড় ঠেলে।

উল্টোদিকের জঙ্গল থেকে একটা চিতাবাঘের গলার করাত-চেরার মতো আওয়াজ এল কানে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘুমন্ত জঙ্গল জেগে উঠল গাছে গাছে হনুমানদের হুপ্‌-হুপ-হুপ আওয়াজে। পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে সে ডাক আবার ফিরে এল বনে। তারপর পাতায় পাতায় কাঁপতে থাকল।

উঁচু শিমুলের ডালে বসা ময়ূর হঠাৎ কি জানি কেন ডেকে উঠল তীক্ষ্ণ স্বরে, কেঁয়া কেঁয়া কেঁয়া করে। সমস্ত জঙ্গল রিনরিন করে উঠল। মাইল দুয়েক আসার পর পথের অনেকখানি সামনে, পথের বাঁদিকে একদল সম্বর ঘ্বাক্‌ ঘ্বাক্‌ ঘ্বাক্‌ করে ধাতব ডাক ডেকে জোরে জঙ্গলের গভীরে দৌড়ে গেল। ডানদিকের জঙ্গলে হনুমানরা নতুন করে সোচ্চার হয়ে উঠল। হঠাৎ আমার মন বলল, এই রাস্তা ধরেই বড় বাঘ আসছে হয়তো।

জঙ্গলে জঙ্গলে রাত-বিরেতে হঠাৎ হঠাৎ এরকম মনে হয় আমার মতো আনাড়ি লোকদেরও। একেই বোধহয় বড় বড় শিকারিরা বলেন "সিকস্‌থ্‌ সেন্‌স্‌"।

পায়ে রাবার সোলের হালকা জুতো ছিল। তাড়াতাড়ি রাস্তা ছেড়ে ডানদিকের জঙ্গলের মধ্যের এক ফালি ঘাস-জমিতে নেমে গেলাম। নেমে গিয়ে পথের থেকে কুড়ি-পঁচিশ গজ দূরে একটা মোটা বন্ধন গাছের আড়ালে শরীরটা লুকিয়ে দাঁড়ালাম।

মন বলছিল, বাঘটা এদিকেই আসছে।

মিনিট তিনেকের মধ্যেই বাঘটাকে দেখা গেল। কোমর দুলিয়ে একটা সুন্দর নিঃশব্দ ছন্দে বাঘটা হেঁটে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে মাথাটা একবার এদিকে আর একবার ওদিকে ঘোরাচ্ছে। চলমান বাঘটার গায়ে চাঁদের আলো পড়েছে। কিন্তু অল্প অল্প। পাতার চন্দ্রাতপের জন্যে বাঘটার পিঠের কালো ডোরার মতো চাঁদের আলোর ডোরা পড়েছে তার গায়ে। চলার সময় তার সামনের কাঁধ দুটো ও পিছনের পা দুটির সংযোগস্থলে দারুণ এক ওঠানামা হচ্ছে।

বাঘের চলার মধ্যে একটা দারুণ রাজা-রাজড়া ভাব আছে—একেই বলে, বাঘের চাল। বাঘের চালই আলাদা। চেহারা না দেখেও অন্ধকারে যে কোনো জানোয়ারের চাল চেখেই বোঝা যায় ওটা কী জানোয়ার, যেমন দূরের আকাশের পাখির ঝাঁকের ওড়ার ভঙ্গী ও ঝাঁকের গড়ন দেখে বলা যায় ওটা কি পাখির ঝাঁক।

বাঘটা দুলকি চালে চলে গেল। আমাকে ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা যাবার পর একটা চাপা গর্জন করল। তারপর আর কোনো আওয়াজ হল না।

বাঘটা চলে যাওয়ার পর আবার রওনা হলাম।

আরও কিছুদূর যাবার পর দূর থেকে সামনে চন্দ্রালোকিত এক বিরাট প্রান্তর দেখা গেল। কোনো টানেলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে দূর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থেকে সূর্যালোকিত বাইরেটা যেমন দেখায়, তেমন। এই পাকদণ্ডী শেষ হবে জেনে ভাল লাগল। এ পথটায় ঢুকে পড়া থেকেই বেশ অস্বস্তি লাগছিল। জানোয়ারের ভয় আমার নেই। আমার কেন, কারোরই থাকা উচিত নয়। ভয় যা তা শুধু দু'পেয়েদের থেকে। তবে জঙ্গলে কতগুলো অলিখিত নিয়ম আছে। সেগুলো মেনে চলা সবসময়েই নিরাপদ।

পথটার প্রায় শেষাশেষি এসেছি, এমন সময় দেখলাম, একদল চিতল হরিণ ঐ চন্দ্রালোকিত প্রান্তরে চরে বেড়াচ্ছে। পাকদণ্ডীর ছায়াছন্ন পথ থেকে বেরোলেই ওরা আমাকে দেখতে পেয়ে পালিয়ে যাবে। অথচ ওদের দেখতেও ইচ্ছে করছিল খুব। তাই ছায়ার মধ্যেই পথের শেষে একটা বড় পাথরের উপর বসলাম একটু জিরিয়ে নেবার জন্য। পাইপটা বের করে তামাক ভরতে লাগলাম। তামাক ভরলাম। কিন্তু এখন জ্বালানো যাবে না। আলো দেখলেই ওরা পালিয়ে যাবে। পাথরে বসে ওদিকে চেয়ে রইলাম।

চিতল হরিণের দলটি ঘুরে ঘুরে চরছে—নিজেদের মধ্যে গুঁতোগুঁতি করছে। শিঙে খটাখট্ আওয়াজ হচ্ছে। মাঝে মাঝে ডেকে উঠছে, টাঁউ টাঁউ টাঁউ করে। হরিণদের ডাকে কোনো সুরের রেশ থেকে যায় না। পর্দা থেকে অন্য পর্দায় গড়ায় না সুর। এক বা একাধিক পর্দায় চড়া সুরে হঠাৎ বেজে উঠেই সে ডাক থেমে যায়।

ঐ অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে বসে বাইরের চন্দ্রালোকিত প্রান্তরের দিকে চেয়ে তোমার কথা বড় মনে হচ্ছিল। এরকম হঠাৎ হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়ে যায় আমার। অবচেতনে তুমি সবসময়ই থাকো, মাঝে মাঝেই চেতনে এসে তোমার নরম হাতের মৃদু করাঘাত করো। চিরদিন আমার জীবন এমনি অন্ধকারাচ্ছন্নই ছিল। এমনি এক অন্ধকার টানেলের মধ্যে দিয়ে, প্রতি পদে ভয় ও দ্বিধা নিয়ে হেঁটেছি আমি জীবনের অনেকগুলো বছর। কিন্তু আমার চোখ ছিল বাইরের এক উজ্জ্বল আলোকিত প্রান্তরে। আশা ছিল, একদিন সেখানে পৌঁছব। তোমার মতো করে আর কেউই জানে না যে, তুমিই আমার সেই একমাত্র আলোকিত প্রান্তর।

কিন্তু যতবারই তোমার কাছাকাছি পৌঁছেছি—অন্ধকারটাই কোনো দৈব-দুর্বিপাকে আমাকে অতিক্রম করে এগিয়ে গেছে—তোমার এবং আমার মধ্যের দূরত্ব আগের মতই থেকে গেছে। থেকে গিয়েছিল। তবুও আমি হেঁটেছিলাম, তোমার আলোর দিকে মুখ করে। চিরদিন; চিরদিন। তুমি কিন্তু কখনও এগিয়ে আসোনি, হাত বাড়াওনি কোনোদিন; হাত রাখোনি হাতে।...

অনেকক্ষণ ওখানে বসে থাকার পর আমি প্রান্তরে নামলাম। মাথার উপরে পূর্ণিমার চাঁদ—ঘাস, ঘাসফুল, লতাপাতা, সব শিশিরে ভিজে রয়েছে। চাঁদের আলোয় সপ্ সপ করছে চারদিক।

একটা হরিণ মুখ তুলেই আমাকে দেখতে পেল। দেখতে পেয়েই ডাকল, টাঁউ। আর অমনি পুরো দলটি চাঁদের মাঠ পেরিয়ে চাঁদের দিকে উড়ে গেল।

হরিণের দল যখন ফাঁকা জায়গা দিয়ে দৌড়ে যায় তখন মনে হয় না যে

www.BanglaBook.org

ওরা দৌড়চ্ছে। ওরা এমনভাবে হাওয়া কেটে যায় যে মনে হয় ওরা উড়েই যাচ্ছে।

প্রান্তরটা পেরোলাম। শিশিরে আমার ট্রাউজারের নিচের দিকটা এবং জুতো ভিজে গেল। তারপর ধূলিধূসরিত পথে এসে উঠলাম।

এই টুম্বকার পথটি ভারী ভাল লাগে। বাঁ পাশে এক জায়গায় ক্লিয়ার-ফেলিং হয়েছিল, তারপর সেগুনের চারা, শালের চারা, লজ্জাবতী, কেরকেরী, বনতুলসী, গিলিরী, মুতুরী সব লতা গজিয়ে উঠেছে এক হাঁটু সমান। চাঁদের আলোয় ভোর হয়ে গেছে ভেবে একটা হলুদ-বসন্ত পাখি নীচু দিয়ে উড়ে চলেছে পাহাড়ের দিকে। মাঝরাতে ঘুমের মধ্যে কুচিলাখাই পাখিগুলো কুচিলা গাছে বসে হঠাৎ হ্যাক্ হ্যাক্ হ্যাক্ হক্ক হক্ক করে ডেকে উঠল। তারপর আবার হঠাৎই থেমে গেল।

এই জঙ্গলে একটা বুড়ো বাইসন আছে। তার গায়ের রঙ পেকে বাদামী হয়ে গেছে। রণক্লান্ত ট্যাঙ্কের মতো সে একা একা ঘুরে বেড়ায়, ধুলোয় গড়ায়, জীবন সম্বন্ধে ওর আর কোন ঔৎসুক্য নেই।

একটা একলা সম্বরও আছে। এ জায়গায়। এককালীন যূথপতি, অধুনা বিতাড়িত। একটা ছোকরা সম্বর নিছক তার গায়ের জোরে ওকে মেরে ক্ষত-বিক্ষত করে তাড়িয়ে দিয়েছিল একদিন দল থেকে। ওর এতদিনের সঙ্গিনীরা কোনো প্রতিবাদ করেনি। মূক উদাস চোখে তারা দাঁড়িয়ে থেকেছে—। তারপর পুরনো সর্দার একা একা আহত অবস্থায় চলে যেতেই নতুন সর্দারের সবল উরু চেটেছে ওরা প্রেমভরে। মাদী সম্বররাও অন্য যে কোনো মানবীরই মতো। ওদের বিবেক নেই। ওরা যে কোনো মূল্যেই ওদের সুখ ছিনিয়ে নিতে জানে পৃথিবীর কাছ থেকে।

ঐ শিঙাল সম্বরটার সঙ্গেও আমার প্রায়ই দেখা হয়। তার বিরাট ডাল-পালা-সম্বলিত শিঙের ভার মাথায় নিয়ে সে ঘুরে বেড়ায়। তার গলার কাছে ঝুলে-পড়া কেশরগুলোকে দাড়ির মতো মনে হয়। পথের বাঁকে পাহাড়ের গায়ে সে একা একা দাঁড়িয়ে থাকে—তার মাথার পিছনের পটভূমি চাঁদের আকাশ। বুনো হাওয়াতে ও ওর পুরনো সঙ্গিনীর গায়ের চেনা গন্ধ পায়। বাঘের গন্ধও পায়। এক গন্ধ ওর জীবনের ও যৌবনের। অন্য গন্ধ ওর মৃত্যুর। কোনো প্রাগৈতিহাসিক অস্ফুট বোবা বোধের মতো সে জীবন ও মৃত্যুর সঙ্গমে দাঁড়িয়ে থাকে এক মুহূর্ত। তারপর অবহেলায় তাচ্ছিল্যে ঘরাক ঘরাক করে দাড়ি দুলিয়ে যেন হেসে ওঠে।

একটা বড় বাঘ অনেকক্ষণ আগে ওর পিছু নিয়েছিল।

পাথরের আড়াল থেকে বেড়িয়ে এসে বাঘটা পায়ে পায়ে ওর দিকে এগিয়ে যায় হাওয়ার উল্টোদিক থেকে, যেদিক জীবন, যেদিক যৌবন তার পুরোপুরি বিপরীত দিক থেকে। একটু পরে কোণাকুণিভাবে বাঘটা ওর ঘাড়ে লাফিয়ে উঠে এক ঝটকায় ওকে মাটিতে ফেলে দিয়ে ওর টুঁটি টিপে ধরবে। মরতে মরতে বুড়ো, বিতাড়িত, সমস্ত কর্তব্য-কর্ম-সম্পন্ন-করা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সম্বরটা ঘনাক ঘনাক করে জড়িয়ে জড়িয়ে ডেকে উঠবে। বাঘটা ভাববে ও বুঝি যন্ত্রণায় কাঁদছে। সম্বরটা জানবে, ও আনন্দে হাসছে।

তারপর তার স্বর থেমে যাবে।

গলার উপরের ফুটো দুটো দিয়ে টাটকা গরম ঘন রক্ত বেরিয়ে আসবে। বাঘটা শীতের রাতে ওর খসখসে জিভ দিয়ে সম্বরের গলার বড় বড় লোম শুদ্ধু সেই রক্ত চেটে চেটে খাবে। তারপর বাঘটা এবং সম্বরটা দুজনে দুজনকে ধন্যবাদ দেবে শেষবারের মতো। দুজনেই দুজনকে বলবে, তুমি যেমন মেকানিক্যালি প্রায়ই বলতে আমাকে, বলবে—"ইট্‌স্‌ ভেরী কাইন্ড অফ ইউ।"

সামনেই পথের বাঁদিকে কতগুলো বড় বড় শালের জঙ্গলের মধ্যে একটা 'নুনি' আছে। ইংরিজিতে বলে সল্ট-লিক্‌—বাংলায় নোনামাটি।

এখানে রোজ রাতে অনেক জানোয়ার আসে নোনামাটি চাটতে।

আশেপাশের শাল গাছগুলো এত বড় যে, ওদের কোনোটাতেই সহজে চড়া যায় না। প্রথম ডালগুলোই এত উঁচু থেকে বেরিয়েছে। শাল-জঙ্গলের মধ্যে একটা একলা পলাশ গাছ ছিল ঝাঁকড়া ডালের। তার ওপর উঠে বসলাম আমি। সামনে 'নুনি'টা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে চাঁদের আলোয়।

কিছুক্ষণ বসার পর বাইসন এল একদল। তারা নুন চাটল চকচক করে। একটা বাচ্চা বাইসন পুরো দলটার পায়ে পায়ে দৌড়ে বেড়াল নিজের আনন্দে বাছুরের মতো।

এখানে একবার একটা হাতীর বাচ্চা হওয়া দেখেছিলাম। বিরাট একটা পলিথীনের থলের মতো গোলাকার থলে ভূমিষ্ঠ হলো। হাতী-মা তার কান দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে সে গোলাকৃতি বলে বাতাস দিতে থাকল। তারপর একসময় সেই গোলাকৃতি জলীয় বলটা ভুস-স-স্‌ আওয়াজ করে ফেটে গেল। জল-জল, পিছল পিছল অনেক তরল পদার্থ বেরিয়ে পড়ল। তার মধ্যে থেকে হাতীর গাবলু-গাবলু বাচ্চাটা বেরিয়ে এল। কিছুক্ষণ চুপচাপ পড়ে থাকল। তারপর হঠাৎ উঠে পড়ে হাতী-মা'র প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তনে শুঁড় লাগিয়ে দুধ খেল। আরও কিছুক্ষণ পর তার মায়ের সঙ্গে, ওদের দলের সঙ্গে বাচ্চাটা টল্‌তে টল্‌তে, পড়তে পড়তে, উঠতে উঠতে হাঁটতে শুরু করল।

একটু পরে একদল নীলগাই এল। এদের যে কেন গাই বলে জানি না। দেখতে এরা প্রায় ঘোড়ার মতো। বরং বিহারী নামটা এদের ভালো—ঘোড়া-পটাশ্‌ বা ঘোড়ফরাস। ওড়িয়াতে বলে ঘড়িঙ্‌। গায়ের রক্ত নীল আর ছাইয়ে মেশা। প্রচণ্ড জোরে দৌড়তে পারে। ঘোড়ার মতো ঘুরে ঘুরে বৃত্তর মধ্যে দৌড়য়—যখন খেলা করে, শৃঙ্গার করে। চাঁদনী রাতে ওদের গায়ের সাদাটে রঙের জন্যে দেখতে ভারী ভালো লাগে।

আরও পরে এক জোড়া বড় ভাল্লুক এল, কুটরুঙ্গের দিক থেকে। তারা নুন চাটল না। কিন্তু নুনির উপর দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে কোথায় না জানি চলে গেল। এখন মহুয়া বা আমের সময় নয়, বোধহয় মৌচাকের খবর

www.BanglaBook.org

পেয়েছে কোথাও অথবা কন্দমূলের বা উইয়ের ঢিপির। ভাল্লুকের মতো সদাবাস্ত হাস্যোদ্দীপক এবং ভয়াবহ জানোয়ার বনজঙ্গলে বড় একটা দেখা যায় না।

রাস্তাটা চলে গেছে টুম্বকা। টুম্বকার ছোট ফরেস্ট বাংলোয়। বাংলোর বৃদ্ধ, খর্বকায় বলিরেখাভরা-মুখের চৌকিদারের নামটা অবিশ্বাস্য। তার নাম খুকী। টুম্বকা পেরিয়ে বরাণ্ডি হয়ে জানিসাহী হয়ে পথটা জঙ্গলে পাহাড়ে ভাসতে ভাসতে চলে গেছে নরসিংহপুর।

ঘড়ির ডায়ালে দেখলাম রাত দুটো। এবার ফিরতে হবে। ফেরার পথে আর পাকদণ্ডীতে ঢুকলাম না। ছায়াগুলো এতক্ষণে নিশ্চয়ই দীর্ঘতর হয়ে এসেছে সেখানে। শেষ রাতে ওপথে যাওয়া বড় বেশি বিপজ্জনক হতে পারে।

একটা একা উড-ডাক একটা কাপাস গাছে বসে অদ্ভুত গলায় ডাকছিল। চাঁদের আলোয় তার চেহারাটা দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু পালকের রঙ চেনা যাচ্ছিল না। অদ্ভুত এই হাঁসগুলো। হাঁসের মতোই জোড়া-পা এদের, দেখতেও প্রায় হাঁসেরই মতো, কিন্তু রাতকাটায় জঙ্গলের মধ্যে গাছের ডালে।

উড-ডাকটাকে অনেকক্ষণ ধরে নিরীক্ষণ করলাম। তাতে তার কোনো ভয়ের লক্ষণ দেখা গেল না। সে যেমন আশ্চর্য ডাক ডাকছিল তেমনি ডেকেই চলল।

একসময় ছোটকুঁই-এর দিকের পথে পা বাড়ালাম। ছোটকুঁই হয়ে পুরুনাকোটে ফিরবার জন্যে।

আজ অষ্টমী পুজো।

অষ্টমী পুজোর দিন বাড়ির বড় ছেলে নতুন ধুতি পায়। বাড়িতে ভাল খাওয়া দাওয়া হয়। কাবাড়িরা অনেকেই আগের দিন ছুটি নিয়ে যে যার গ্রামে রওয়ানা হয়ে যায় বেলাবেলি। দু' ক্রোশ পাঁচ ক্রোশ জঙ্গলের পথে হেঁটে বাড়ি পৌঁছে যায়। এন্ডুলি পিঠা খায়। গুলগুলা খায়। যাদের অবস্থা বিশেষ ভাল তাদের বাড়ি পোড়-পিঠাও তৈরি হয়।

নানা হিসাব-নিকাশের ঝামেলা থাকাতে দুর্গা আগের দিন যেতে পারেনি। অষ্টমী পুজোর দুপুর অবধিও তার কাজ মিটল না। যখন তার কাজ মিটল খাওয়া-দাওয়ার পর, তখন বেলা দুটো বেজে গেছে।

দুর্গা এসে আবদার করল, ঋজুবাবু, আমাকে একটু জিপে করে বাড়ি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পৌঁছে দেবে ? নইলে আমার যাওয়াই হবে না। রাতের আগে পৌঁছতে পারব না। ও রাস্তায় সন্ধ্যের পর লোকজন যায় না—বড় গভীর জঙ্গল।

লবঙ্গীতে বহুদিন যাওয়া হয়নি। লবঙ্গীর জঙ্গলের গভীরতা ও ভয়াবহতা আমাকে বড় টানে।

দুর্গার বাড়ি অবশ্য লবঙ্গীতে নয়। ওর বাড়ি পম্পাশর আর লবঙ্গীর মাঝামাঝি এক ছোট গ্রামে।

দুর্গাকে তৈরি হয়ে নিতে বলেছিলাম।

গগন আর পাইকারা এসে বলল যে, ওরাও দুর্গাকে পৌঁছতে যাবে। ওরা দুজনেই বাড়ির ছোট ছেলে, তাই অষ্টমী পুজোতে ওদের উৎসাহ নেই।

দুর্গা বাড়ি যাবে বলে তৈরি হয়ে এল। সাজিমাটিতে কাচা ধুতি, মালকোঁচা মারা, গায়ে হলদে-রঙা হাফ সার্ট। বুক পকেটে ইয়া মোটা নোটবুক, তাতে রাজ্যের কাঠের হিসাব ও অনেক অশ্লীল গান-টান লেখা আছে। এতদিন পর বাড়ি যাচ্ছে, বউকে গিয়ে শোনাবে। পকেট থেকে একটা লাল-রঙা প্লাস্টিকের চিরুনি উঁকি মারছে। আজ গন্ধতেল দিয়ে চান করেছে দুর্গা। হাতে ঝোলানো বেগুনে-রঙা আলোয়ান। প্রয়োজনে গায়ে দেবে।

ওরা তিনজনেই পিছনে বসল। সামনের সিটে আমার ব্যাগটা আর রাইফেলটা রইল। ওয়াটার-বট্‌লটা ওরা পিছনে নিল। ভাল করে জমিয়ে পাইপটা ধরিয়ে, টুপিটাকে কান অবধি টেনে নামিয়ে দিয়ে রওনা হওয়া গেল।

আজ সকাল থেকেই মেঘলা করেছে। সাঁই সাঁই করে হাওয়া দিচ্ছে একটা। সূর্যের মুখ দেখা যায়নি ভোর থেকেই।

পুরুনাকোট থেকে পম্পাশরের পথে ডানদিকে অনেকটা চষা জমি। তার পাশ থেকেই শুরু হয়েছে গভীর জঙ্গল। এক ঝাঁক বড়কি ধনেশ (কুচিলা-খাই), (গ্রেট ইন্ডিয়ান হর্ণবিলস্) গ্লাইডিং করে ডানা-না-নাড়িয়ে ভেসে ভেসে উড়ে চলেছিল পাহাড়ের খোলে, ওদের ডেরার দিকে স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে আমি ঐ দিকে তাকিয়েছিলাম। ওদের এই নিস্তরঙ্গ উড়ে চলা, আকাশের ক্যানভাসে, ঘন সবুজ জঙ্গলের দিগন্তরেখার পটভূমিতে দারুণ এক স্তব্ধতা আনে। মনের মধ্যের কানাকানি করা ঢেউগুলো, চল্‌কে-পড়া আবেগগুলো সব যেন মন্ত্রবলে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়।

আমি ঐ দিকেই চেয়েছিলাম, এমন সময় দুর্গা পেছন থেকে আমার জাকেনের হাতা টেনে দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

ব্রেকে পা দিয়ে জিপটাকে থামালাম।

দুর্গা আঙুল দিয়ে জঙ্গলের কাছ-ঘেঁষা একটা পাতা-ঝরা বড় গাছের দিকে দেখাল, তারপর বলল, দেখো বাবু, হর্‌হরা ফুটে আছে।

তাকিয়ে দেখলাম, তাই-ই ; পাতা-ঝরা গাছটার ডালে ডালে কম করে পঞ্চাশটা হরিয়াল (গ্রীন পিজিয়ন) বসে আছে। দূর থেকে তাদের কালো কালো ফুলের মতোই দেখাচ্ছে। উপমাটা খারাপ দেয়নি দুর্গা। বলেছে, হর্‌হরা ফুটে আছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে, আমি জিপের এঞ্জিনে স্টার্ট করে গিয়ার বদলেছি, এমন সময় দুর্গা অত্যন্ত উষ্মার গলায় বলল, চললে কোথায় ? মারবে না ?

আমি হাসলাম, বললাম, এই রাইফেল দিয়ে কি হরিয়াল মারা যায় ?

দুর্গা বলল, কেন ? বন্দুকও তো আছে।

শুধোলাম, কোথায় বন্দুক ?

দুর্গা একগাল হেসে বলল, এই যে। বলেই তার আলোয়ানের আড়াল থেকে চামড়ার ল্যাম্বর্স্-সেগে মোড়া আমারই চব্বিশ ইঞ্চি ব্যারেলের শট্-গানটা বের করল। গুলির বাক্সও বের করল। তারপর হেসে বলল, তুমি রাগ করবে বলে আগে বলিনি।

আমি হেসে বললাম, তুমি এক নম্বরের চোর।

দুর্গা বলে উঠল, এই-ই তো হয়। যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর। এই-ই পৃথিবীর নিয়ম।

অগত্যা অনুচরবর্গের প্ররোচনায় নামতে হল। নামলাম বটে, কিন্তু ঐ ন্যাড়া গাছের সব ক'টা পাখি এদিকেই দিব্যদৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে। তাদের চোখে ধুলো দিয়ে সে গাছের কাছে আমি তো কোন্ ছার, কোনো গুব্বরে পোকার পক্ষেও পৌঁছানো মুশকিল। সেই গাছ ও আমাদের মধ্যে চষা ক্ষেত। বিন্দুমাত্র আড়াল নেই যে, আড়ালে আড়ালে যাব। তাই পিছনে হেঁটে গিয়ে জঙ্গলে ঢুকে গেলাম, তারপর আস্তে আস্তে ওদের পিছন দিয়ে গিয়ে গাছটার কাছে পৌঁছলাম।

পাখিগুলো বেশ বড় সাইজের ছিল। ওরা কারো কাছে দীক্ষা-টিক্ষা নিয়েছিল কিনা জানি না, এই শান্ত বিকেলে ওরা নিষ্কম্প অনড় হয়ে বসেছিল। হয়তো কোন মন্ত্র-টন্ত্র জপ করতে থাকবে।

ভাল করে নিশানা নিয়ে দু'ব্যারেলে দুটি চার নম্বর ইণ্ডিয়ান অরড-ন্যান্স ফ্যাক্টরির গুলি পুরে দেগে দিলাম।

ঝর্ঝর্ করে ফুল পড়ার মতো ওদের হলদে-সবুজ পালক উড়িয়ে ছ'-ছটা পাখি নিচে পড়ল। বাকিগুলো একই সঙ্গে ওদের শক্ত ডানায় পটাপট্ ঝটাঝট্ শব্দ করে জঙ্গলের গভীরে উড়ে গেল।

গুলি করেই ব্রিচটা খুলে দু-পা এগিয়ে আমি ফাঁকায় নেমেছি আর দেখি কি, তিন শ্রীমান পড়ি-কি-মরি করে ধুতি উড়িয়ে চুল নাড়িয়ে একই সঙ্গে দৌড়ে আসছে গাছটার দিকে।

ওরা পাখিগুলো কুড়িয়ে নিল দেখতে দেখতে।

দুর্গা আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বলল, এম্বে কিচ্ছু হেব্বা।

অর্থাৎ এবার কিছু হল।

আমরা জিপের কাছে ফিরে এলাম। আমি ব্যারেল দুটো উঁচুতে তুলে ফুঁ দিচ্ছি ধুঁয়ো বের করার জন্যে, এমন সময় দুর্গা একেবারে আমার ঘাড়ে পড়ে বলল, মারন্তু আইজ্ঞা ; মারন্তু। চালি গব্বা।

উপরে তাকিয়ে দেখি, এক ঝাঁকে পাঁচটি ছোট্‌কি ধনেশ উড়ে আসছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাথার উপর দিয়ে।

এরকম প্ররোচনার মধ্যে বুদ্ধির ঠিক থাকে না। কখন যে ডান ব্যারেলে আর একটা চার নম্বর ছররা ফেলে ব্যারেল উঁচিয়ে গুলি করে দিয়েছি নিজেও জানি না। দুটো ধনেশ মাথা-নীচে পা-উপরে মাটিতে পড়ে গেল জিপের কাছেই। অন্য তিনটে গুলির শব্দে হাওয়ায় একটু নেচে উঠেই গতিটা পরিবর্তন করে এবং একই সঙ্গে গতিটা দ্রুততর করে ডানা চালিয়ে উড়ে গেল।

অপকর্মটা করে ফেলে আমি রাগ ঝাড়লাম দুর্গার উপরে।

বললাম, তুমি ভেবেছ কি? আমি কি তোমার বাঁদর যে ইচ্ছামত নাচাবে? যা মারতে বলবে, তাই-ই মারব? আমরা কি শিকারে বেরিয়েছি? না তোমাকে পৌঁছে দিতে বেরিয়েছি?

দুর্গার মুখটা কালো হয়ে গেল।

দুর্গার সেই সদাহাস্যময়তা মুছে গিয়ে এক আশ্চর্য দুঃখ ছেয়ে গেল তার মুখে।

দুর্গা বলল, এতদিন পরে বাড়ি যাচ্ছি ঋজুবাবু। ছেলেমেয়েগুলো আমার গলা শুনতে পেয়েই বাপ্পা, বাপ্পা বলে দৌড়ে আসবে। বলবে, কি এনেছ বাবা, কি এনেছ আমাদের জন্যে? আমার ছোট ছেলেটা মাংস খেতে বড় ভালোবাসে। এ ছাড়া আর কি নিয়ে যেতে পারি ঋজুবাবু? এই তোমার-মারা পাখি নিয়েই যাব। এ ছাড়া আর কিছু নেওয়ার সাধ্য আমার নেই।

তারপর বলল, তুমি রাগ করলে?

আমার খুব লজ্জা হল। দুঃখও হল। আমি দুর্গার পিঠে হাত রেখে বললাম, কিছু মনে কোরো না দুর্গা।

জিপ চালাতে চালাতে আমি ভাবছিলাম শহরের পশুপাখি-দরদী আর্থ-চেয়ার্ কনসার্ভেটররা যে সব বাণী দেন, এবং যা পরদিন নামী-নামী ইংরেজি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, সে বাণী আমি বুঝতে পারি না।

যে-দেশে মানুষ না-খেতে পেয়ে মরে রোজ-রোজ, যে-দেশে প্রচণ্ড শীতের রাতে একটু আগুন সম্বল করে একবার বুক আর একবার পিঠ ফিরিয়ে বনে-পাহাড়ে এরা শুয়ে থাকে, যে-দেশের মানুষের গায়ের আগুনেপোড়া চামড়া পরতে পরতে সাপের খোলসের মতো খসে পড়ে চৈত-বৈশাখ মাসে, সে-দেশে অন্য দেশের নিয়ম খাটে না। এরা ড্রেসড্ চিকেনের নাম শোনেনি। লীন মিট্ কাকে বলে এরা জানে না। ওরা জানে শীতে, গ্রীষ্মে, বর্ষায় বেঁচে থাকাটাই, নিছক বেঁচে থাকাটাই একটা মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা—যা মৃত্যুর চেয়েও নির্মম।

আমার মনে হয় ওদের অনেক অপরাধই ক্ষমা করা উচিত। লজ্জার সঙ্গে, ক্ষোভের সঙ্গে আমাদের নিজেদের প্রতি এক চরম ঘৃণার সঙ্গে ওদের ক্ষমা করে দেওয়া উচিত।

আজ শেষ বিকেলে, অনেক অনেকদিন পর কতগুলো পাখি হত্যা করে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার খুব আনন্দ হল। মনে হল, অনেকদিন পর একটা পুণ্যকর্ম করলাম।

জগন্নাথপুর পৌঁছে চায়ের দোকানে ওদের গুলগুলা আর বিড়ি-বড়া খাওয়ালাম পেট ভরে। চাও খেলাম সকলে। তারপর দুর্গা অধরেরী গুণ্ডিমোহিনী পান গোটাকয় একসঙ্গে মুখে পুরে বলল, চালস্তু ঋজুবাবু।

গগন পিছন থেকে টিপ্পনী কাটল আস্তে আস্তে, আজ রাতে বুড়ির প্রাণ যাবে। ছ'মাসের আদর একদিনে খাবে।

শুনলাম, দুর্গাও ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল,কে বলে রে বুড়ি আমার বৌকে ? তোদের মতো পাঁচ-সাতটা ছোকরা একসঙ্গে মিলেও কায়দা করতে পারবি না। সব দাঁত বের করে পড়ে থাকবি। বুঝিলু ?

ওরা হাসল, আর ঘাঁটাল না দুর্গাকে।

পম্পাশরের কাছে আসতেই বেলা পড়ে এল। আর মিনিট পনেরো-কুড়ির মধ্যেই সন্ধে হয়ে যাবে।

ডানদিকে পম্পাশরের গ্রাম রয়ে গেল। খড়ের ঘর, কয়েক গুঁট চষাজমি, তালগাছ ; ইতস্তত ঘরে-ফেরা গরু-বাছুরের দল ; এই-ই সব। গরুদের পায়ের খুরে খুরে কাঁচা রাস্তার মিষ্টি মিহি ধুলো উড়ছিল, পশ্চিমাকাশ থেকে শেষ সূর্যের গোলাপি ও বেগুনে আলো এসে পড়ে সে ধুলোর মেঘে এক সুন্দর রামধনুর সৃষ্টি করেছিল।

গ্রাম পেরোনোর পর আবার গভীর জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়লাম আমরা। এ পথেও জিপ ছাড়া এবং শক্তিশালী ট্রাক ছাড়া অন্য কোনো গাড়ির পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।

বেশ কিছুক্ষণ যাওয়ার পর দূর থেকে দুর্গা আঙুল দিয়ে দেখাল, ঐ যে।

সূর্য ডুবে গিয়েছিল। কিন্তু পশ্চিমাকাশে তখনও ফিকে একটা সিঁদুরে আভা মাখানো ছিল।

দুর্গা যেখানে আঙুল দিয়ে দেখাল, সেখানে কোনো গ্রামের চিহ্ন দেখা গেল না—শুধু পথের পাশে পাশে কতগুলি বাঁশের বেড়া ও মধ্যবর্তী ক্ষেত ছাড়া।

এখানে জিপটা দাঁড় করিয়ে দুর্গার নির্দেশে হর্নটা একবার বাজালাম। হর্নটা থেমে যেতেই আসন্ন রাতের বাতাবাহী ঝিঁঝিদের একটানা ডাক কানে এল।

দুর্গা জিপ থেকে নামতে-না-নামতেই খালি গায়ে লাল শাড়ি পরা, নাকে পেতলের নথ পরা একটি মেয়ে ও তার পিছনে গামছা পরা একটা বছর চারেকের ছেলে, বাপ্পা, বাপ্পা, বাপ্পা, বলতে বলতে বেড়ার দরজা খুলে দৌড়ে এল।

বেড়ার পাশে ফণীমনসার ঝোপ ছিল, দৌড়ে আসতে গিয়ে ফণীমনসার কাঁটায় মেয়েটির শাড়ির আঁচল আটকে গেল। ও তবু দৌড়ে আসছিল, দৌড়ে আসতেই কাপড়টা কাঁটার উপরেই রয়ে গেল আর দুর্গার লালচে উলঙ্গ মেয়ে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লাল মাটি গায়ে মেখে, কন্দমূলের ক্ষেত থেকে দৌড়ে এসে দুর্গার কোলে ঝাঁপিয়ে উঠল। তার ভাই, দিদির বস্ত্রত্যাগ দেখে প্রথমটা কি করবে ভেবে পেল না। পরক্ষণেই এক হাতে সপ্রতিভতা কুড়িয়ে নিয়ে এবং অন্য হাতে দিদির শাড়িটাকে কাঁটা থেকে ছাড়িয়ে এনে গোল্লা পাকিয়ে বাবার কোলে-চড়া দিদির দিকে ছুঁড়ে দিল।

ওখানে যত জন আমরা ছিলাম, তার মধ্যে দিদির নগ্নতায় ওই সবচেয়ে বেশি লজ্জিত হয়েছিল ; এমন কি ওর দিদির চেয়েও বেশি। শাড়িটা গোল-পাকিয়ে ছুঁড়ল বটে, কিন্তু সেটা ছড়িয়ে গিয়ে দুর্গা ও তার মেয়ের মাথায় ও মুখে এসে পড়ে, মুখে ও মাথায় কেমন জড়িয়ে গেল।

মেয়ে ও বাবা একসঙ্গে দু'জনে অনেকক্ষণ চেষ্টা করে তারপর সেই শাড়ির জাল থেকে মুক্ত হল। ওদের এই হেনস্থা দেখে গগন আর পাইকারা হি-হি করে হাসতে লাগল। সেই হাসিতে আমরা সকলে, এমনকি দুর্গার সিরিয়াস-টাইপের চার বছরের ছেলেও যোগ দিল।

দুর্গা একটা ধনেশ ও তিনটে হরিয়াল গগনদের জন্যে জিপের মধ্যে রেখে বাদবাকী পাখিগুলো যখন ওর ছেলেমেয়েদের দেখাল তখন আনন্দে উত্তেজনায় ওরা ফেটে পড়ল। পাখিগুলো নিয়ে ওরা লাফাতে লাগল। মৃত ধনেশটার ঠোঁট থেকে রক্ত ছিটকে উলঙ্গ মেয়ের সারা গায়ে মাখামাখি হয়ে গেল। তবু ও লাফাতে লাগল।

দুর্গা বলল, একটু নামবে না বাবু ? একটু এন্ডুলি পিঠা খেয়ে যাও। তারপর গগনদেরও বলল নামতে।

গগন পিছন থেকে বলে উঠল, আমাদের বেলা এন্ডুলি পিঠা আর তোমার নিজের বেলা···।

দুর্গা হেসে উঠল, বলল, ষড়া।

গগন বলল, জগন্নাথপুরে অনেক খেয়েছি। পেট ভরে গেছে। আজ আর পিঠা খাব না। তার চেয়ে ক'টা কন্দমূল উপড়ে দে দুর্গাভাই, ডেরায় গিয়ে পুড়িয়ে খাব।

এই প্রস্তাবে দুর্গা রাজী হয়ে গেল।

তারপর বাবা আর ছেলে মিলে কন্দমূলের ক্ষেতে গিয়ে কন্দমূল উপড়াতে লাগল।

আমি গগনদের বললাম, তোমরাও গিয়ে হাত লাগাও, অন্ধকার হয়ে গেছে, বাচ্চারা কি এখন পারবে ?

গগন ও পাইকারা নেমে গেল।

জিপের মাড্‌গার্ডে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পাইপটা ধরালাম। এখন আলো একেবারে নিভে গেছে। পশ্চিমাকাশে সন্ধ্যাতারায় চোখ পড়লেই তোমার কথা মনে হয় আমার। বিশ্বাস করো, চিরদিন মনে হয়েছে। আমার মনোজগতে সমস্ত স্নিগ্ধতার শান্তির সংজ্ঞা এই সন্ধ্যাতারা ; তুমি। আমার মনের সন্ধ্যাতারাটা হারিয়ে গেল চিরদিনের মতো। এখন অন্ধকার, ভয় ভয়,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শীত শীত, ঝিঁঝি-ডাকা চাপ চাপ ভিজে ভিজে অন্ধকার আমার চারপাশে। এ জীবনের দিগন্তে আর কখনও সন্ধ্যাতারা উঠবে না।...

কন্দমূলগুলো জিপের পিছনে ঢেলে নিয়ে, হেডলাইট জ্বালিয়ে দিয়ে যখন ঘুরেছিলাম জিপটা, তখন দেখলাম দুর্গা আর তার দুই ছেলেমেয়ে একই সঙ্গে আমাদের সকলকে হাত জোড় করে নমস্কার করে দাঁড়িয়ে আছে বেড়ার পাশে।

আমরাও প্রতিনমস্কার করে এগিয়ে চললাম।

দুর্গারা অন্ধকারের মধ্যে কন্দমূলের খেতে ঢুকে গিয়ে, টেনে বেড়ার দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বড় বড় পাথর চাপা দিয়ে রাখল। হরিণ, শুয়োর বা শজারু যাতে ঠেলে ঢুকতে না পারে।

রাস্তাটা বেশ খারাপ। হেডলাইট জেবলে সেকেন্ড গিয়ার, ফার্স্ট গিয়ারে চালিয়ে আসছি। দুর্গার বাড়ি থেকে প্রায় মাইল দেড়েক এসেছি সামনেই একটা হেয়ার-পিন বেন্ড দেখা গেল, বাঁকটা ঘুরতেই দেখলাম একদল হাতী পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। একেবারে সামনে। হাত কুড়ি-পঁচিশ দূরে হবে। প্রায় দশ-পনেরোটা হাতী আছে দলে।

সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক করলাম।

হেড লাইটটা ডিপার করা ছিল, ওটাকে ডিমার করে দিলাম, পাছে হাতীদের চোখ ধাঁধালে হাতীরা রেগে যায়; সেই ভয়ে।

হাতীর দল কোনরকম ভ্রুক্ষেপই করল না আমাদের প্রতি। বরং একটা বড় দাঁতাল সোজা বড় বড় পা ফেলে জিপটার দিকেই এগিয়ে আসতে লাগল।

বাঁকের মুখে জায়গা এত কম ছিল যে জিপ ঘুরিয়ে ফিরে যাবার উপায়ও ছিল না।

হাতীটা আরো কাছে চলে আসতেই আলো নিবিয়ে দিয়ে, জিপের স্টার্টও বন্ধ করে দিলাম।

কিছুক্ষণ পর আর কিছু দেখা গেল না। পুরো দলটা জিপটাকে ঘিরে ফেলল।

আড়চোখে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম গগন আর পাইকারা মরা-পাখি আর কন্দমূলের স্তূপের উপর বডি-থ্রো দিয়ে নট্-নড়ন-চড়ন-নট্-কিচ্ছু হয়ে পড়ে আছে। আমার বডি-থ্রো দেবার জায়গা থাকলে আমিও দিতাম। কিন্তু স্টিয়ারিং-এ যে বসে আছি। হাতে স্টিয়ারিং, এক পা ক্লাচে, অন্য পা ব্রেকে আলতো করে ছুঁয়ে রেখেছি।

আমাদের চারপাশে তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। যেদিকে তাকাই কিছুই দেখা যায় না: চতুর্দিকে কালো কালো পাহাড়। শুধু দীর্ঘ ফোঁস্-ফোঁস্ আওয়াজ হচ্ছে। হঠাৎ বনেটের উপর কি একটা শব্দ হল। বুঝলাম একটা হাতী শুঁড় দিয়ে বনেটটা ছুঁল। তারপর বাঁদিকে সিটে রাখা আমার রাইফেলটার নলে একটা শুঁড় এসে লাগল। লাগতেই, রাইফেলটা সিটের রডের উপর ঝন্‌ঝন্ শব্দ করে ধাক্কা খেয়ে কাত হয়ে পড়ে গেল জিপের ভিতরেই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সঙ্গে সঙ্গে অতর্কিতে প্যাঁ-এ-এ-এ করে কানের কাছে ডেকে উঠল হাতী। ভয়ে পিলে চমকে উঠল। কিন্তু কিছুই করণীয় নেই।

ঐ বিজাতীয় রাইফেল শুঁকে এবং ধাতব শব্দ শুনে তারা কিছুক্ষণের জন্যে একটু সরে গেল।

আমার মনে হল, এই বেলা কিছু একটা করা দরকার। নইলে এরা দয়া করলে সারারাত এখানে পড়ে থাকতে হবে। আর যদি দয়ার মাত্রাটা আর একটু বাড়ে তাহলে তালগোল পাকিয়ে সারা জীবনও এখানে শুয়ে থাকতে হতে পারে।

হাতীগুলো একটু সরে যেতেই, একটু দূরে দূরে চলে যেতেই আমি একই সঙ্গে এঞ্জিন স্টার্ট করে এবং হেডলাইট জ্বালিয়েই হর্ণ বাজালাম। সঙ্গে সঙ্গে এ্যাকসিলারেটরে পা দিয়ে খুব জোরে রেস্ করালাম এঞ্জিনকে। তখনও পথের ওপর সামনেই দাঁড়িয়েছিল দুটো হাতী। ফার্স্ট গিয়ারে ফেলে খুব রেস করে এঞ্জিনে প্রচন্ড গোঁ-গোঁ আওয়াজ তুলে এবং জোর জোর হর্ণ বাজিয়ে আমি এগিয়ে গেলাম।

সঙ্গে সঙ্গে অভাবনীয় এক কান্ড ঘটল। চতুর্দিকের হাতীগুলো চার-পা তুলে পড়ি-কি-মরি করে রাস্তার বাঁ দিকের জঙ্গলে গাছপালা ভেঙে মড়মড় শব্দ করে দৌড়ে গেল।

ফাঁক পেয়েই, যাকে বলে 'টিকিয়া উড়ান্' চালানো, তেমন করে টিকি উড়োনো স্পিডে জিপ চালিয়ে অন্তত আধমাইলটাক গিয়ে জিপ থামালাম। থামিয়ে, গগনের কাছে হাত বাড়িয়ে ওয়াটার বটল্ চাইলাম জল খাব বলে।

গগন ওয়াটার বটল্টা হাত বাড়িয়ে দিয়ে ফিক ফিক করে হাসতে লাগল।

আমার তখনও ভয় কাটেনি। বললাম, হাসছিস যে বড় ?

গগন তবুও হাসতে লাগল।

আমার যখন শুধোলাম, তখন গগন হাসতে হাসতে বলল, পাইকারা হিসি করে দিয়েছে।

আমি ধমক দিয়ে বললাম, কি ফাজলামি করছিস ?

গগন সিরিয়াসলি বলল, শালা আমার একেবারে মুখের ওপর···।

আমি চেপে গেলাম।

বললাম, এ কথা যেন ডেরার কেউ না জানে।

পাইকারার কোনই দোষ হয়নি। ও যা করেছে তা আমি নিজেও করতে পারতাম। গগনও করতে পারত।

ভাবছিলাম যে, সাহসের এবং ভয়ের কোনো আলাদা সংজ্ঞা নেই। একই লোক বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রকমের সাহসের পরিচয় দেয়। খুব ভীতু লোক সময়ে সময়ে খুব সাহসিকতার কাজ করে ফেলে, পাইকারার মতে সাহসী লোকও কখনও খুব ভয় পেয়ে যায়। জীবনে যাঁরাই একাধিকবার ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন, তাঁরাই জানেন যে, সাহস ব্যাপারটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কারোর চিরদিনের কুক্ষিগত নয়। সাহসের রেখা, যে-কোনো লোকেরই সাহস, অক্ষয় তৃতীয়ার দিনের বনতে-থাকা কাসুন্দীর মতো বুকের হাঁড়িতে বাড়ে কমে। কখনও তা ফেঁপে ওঠে ; কখনও বা নেমে যায়।

আজ পাইকারার কপাল খারাপ, তাই আমাকে বা গগনকে আশ্রয় না করে ভয়টা আজ পাইকারাকে আশ্রয় করেছিল।

জিপটা 'স্টার্ট' করে আবার রওনা হবার পর গগন বলল, ঋজুবাবু, তুমি যে তখন এমন হঠাৎ গাড়ি 'স্টার্ট' করলে, হাতীগুলো যদি ক্ষেপে গিয়ে এসে মেরে দিত ?

আমিও সে কথা তখন থেকে ভাবছিলাম। বললাম, আমার অন্যায় হয়েছে। করতে পারত হাতীরা তা। উচিত ছিল আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকা, হাতীগুলো নিজেরাই হয়তো একসময় চলে যেত।

গগন বলল, আমারও কিন্তু খুব ভয় লেগেছিল। কিন্তু পাইকারাই কান্ড করল। ইসস্ কোনো মানে হয় ?

বলেই, ওয়াটার-বটল্ খুলে জিপের পিছন দিয়ে মুখ বের করে মুখ ধুতে লাগল। আর কেবলি বলতে লাগল, এটা কি করলি তুই ? হ্যাঁরে পাইকারা ভাই এটা তুই কি করলি ?

কয়েকদিন থেকেই এর-ওর মুখে শুনছি যে একটা বাইসন গুন্ডা হয়ে গেছে। হটবাবু কাল রাতে খাওয়ার সময় বলছিলেন যে, শ্যামলবাবুর কাবাড়িরা যখন কট্‌রঙ্গের রাস্তায় সকালে কাজ করছিল তখন বাইসনটা নাকি তেড়ে আসে। ওরা সকলে তাড়াতাড়ি গাছে উঠে পড়ে। গদাধর বলে একজন উপর থেকে টাঙ্গি ছুঁড়ে মারে। টাঙ্গিটা ঘাড়ের কাছে বেশ অনেকখানি কেটে বসে যায়, তারপর কাঁধ ঝাড়া দিতেই সেটা খুলে পড়ে। ওখান দিয়ে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরোতে থাকে এবং বাইসনটা তেড়ে এসে গদাধর যে গাছে বসেছিল সেই গাছে মাথা দিয়ে এত জোরে ঢুঁ মারে যে, সমস্ত গাছ ঝর্‌ঝর্ করে পাতা ঝাঁকিয়ে নুয়ে যায় উল্টোদিকে। ভয়াত গদাধর গাছ থেকে পড়ে যায়। পড়ে যেতেই, অন্যান্য সব কাবাড়িদের চোখের সামনেই গন্ডটা (বাইসন) গদাধরকে শিং দিয়ে, পা দিয়ে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে রক্তমাংসের একটা তাল পাকিয়ে ফেলে রেখে চলে যায়। গন্ডটার শিং-এ গদাধরের

www.BanglaBook.org

নাড়িভুঁড়ি ঝুলতে ঝুলতে যায়।

গগন বলছিল, রেঞ্জ অফিসের একজন ফরেস্ট গার্ডকে তাড়া করেছিল বাইসনটা।

এ ক'দিন বাইসনটার কথাই ঘুরছে সকলের মুখে মুখে। সেজন্যে সকালে চা-টা খাওয়ার পর যখন অনিবাবুর সঙ্গে দেখা করব বলে শ্যামল-বাবুর তৈলার দিকে বেরোলাম, তখন ফোর-ফিফটি ফোর-হান্ড্রেড ডাবল-ব্যারেল রাইফেলটার দু-ব্যারেলে দুটো হার্ড-নোজড্ গুলি ফেলে ওটা কাঁধে নিয়েই বেরোলাম। সাবধানতার মার নেই। খালি হাতে বাইসনের গুঁতো খেয়ে মরে খবরের কাগজের হেডলাইন হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমার ছিল না।

যে কোনো যূথবদ্ধ জানোয়ারই 'রোগ' বা 'গুন্ডা' হয়ে গেলে মুশকিল। এককালীন ভালোবাসার পাত্রদের দ্বারা বিতাড়িত, সাম্রাজ্যচ্যুত, অপমানিত, আহত অবস্থায় এদের মাথার ঠিক থাকে না। এরা সামনে যাকে পায়, তারই উপর উষ্মা প্রকাশ করে। যে-রাগের, যে-দুঃখের কোনো পরিণতি নেই, সেই গন্তব্যবিহীন অনুভূতি ওরা অন্যদের উপর অসম্মানের সঙ্গে, ঘৃণার সঙ্গে চাপাতে চায়। ফলে, যে-ক্ষত নিয়ে ওরা দল থেকে একসময় বেরিয়ে আসে, সেই ক্ষতর সংখ্যাই বাড়ে, শুধু বাড়তেই থাকে; যতক্ষণ না ওরা সব শারীরিক দুঃখ, সব মানসিক গ্লানির ওপারে কোনো স্তব্ধ শান্তির ঘাসের মাঠে গিয়ে পৌঁছয়।

দূর থেকে অনিবাবুকে দেখতে পেলাম।

রাস্তার দিকে পিছন ফিরে লুঙি পরে, খালি গায়ে, কুয়োতলায় দাঁড়িয়ে তেল মাখছেন।

অনেক বছর পর অনিবাবুকে দেখলাম। দেখলে চেনা যায় না। চুলগুলো সব সাদা হয়ে গেছে। ছ-ফিট দীর্ঘ শরীরটা বয়সের ভারে যেন বেঁকে হ্রস্ব হয়ে গেছে।

কুয়োতলার পাশের পেঁপে গাছে বসে লাল-চোগরা বের করে দাঁড়কাক ডাকছে কা—খা—খা—কা করে। খড়ের গাদার উপর একটা চিতাবাঘের বাচ্চার মতো দেখতে বেড়াল শুয়ে শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছে। কে জানে, ওর বাবা হয়তো কোনো ছোট্ট চিতাবাঘ, যে ওর ঢঙি বেড়ালনি মায়ের মধ্যে পেটের খাদ্য না খুঁজে অন্য কোনো খাদ্যের সন্ধান করেছিল। কোনো ভরদুক্‌কুরের বাঁশ-বনের সেই অসম অসহিষ্ণু মিলনের ফল, এই পিট্‌পিটে-চোখ, মিট্‌মিটে-বুদ্ধি বেড়াল।

একটি মেয়ে কুয়োতলায় বালতি ডুবিয়ে জল তুলছিল, তার খালি শরীরে একটা গেরুয়া শাড়ি জড়ানো। যতবারই সে বালতি ডুবোচ্ছিল, ডুবিয়ে বালতি নাড়িয়ে জল ভরছিল কুয়োর মধ্যে, ততবারই তার ডাঁশা পেঁপের মতো ফিকে হলুদ তার উন্মুক্ত বুক দোলা খাচ্ছিল।

অনিবাবুর সেদিকে চোখ ছিল না।

তিনি ডান হাতে মাথার তালুতে তেল থাবড়াতে থাবড়াতে দূরে তৈলার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শেষে যেখানে জঙ্গল ঘন হয়ে রয়েছে, সেদিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে চেয়ে ছিলেন। জীবনে তিনি বোধহয় দু-লক্ষ বার এমনি করে মাথায় তেল লাগিয়ে চান করেছেন, কিন্তু আজকের দুপুরের এই উত্তুরে হাওয়ার সঙ্গে বাঁশবনে কট্‌কটি আওয়াজের সঙ্গে, বাঁশপাতার দীর্ঘ বুককাঁপা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে এর আগে অনিবাবু আর কখনও এমন একাত্ম হননি। একটা মারাত্মক স্ট্রোক হবার পরও তিনি শরীরকে মোটে পাত্তা দেননি। "জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে" তা তিনি জানেন! আগে উনি বলতেন, আমাকেই শুনিয়ে যে, আজকালকার ছোঁড়ারা মাইকেল পড়েনি; পড়ে না। উনি নিশ্চয়ই পড়েছিলেন। মাইকেল আওড়াতেন তিনি কথায় কথায়।

কিন্তু এই যে নীল আকাশে চিল-ওড়া, বাঁশবনে ফিসফিসানি তোলা, চারিদিকে সোনালি রোদ্দুরে ভরা আশাবাদী দুপুর, এ দুপুর তাঁর জন্যে কোনো আশাই আর অবশিষ্ট রাখেনি। যুবতীর স্তন, কচি পাঁঠার মাংস, মহুয়ার মদ, ক্যাশ-বাক্সের টাকা এ সব কিছুই, কোনো কিছুই আর তাঁর মনকে আবিষ্ট করে না। তাঁর জীবনের অবশিষ্ট অম্বিষ্ট সম্বন্ধে তিনি কুয়োতলার পাশের পাথরগুলোর আড়াল থেকে ডেকে-ওঠা তক্ষকের ডাকের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। তিনি বুঝতে পারেন, সর্বক্ষণ বুঝতে পারেন, তাঁর যাবার সময় হয়েছে। এক-পা বাড়িয়েই আছেন উনি। সবসময়। এমন একদিকে পা বাড়িয়ে আছেন উনি, যেদিকের খেত-খামার, জন্তু-জানোয়ার, পাখপাখালি সম্বন্ধে কিছুই জ্ঞান নেই তাঁর। আজকাল, এই অল্প কিছুদিন হল মাঝরাতে অনিবাবু কেঁপে কেঁপে ওঠেন—শীতে নয়; ভয়ে। এমন একটা ভয়ে, যে-ভয়ের কোনো প্রতিবিধান নেই। যে-ভয় শুধু চিতাতেই ভস্মীভূত হয়।

আমাকে দেখতে পেয়েই অনিবাবু ঘুরে দাঁড়ালেন।

এক আশ্চর্য স্বার্থহীন সরল আনন্দের হাসিতে তাঁর মুখ ভরে উঠল। সামনের তিনটে দাঁত পড়ে গেছে অনিবাবুর। কালো কালো মাড়ি দেখা যাচ্ছে।

অনিবাবু বললেন, আরে, কি খবর ঋজুবাবু? কেমন আছেন? কত দিন পরে!

আমি হাসলাম। বললাম, সত্যি! কতদিন পরে আপনাকে দেখলাম। আপনি বেশ বুড়ো হয়ে গেছেন। বোকার মতো বলে ফেললাম আমি।

অনিবাবু শুকনো গলায় বললেন, হ্যাঁ। আপনিও একদিন হবেন।

তারপর বললেন, এক মিনিট বসুন বারান্দায়। আমি চানটা সেরে নিই।

শুধোলাম, শ্যামলবাবু কোথায়?

আবার কোথায়? জঙ্গলে গেছে। ওর কী যে কাজের নেশা। পা-টাতে এখনও জোর পায় না, তবু না গেলেই নয়। বললাম রেস্ট নে আরো ক-দিন। কিন্তু শুনছে কে? তার উপর গদাধরটাকে গন্ধ মারল। না গিয়েও উপায় নেই বেচারার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনিবাবু কুয়োতলায় দাঁড়িয়ে হুপ্‌স্-হুপ্‌স্ করে চান করতে লাগলেন।

রাইফেল থেকে গুলি দুটো বের করে, রাইফেলটা মাচার উপরে শুইয়ে মাচাতেই বসলাম আমি।

সত্যি! এ অনিবাবুকে চেনা যায় না। লম্বা তেল চুক্‌চুকে ময়াল সাপের মতো চেহারা ছিল। মাথা ভর্তি কালো চুল; টেরী বাগানো। সব-সময় কোঁচআনো ধুতি, পায়ে সাদা পাম্প-শু; এই জঙ্গলেও। আদ্দির পাঞ্জাবি। আতরের গন্ধে ভুরভুর করতেন সে সময়। রঘুবাবু একদিন অনিবাবুকে বলেছিলেন মনে আছে, "ছুছুন্দরকা শির পর চামেলিকা তেল"। তখন খুব ভাল কীর্তন গাইতেন উনি; কত কত রাতে আমরা টুম্বকার বাংলোর বারান্দায় বসে ওঁর 'নৌকা বিলাস' শুনেছি।

অনিবাবুর বাড়ি আছে ভুবনেশ্বরে। সেখানে তাঁর স্ত্রী থাকেন আর একমাত্র সন্তান—তাঁর মেয়ে। মেয়েটি পড়াশোনায় ভালো। শুনেছি, দেখতেও ভালো। ভুবনেশ্বরেই যেন কোন্ সরকারি অফিসে কাজ করছেন এখন। ভালো মাইনেও পান।

মাত্র তিনজনের সংসার। তবুও কেন যে এই বনে-বাদাড়ে শরীরের এই অবস্থা নিয়ে পড়ে আছেন এখানে অনিবাবু, তা উনিই জানেন। এখন আর উনি ঠিকাদারি করেন না। নিজের পেট চালিয়ে নেবার জন্যে—টুক্‌টাক্ করেন। অঙ্গুল থেকে চা কিনে এনে এখানে এবং টিকড়পাড়ায় চায়ের দোকানে বিক্রি করেন। কিন্ট সাউও চা কেনে ওঁর কাছ থেকে। সামান্য বন্ধকী কারবারও করেন—সেটা আমার কাছে অত্যন্ত খারাপ ঠেকে। কিন্তু জানি না, অনিবাবুর কিছু নিজস্ব স্বপক্ষ-সমর্থনের কারণ নিশ্চয়ই আছে। তাঁর বেঁচে থাকার জন্যে, স্বাবলম্বনের জন্যে হয়তো এ অন্যায়টাকে উনি অন্যায় বলে মনে করেন না। সারাজীবন উনি অন্যায় সহ্য করেছেন, চোখের সামনে নানারকম অন্যায় দেখেছেন, তাই বোধহয় তাঁর অন্যায় করতেও কোনো অপরাধ বোধ হয় না। এটাই নিয়ম বলে মেনে নিয়েছেন উনি এবং যাঁরা ওঁর কাছে টাকা নেয়, হয়তো তারাও। ইচ্ছে করলে তিনি বেশ আয়াসে ভুবনেশ্বরে থাকতে পারতেন। অথচ থাকেন না। নিজে হাত পুড়িয়ে রান্না করে খান, চরম দারিদ্র্যের মধ্যে অসহায় অবস্থায় দিন কাটান, অথচ তবু সেখানে যান না, থাকেন না। কী এক অজ্ঞাত অভিমানে এখানেই জীবনের শেষ ক-টা দিন কাটাবেন বলে উনি যেন মনস্থ করেছেন।

চান করে গামছা গায়ে দিয়ে ঘরে গেলেন অনিবাবু। একটা নীলরঙা লুঙ্গি পরে এলেন, উপরে হাতওয়ালা গেঞ্জি। ঘর থেকে আয়নাটা বের করে এনে সূর্যের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বাঁ হাতে আয়নাটা ধরে ডান হাতে বাঁশের কাঁকই দিয়ে চুল আঁচড়ালেন।

তারপর বললেন, একটু চা খান। চা করি?

বললাম, আপনি তো ভাত খাবেন এখন। চা থাক এখন।

উনি বললেন, আজ একাদশী। ভাত আর খাব না। এক মুঠো মুড়ি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খাব। চায়ের সঙ্গেই খাওয়া যাবে। তারপর বললেন, বুঝলেন, হাত-পাগুলো এখন সব বিদ্রোহ করছে। সবসময় মাজাটা টন্‌টন করে, হাড়ে-হাড়ে গাঁটে-গাঁটে নলাবাঁশের মতো কট্‌কটি ওঠে শরীর সুস্থ না থাকলে বেঁচে থাকার মানে নেই কোনো।

অনিবাবু চা করতে গেলেন। আমি ওখানেই ভ্যাগাবণ্ডের মতো বসে রইলাম।

তৈলার বাঁশের বেড়ার পাশে পাশে লাউ কুমড়োর মাচান, সিমের জাঙ্গলা। নীচে একটু তুলসীমঞ্চ। নানা লোকের নানারঙা লুঙি গামছা সব মেলা রয়েছে বেড়ার গায়ে। শ্যামলবাবুর রান্নাঘরে কে যেন ডাল সম্‌বার দিল। কাঁচা লঙ্কা আর কালোজিরের গন্ধের সঙ্গে ফুটন্ত ডালের গন্ধ মিশে গেল। একটা মৌ-টুশকি পাখি এসে লাউয়ের জঙ্গলার মধ্যে মধ্যে উড়ে কিস্‌কিস্‌ করে শিস্‌ দিতে লাগল। একটা বোলতা এল কোথা থেকে—বোঁ-ও-ও—বুঁ-ই-ই—করে আমার মাথার ওপর উড়ে বেড়াতে লাগল, তারপর এক উড়ান্‌ দিয়ে গিয়ে ধাক্কা খেল বারান্দার বাঁশের খোঁটার গায়ে—ঠক্‌ক্‌ করে নীচে পড়ল। কিছুক্ষণ পড়ে থেকে, আবার বোঁ-ও-ও-ও—বুঁই-ই-ই—করে উড়ে গেল।

মাটিতে একটা বাদামী টাকা-কেন্নো বুকে হেঁটে কোথায় যাচ্ছিল। শ্যামলবাবুর কালো কুকুরের বাচ্চাটা ছায়া থেকে উঠে এসে ওর সামনে দু-থাবা রেখে দাঁড়াল। কুঁই কুঁই করে লেজ নাড়ল কিছুক্ষণ, তারপর অনেকক্ষণ পর সাহস সঞ্চয় করে নিয়ে থাবা মারল টাকা-কেন্নোটাকে। সঙ্গে সঙ্গে কেন্নোটা গুটিয়ে গিয়ে গোল টাক্‌রা মতো হয়ে গেল। বাচ্চাটা মজা পেল। ডাকল, ভুক্‌ ভুক্‌ ভুক্‌—ডেকেই, কোমর দুলিয়ে লেজ নাড়তে লাগল উত্তেজনায়।

তৈলার উপরে হাওয়া বইছিল। ফসলগুলোর মাথা দোলাদুলি করছিল। বাঁশের খোঁটার উপর কাকাতুয়া হাওয়ায় দুলছিল। বগারীর ঝাঁক মেঘের মতো উড়ে আসছিল তৈলায় নামার জন্যে। ঝুপড়ীর মধ্যে বসে-থাকা নীল শাড়ী পরা একটা মেয়ে হাতে ক্যানেস্তারা বাজাতে বাজাতে মুখে নানারকম বিচিত্র শব্দ করে ওদের তাড়াচ্ছিল। গোয়াল থেকে দেশী গাই ডেকে উঠল হাম্বা-অ্যা-অ্যা করে। বাতাসে খড়ের গন্ধ, জঙ্গলের গন্ধ, কুকুরের বাচ্চার গায়ের গন্ধ। রান্নাঘরের সম্‌বার দেওয়া ডালের গন্ধ, সব মাখামাখি হয়ে গেল। হাওয়ায় শুক্‌নো বাঁশ পাতা ওড়াউড়ি করছিল, সেগুলো হঠাৎ ঘূর্ণিতে পাক্‌ খেয়ে খেয়ে উপরে উঠতে লাগল। লজ্জাবতী লতার ফিকে বেগুনে রঙা ফুলগুলো সেই হঠাৎ-হাওয়ার ভীষণভাব দোলাদুলি করে উঠল।

অনিবাবু হঠাৎ আমার সেই ঘোর কাটিয়ে বললেন, নিন, চা ধরুন।

চা খেতে খেতে অনেক পুরনো গল্প হল।

একসময় অনিবাবুকে বললাম, কেন এখানে পড়ে আছেন এমন করে, দ্বিতীয়বার অ্যাটাক হলে কি হবে? অঙ্গুল পৌঁছতে পৌঁছতেই তো বেলা

www.BanglaBook.org

যাবে। এখানে কি সেরকম হাসপাতাল আছে, না তেমন কোনো চিকিৎসা হবার সম্ভাবনা আছে ?

অনিবাবু তেলার দিকে চেয়ে অদ্ভুত উদাসীন হাসি হাসলেন।

বললেন, ঋজুবাবু, যার পয়সা নেই, যার খাতির-প্রতিপত্তি নেই, তার জঙ্গলই ভালো। এখানে মরলে দোষটা নির্বিঘ্নে জঙ্গলের ঘাড়ে চাপানো যাবে, কিন্তু শহরে মরলে দোষটা কার ঘাড়ে চাপবে ? জঙ্গলই ভালো।

আমি বললাম, আপনার স্ত্রী, আপনার মেয়ে রাগ করেন না আপনার উপর ?

অনিবাবুর ভুরু কুঁচকে উঠল।

বললেন, আমি হচ্ছি গিয়ে দা গ্রেট জমিন্দার অব্ বরিশাল। বুজরু গুহঠাকুরতার একমাত্র ব্যাটা, দা গ্রেট অনি গুহঠাকুরতা। সেই আমার ওপর রাগ করবে কেডা ? আমার কি আত্মসম্মান নেই যে, মেয়ের রোজগারে ঘরে বসে থাব আমি ? তার চেয়ে এখানে না-খেয়ে শুকিয়ে মরব, তাও ভি আচ্ছা।

আমি একটু থেমে আলোচনাটা লঘু করার চেষ্টা করে বললাম, এটা অভিমানের কথা হল। আপনার সঙ্গে কি কেউ খারাপ ব্যবহার করেছে যে, আপনি ওদের বিনা কারণে দোষী করছেন ?

আমি খুব অপ্রিয় প্রসঙ্গের অবতারণা করে ফেললাম যে, তা পরক্ষণেই বুঝতে পারলাম।

উনি নললেন, দেখুন, আমি কোনো শালার খারাপ ব্যবহারের তোয়াক্কা করি না। তবে কথাটা কি জানেন, খারাপ ব্যবহার করলেও না হয় বুঝতাম। আমার সঙ্গে কেউ যে কোনোরকম ব্যবহারই করে না। আমি একেবারে অব্যবহার্য হয়ে গেছি। বুঝলেন, ভালো-মন্দ, সবরকম ব্যবহারেরই অযোগ্য।

তারপর একটু থেমে বললেন, জানেন, বাবার জমিদারী সেরেস্তায় একজন বুড়ো মুহুরী ছিল। হারাঙ্গ মুহুরী। অথর্ব হয়ে পড়েছিল। সে সেরেস্তা ঘরের এক কোণায় একটা তেলচিটে চৌকিতে শুয়ে-বসে থাকত, খক্ খক্ করে কাশত, অবিরাম ছাগল-নাদির মতো দেখতে চ্যবনপ্রাশ খেত। ও লোকটা যে একটা মানুষ, সেটা কেউই আর স্বীকার করত না। ও যেন ওপারের স্টিমার ধরার জন্যে স্টিমার-ঘাটায় বসে থাকত—বসে থাকত তো বসেই থাকত। ওর যেন আর কিছুই করার ছিল না। আমরা যেতাম আসতাম ওর সামনে দিয়ে, কিন্তু কখনও তাকে তক্তপোষের ওপর তাকিয়ার মতো কোনো জড় পদার্থ ছাড়া অন্য কিছু ভাবিনি। বাড়ির মেয়েরা যখন বজরায় করে বেড়াতে যেতেন তখন ঐ হারাণ মুহুরীকে বাবা সঙ্গে পাঠাতেন। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, হারাণ মুহুরীর সামনে কাকীমা-পিসীমারা কাপড় ছাড়তেন—নানারকম মেয়েলি গল্প করতেন—সে যে একজন মানুষ, পুরুষ-মানুষ, সে যে এখনও বেঁচে আছে, একথা কেউ কখনও মনেই আনতেন না।

www.BanglaBook.org

একটা অপ্রয়োজনীয় ক্ষমতাহীন পোষা কৃপানির্ভর জানোয়ারের মতো তার জীবন ছিল।

অনিবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন, বুঝলেন ঋজুবাবু, ওখানে থাকলে আমায় হারাণ মুহুরীর মতোই বাঁচতে হত। রোজগারে মেয়ে আমার, রোজগার করে আমাকে খাওয়াবে-পরাবে। আমি সেখানে থাকলে তার স্বাধীনতা খর্ব হবে। তার ছেলে-বন্ধুরা অবাধে যাওয়া-আসা করতে পারবে না। তার মা উঠতে-বসতে খোঁটা দেবে। যে রিটায়ার্ড লোকের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স নেই, যার কাছে কারোই আর কিছু পাওয়ার নেই, তাকে কেই চায় না। তার স্থান নেই সংসারে।

আমি বললাম, আপনি হয়তো আপনার স্ত্রী ও মেয়েকে ভুল বুঝেছেন। আপনি হয়তো তাঁদের প্রতি অন্যায় করছেন।

অন্যায় করছি? বলেই, অনিবাবু একবার ফ্যাকাশে আশাহীন চোখ তুলে আমার দিকে তাকালেন।

তারপর বললেন, আমি কারো প্রতিই অন্যায় করিনি। যদি কোনো অন্যায় করে থাকি তো চিরদিন গোড়া থেকেই নিজের উপরেই করেছি। যে প্রথম থেকে শুধু নিজের প্রতিই অবিচার করে, সে বড় নরম চরিত্রের লোক; তাকে সকলেই খেয়ে বসে। তাকে কেউ ক্ষমা করে না। এ কথাটা মনে রাখবেন ঋজুবাবু। আপনার বয়স আমার হাঁটুর সমান। এ কথাটা মনে রাখবেন সবসময়। সারাজীবন।

তারপর চায়ের গেলাসে বড় চুমুক দিয়ে, চুপচাপ একটুক্ষণ বসে থেকেই অনিবাবু বললেন, জঙ্গলী লোক আমি। শহরের কেতাকায়দা জানি না। কী বলতে কি বলে ফেলি, খালি গায়ে লুঙি পরে লোকের সামনে বেরিয়ে পড়ি; রাগ হলে লোককে হারামজাদা বলে গাল পাড়ি। জংলী লোকের এই খোলামেলা জঙ্গলই ভালো। ভুবনেশ্বরের অন্ধকার-অন্ধকার, চিপ্-চিপ্ ঘরে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। থাকতে পারি না সেখানে।

এই অবাধ বলেই, অনিবাবু হঠাৎ উঠে পড়লেন।

আমার দিকে পিছন ফিরে দাওয়ার মধ্যে গিয়ে তৈলার দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন।

একজন লোক ক্ষেতে কাজ করছিল, তাকে চেঁচিয়ে বললেন, এই শালা! কতবার বলসাম তোকে যে, নালার দিকের বেড়াটা মেরামত কর, মেরামত কর। রাতে যখন আবার শুয়োর ঢুকবে, তখন কি তুই আঙুল চুষবি?

তারপর অনিবাবু অনেকক্ষণ আমার দিকে মুখ ফেরালেন না।

যখন আবার আমার কাছে এসে বসলেন দেখলাম, তাঁর কুঁচকে যাওয়া অথচ রক্তশূন্য ফোলা ফোলা চোখের কোল দুটো ভিজে।

আমি অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। খারাপ লাগছিল আমার।

এমন সময় লাল মাটিতে কির্ কির্ শব্দ তুলে সাইকেলটা চালিয়ে রেঞ্জার সাহেব এসে থামলেন শ্যামলবাবুর তৈলার কাছে।

www.BanglaBook.org

সাইকেল থেকে নেমে, সাইকেলটা বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে ভিতরে এলেন। খাকী শোলার টুপিটা খুললেন। তারপর নমস্কার বিনিময়ের পর মাচায় বসে বললেন, বাইসনটাকে ডি. এফ. ও. সাহেব 'রোগ' ডিক্লেয়ার করেছেন। আজই সকালে খবর পাঠিয়েছেন আপনাকে খবর দিতে। যত তাড়াতাড়ি হয় এটাকে মারার চেষ্টা করুন ঋজুবাবু। অনেক ঠিকাদারের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে এর জন্যে। বেজায়গায়-লাগা গাদা বন্দুকের গুলি আর টাঙ্গীর ঘা খেয়ে ওর মেজাজ এমন তিরিক্ষী হয়ে আছে যে, ও সাক্ষাৎ যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ থেকেই লেগে পড়ুন। এর একটা হিল্লে করুন।

অনিবাবুও বললেন, হ্যাঁ। এই সৎ কাজটা করুন তো। তবে ব্যাটা যে কখন কোথায় থাকে তার হদিশ করাই মুশকিল। আজ আর সময় নেই। কাল একেবারে ভোর-ভোর বেরিয়ে পড়ুন সারাদিনের জন্যে।

রেঞ্জার সাহেব বললেন, আপনাদের ডেরার পিছনের জঙ্গলে কালকেও দেখা গেছে তাকে। ঐ পিছনের জঙ্গলে দশ বর্গমাইল এলাকার মধ্যে ও আপাতত আছে। তবে এ তো আর পোষা কুকুর নয় যে চেন দিয়ে বাঁধা থাকবে একজায়গায়। আপনি এক মাইল হেঁটেই দেখা পেতে পারেন তার, আবার সারাদিন ঘুরেও নাও পেতে পারেন।

আমি বললাম, চিনব কি করে? যদি ভুল করে দলছাড়া অন্য কোনো বাইসনকে মেরে দিই।

রেঞ্জার সাহেব হাসলেন। বললেন, কোনো ভয় নেই, তার ধারেকাছে গেলেই সেই-ই আপনাকে চিনিয়ে দেবে—একেবারে আইডেনটিটি কার্ড সঙ্গে নিয়ে সেলাম জানাবে এসে। তবে শুনে রাখুন যে, সে প্রকান্ড বাইসন। আগে ঐ টুম্বকার দিকে থাকত। বলে হাত দিয়ে ওদিকে দেখালেন।

আমি সোজা হয়ে বসে বললাম, সেই বিরাট বাদামীরঙা বাইসনটা? ওকে তো বহুবার দেখেছি আমি, কখনও তো আক্রমণ করেনি?

রেঞ্জার সাহেব বললেন, অঙ্গুল থেকে এক চোরা শিকারির দল এসেছিল রাতে। ফরেস্ট গার্ডকে পানসৌরী খাইয়ে বে-সামাল করে দিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছিল। চারটে সম্বরকে আহত করেছিল, একটাকে নিয়ে গেছিল। আর রাস্তার পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে-থাকা বাইসনটার গায়ে বুলেট মেরে দিয়ে চলে গেছিল। স্রেফ খুশির জন্যে। নেশার ঘোরে। গুলিটা পেটে লেগেছিল। তাতে বেচারা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে কিন্তু মরার এখনও অনেক দেরী।

শুনে খুব খারাপ লাগল। যারা জঙ্গলকে ভালোবাসে না, জঙ্গলকে জানে না, জানতে চায় না; যাদের কোনো দরদ নেই জংলী জানোয়ারদের প্রতি, তারা কেন যে জঙ্গলে আসে জানি না।

একটু পরে রেঞ্জার সাহেব উঠলেন।

বললেন, আমি তাহলে ডি. এফ. ও. সাহেবকে খবর পাঠাচ্ছি যে, আপনি রাজী হয়েছেন। অন্য কাউকে তাহলে এর জন্যে ডাকা হবে না।

আমি মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানালাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উনি বললেন, চলি এখন।

বলেই, বাইরে গিয়ে সাইকেলে উঠে চলে গেলেন।

বেলাও অনেক হল। শ্যামলবাবু কখন ফিরবেন ঠিক নেই। অনিবাবুকে বললাম, তাহলে আমিও উঠি অনিবাবু।

অনিবাবু বললেন, সেদিন টিকরপাড়ায় মাছ পাইনি। মাছ যদি পাই তো খাওয়াবো আপনাকে।

উঠতে উঠতে আবার বললাম, অনিবাবু, আপনি বড় অভিমানী। আমি আপনার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, কিন্তু একটা কথা বলতে পারি; অভিমানের দাম দেয় না কেউই। পৃথিবীতে কারো অভিমানেরই কেউ দাম দেয় না। পৃথিবীটা একটা মুদির দোকান। এখানে এক হাতে দিতে হয়, অন্য হাতে নিতে হয়। দেনা-পাওনাটাই সব। অভিমানের কোনোই কদর নেই।

অনিবাবুর চোয়াল শক্ত হয়ে এল।

বললেন, আমি তা মানি না ঋজুবাবু। এই যে কুকুরের বাচ্চাটা দেখছেন, এ শালার কোনোরকম অভিমান নেই। আমি এটাকে দুবেলা লাথি মারি, তবুও শালা আমার খাওয়ার সময় আমারই হাতের একমুঠো ভাতের জন্যে ঘুরঘুর করে। কিন্তু আমি যে মানুষ ঋজুবাবু। মানুষ মাত্রেরই অভিমান থাকে। থাকা উচিত। যে মানুষের মান-অভিমান জ্ঞান নেই, থাকে না, সে-শালা কুকুর। আমি তো কখনও কুকুর হতে চাইনি।

অনিবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আস্তে আস্তে আমি হেঁটে ফিরছিলাম ডেরার দিকে। শীতের দুপুরবেলা ঝক্‌ঝকে নীল আকাশে রোদ উড়ছিল। আমার মন উড়ছিল। কী ভাবতে ভাবতে, মনে মনে, মনের তাঁতে অনেকরকম লাল নীল হলুদ সবুজ ভাবনার সুখ ও দুঃখের সুতো বসিয়ে শান্তিপুরী তাঁতীর মতো তাঁত বুনতে বুনতে আমি একা একা জঙ্গলের পথে হেঁটে ডেরায় ফিরছিলাম।

বোল্টমনালার কজওয়ের নীচ দিয়ে বকের গায়ের মতো সাদা জল বয়ে চলেছিল পাথরে পাথরে কল্‌কল করে। এ জায়গাটা আমার বড় ভালো লাগে। ঐপাশে মাছ ধরার বাঁশের বেড়া। সেই একলা বন্ধন গাছটা এক কোমর জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে—। সাদা বালির চর, কালো কালো শিকড় বালির ওপর রয়েছে।

কজওয়ের পাশে গাছতলায় একটুক্ষণ বসলাম। তোমার সেই ছবিটা বের করলাম বুক-পকেট থেকে। তুমি! তুমি! সেই কালো ব্লাউজ আর কালো-পাড়ের শাড়ি। তুমি চেয়ে আছ—মিষ্টি দুষ্টু চোখে। চেয়ে আছ।

নয়না, জানো, আমিও অনিবাবুর মতো অভিমানী। আমিও একজন মানুষ। আমি যে কুকুর হতে চাইনি কখনও। তোমার কারণেও কুকুর হতে চাইনি; পারিওনি। মানুষ হয়ে, মানুষ থেকে, সম্মানের সঙ্গে একজন মানসী মানুষীকে চেয়েছিলাম। আজ আমার মতো করে কেউই হয়তো জানে না যে, জীবনে যা কিছু চাওয়া যায় তার অনেক কিছুই পাওয়া যায় না।

www.BanglaBook.org

অথচ তবুও বেঁচে থাকতে হয়, কাজ করতে হয়; কর্তব্যের বোঝা মাথায় নিয়ে হাঁটতে হয়। তবুও নিজের ইচ্ছায় থামা যায় না। অন্যের ইচ্ছা-নির্ভর হয়ে আমরা জন্মাই, মরবার সময়ও নিজের ইচ্ছায় মরা যায় না। কী আশ্চর্য পরনির্ভর আমাদের জীবন!

পুবের আকাশে সবে আলো ফুটেছিল।

ডেরার কাবাড়িদের মধ্যেও তখনও ওঠেনি সকলে। রাতের আগুন তখনও জ্বলছিল ধিকি ধিকি। পোড়া কাঠ, কাঠের ছাই, আগুনের সাদাটে আভা তখনও দেখা যাচ্ছিল।

গগন ইতিমধ্যেই উঠে একটা গামছায়, মাটির হাঁড়িতে চাল বেঁধে নিয়েছিল। দুপুরের মধ্যে না ফিরতে পারলে জঙ্গলেই কোথাও খেয়ে নেবো দু-জনে।

ফোর-ফিফ্‌টি ফোর হান্ড্রেড ডাবল্-ব্যারেল রাইফেলটা নিয়েছিলাম। বাইসন মারার পক্ষে এটাই উপযুক্ত রাইফেল। তাঁবু থেকে বেরিয়ে ডেরার সামনে এসেই মনে হল, কত মাইল হাঁটার পর যে বাইসনের সঙ্গে দেখা হবে তার কোনোই স্থিরতা নেই, তাই এই দশ-পাউন্ড ওজনের রাইফেলটা মাইলের পর মাইল বয়ে বেড়ানো খুবই কষ্টকর হবে। তাই তাঁবুতে ফিরে ঐ রাইফেলটা রেখে দিয়ে, হাল্‌কা থ্রি-সিক্‌স্‌টি-সিকস্ রাইফেলটা নিয়ে এলাম। এটা আমার বাবা আমাকে দিয়েছিলেন। চোদ্দ বছর বয়েস থেকে এটাকে হাতে নিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরছি। তাই একেবারে হাতে-বসা ছিল।

আমরা নালাটা পেরিয়ে তাঁবুর পিছনের জঙ্গলে ঢুকে গেলাম।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই গগন এক্‌টা জানোয়ার-চলা গেম ট্র্যাক-এ এসে পড়ল। আমি আগে যেতে লাগলাম। বেশ ধীরে সুস্থে, চারদিকে ভালো করে নজর করতে করতে। গগনের চোখ নীচের দিকে। কোথাও বাইসনের পায়ের ভাঙ্গ বা ক্ষুরের দাগ দেখতে পাওয়া যায় কি না তাই দেখতে দেখতে যাচ্ছে ও।

কিছুদূর গিয়েই অনেকগুলো বাইসনের খুরের দাগ পাওয়া গেল—পাকদণ্ডীতে এবং একটা দশ হাত চওড়া ছোট্ট শুক্‌নো নালাতেও। কিন্তু ওগুলো কোনো দলের পায়ের চিহ্ন। বোধহয় এ দলটাই আমি আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শ্যামলবাবু যেদিন তেলার বসেছিলাম রাতে, সেদিন তেলার পায়ে রেখেছিলাম।

গগন নীচু গলায় স্বগতোক্তি করল ; বলল, তোদের খুঁজছি না আমরা। গ্যাম্বরের খুনীকে খুঁজছি।

কিছুদূর গিয়েই পাকদণ্ডীটা চড়াইয়ে উঠতে লাগল। চড়াইটা শেষ হবার পর আমরা একটা পাহাড়ের চুড়োয় এসে উঠলাম। পাহাড়ের এ পিঠটায় হরজাই জঙ্গল ছিল। চুড়োয় উঠেই চোখ জুড়িয়ে গেল। গগন যে গগন, জঙ্গল যার চোখে স্রেফ জঙ্গলই শুধু "সাউন্ড" আর "আনসাউন্ড" কাঠের জঙ্গল—জঙ্গলের মানে যার কাছে লক্ষ লক্ষ বর্গফুট দামী কাঠ ছাড়া অন্য কিছুই নয়, সেই গগনও মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

সামনেই পাহাড়ের পিঠটা কচ্ছপের পিঠের মতো ঢালু হয়ে নেমে গেছে। এদিকে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট সেগুনের প্ল্যানটেশান করেছেন। গাছগুলো বছর দশেকের হবে। খুব বড় হয়নি। আগাগোড়া কয়েক মাইল শুধু একই মাপের সেগুন। সেগুনের ফিকে জলপাই-সবুজ বড় বড় পাতাগুলোতে রাতের শিশির পড়েছিল। পুবে সূর্যটা অন্য একটা পাহাড়ের মাথা ছাড়িয়ে সবে মুখ তুলেছে। সেই শিশির-ভেজা সেগুন বনের উপর প্রথম সূর্যের আলো পড়ায় লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হীরে ঝলমল করছে। সেই মাইলের পর মাইল বিস্তৃত ঢালু পাহাড়ের গায়ের সেগুনের পাতার উপরের কোটি কোটি শিশিরবিন্দু থেকে কতরকম যে রঙ, কতরকম যে দ্যুতি ঠিকরে বেরুচ্ছে তা কী বলব!

যেই আমরা চুড়ো ছেড়ে ঢালুতে নেমে এলাম, অমনি সেই অমরাবতী হারিয়ে গেল। এখন মাথার উপরে চন্দ্রাতপ। নীচে শিশির-ভেজা আগাছা ও ঘাসে-ভরা বনের পাকদণ্ডী।

সকাল দশটা নাগাদ আমরা প্রথম গুণ্ডা বাইসনটার পায়ের দাগ পেলাম। এক জায়গায় ও রাতে বসেছিল, সেখানে লোম পড়ে আছে, রক্তও আছে কিছুটা—তবে সামান্য। থকথকে কালো রক্ত। জায়গাটার নরম ঘাসগুলো এখনও শুয়ে আছে—তার উপরে শিশির পড়েছে। তার মানে, রাত থাকতেই সে এ জায়গা ছেড়ে চলে গেছে।

গগন নিরীক্ষণ করে বলল, বাইসনটা এখন আস্তে আস্তে হাঁটছে যদিও তবুও কম করে তিন-চার ঘণ্টা আগে ও এ জায়গা ছেড়েছে। নিশ্চয়ই এতক্ষণে অনেক দূর চলে গেছে। ওর পায়ে পায়ে আমাদের খুব তাড়াতাড়ি যেতে হবে।

এবার গগন আগে আগে চলল। ভাল্লু দেখে দেখে ও তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে লাগল মাটিতে চোখ রেখে নেকড়ের মতো। আমি ওর পায়ে পায়ে চলতে লাগলাম। বেশ জোরেই যাচ্ছিলাম আমরা। জার্কিনের নীচে ঐ শীতের মধ্যেও শিরদাঁড়া বেয়ে শিরশির করে ঘাম পড়তে লাগল। অনেক নালা, টিলা

www.BanglaBook.org

অনেক শালের, সেগুনের ও বাঁশের জঙ্গল পেরিয়ে এলাম আমরা।

এ পর্যন্ত আসতে আসতে একটি কুটরা, একটি খরাশ্টি এবং দুটি নীল গাইয়ের সঙ্গে দেখা হল, কিন্তু আমরা যাকে খুঁজছি তার সঙ্গে দেখা হল না।

সাড়ে-দশটা অবধি একটানা চললাম। ততক্ষণে প্রখর রোদ উঠে গেছিল। অনেকক্ষণ ধরে উঁচু নীচু পথে হাঁটার দরুন আমরা দুজনেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম।

গগন নিচু গলায় বলল, প্রায় ধরে ফেলেছি, এখন পায়ের দাগগুলো একেবারে টাটকা। একফোঁটা রক্ত যে দেখা গেল একটু আগে, সেটাও টাটকা রক্ত। এবার একটা হেস্তনেস্ত হবে। তারপর গগন একটু হেসে বলল, আমি কিন্তু বাবু বিপদ দেখলে গাছে উঠব।

আমি বললাম, সেকথা তোকে আমিও বলতে যাচ্ছিলাম। এ তো ছেলে-খেলা নয়—আহত গুন্ডা বাইসন, ইতিমধ্যে ও মানুষও মেরেছে—তাই তুই কোনোরকম বাহাদুরী না করে, তাকে দেখা গেলেই বা তার আওয়াজ শোনা গেলেই সোজা গাছে চড়ে যাবি। বুঝলে, গগনবাবু ?

গগন হাসল। বলল, আচ্ছা।

ওখান থেকে একটু এগিয়েই আমরা দু-জনেই অবাক হয়ে গেলাম। খুরের দাগ থেকে দেখা গেল, বাইসনটা যেদিকে যাচ্ছিল, সেদিকে না গিয়ে একেবারে অ্যাবাউট টার্ন করে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকেই ফিরে গেছে আবার প্রায় সোজাসুজি। সমান্তরাল রাস্তায়। তবে যাওয়া ও আসার পথের মাঝে একশো গজ মতো তফাত আছে।

আমরা দু-জনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম।

আবার আমি আগে আগে গেলাম। গগনের গায়ে হাত দিয়ে কানে কান লাগিয়ে আবার ওকে বললাম যে, বিপদ দেখলেই ও যেন গাছে ওঠে।

গগন কথা না বলে নিঃশব্দে মাথা নোয়ালো।

আমরা উল্টোদিকে আরও প্রায় একঘণ্টা এলাম। বাইসনটা যে সরল-রেখায় আসছিল, সেই পথ ছেড়ে আবারও হঠাৎ বাঁয়ে ঢুকে গেছে ! ওদিকে প্রায় আধমাইলখানেক দূরে একটা খুব উঁচু দেওয়ালের মতো পাহাড়।—একেবারে খাড়া। তার নীচে বোস্টমনালার গায়ের খোয়ালই-এ ঘন গভীর আগাছা ও বাঁশের জঙ্গল। জঙ্গল এত গভীর যে, এক হাত ভিতরে কী আছে তা দেখা যায় না। এই মধ্যাহ্নেও জায়গাটা রীতিমত ছায়াচ্ছন্ন ; ভিজা-ভিজা, গা-ছমছম। পাথরে-পাথরে নানা রকম শ্যাওলা। ঢেঁকির শাকের মতো ফার্ণ ও একরকম হলুদ ফুলের অর্কিড জন্মেছে। কুটুর কুটুর করে কুটুরে ব্যাঙ ডাকছে পাথরের আড়াল থেকে। ঝিঁঝি ডাকছে অবিরাম।

বাইসনটা এর ভিতরে ঢুকেছে। হয়তো দুপুরে বিশ্রাম নেবার জন্যে। জায়গাটায় কোনোরকম বিঘ্ন হবার কথা নয়।

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম, প্রায় বারোটা বাজে।

এ জায়গাটা আমাদের ডেরা থেকে বড় জোর মাইল দুয়েক—কাকউড়ানে।

www.BanglaBook.org

পুরো অসমান পথটা গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গেছে—তাই ফিরে যেতে সময় লাগবে অনেক। ডেরায় ফেরার প্রশ্ন নেই এখন, কিন্তু সামনের নালার গভীরে ঢুকে পড়লে আর ফেরাও নেই। ওখানে পৌঁছনোর পর মুখ ফিরালেই বিপদ। বাইসনের সঙ্গে মোলাকাৎ করার পরই শুধু ফেরা যাবে। ফেরার কথা ভাবা যাবে।

গগনকে বললাম, গগন, শীগ্‌গীর আগুন কর। একটু খেয়েনি। তারপর তুই এখানেই কোনো গাছে বসে থাকিস ; আমি একা ঢুকব। ওখানে ঢুকলে কতক্ষণে বেরোতে পারব ঠিক নেই।

গগন কথা শুনে খুশি হল। বলল, আমারও ভীষণ খিদে লেগেছে বাবু। সকালে কিছু খাইনি।

মুহূর্তের মধ্যে একটা পরিষ্কার জায়গা দেখে, একটি তিরতিরানো ঝর্ণার পাশের পাথরের ওপর দু-তিনটে ছোট পাথর বসিয়ে উনুনের মতো করে নিয়ে গগন আমাদের খিচুড়ি চাপাল। শালপাতার দোনা করে জল এনে পাথরের একটা পাশ ধুয়ে নিল। ছোট-ছোট কাঠকুটো এনে এবং ওর সঙ্গে করে নিয়ে আসা দু-খণ্ড শুকনো সহজে-দাহ্য কাঠ সাজিয়ে নিয়ে আগুন জ্বালল। ফুঁ দিয়ে ফুঁ দিয়ে আগুনটাকে জোর করে দিল।

পাথরের ওপর টান-টান হয়ে শুয়ে পড়লাম আমি।

নীচে নিরবচ্ছিন্ন অবিচ্ছেদ্য আণ্ডারগ্রোথ। আর চারধারে বড় বড় গাছ। এরকম কোনো বড় গাছের নীচে এলেই বার বার তোমার কথা মনে পড়ে আমার। কিন্তু তুমি আমাকে ছায়া দাওনি। প্রখর রোদের মধ্যেই হাঁটিয়েছ শুধু। বছরের পর বছর।

টুপিটা মুখের ওপর রেখে, রাইফেলটা পাশে রেখে আমি শুয়ে পড়লাম। দশ-পনেরো মিনিট শুয়ে থাকার পরই খিচুড়ির বগ্‌বগ আওয়াজ শোনা গেল হাঁড়িতে। গগন আমায় ডাকল। তারপর শালপাতা ছিঁড়ে এনে পাথরটার উপর বিছিয়ে রাখল। একপাশে একটু সন্ধব নুনের গুঁড়ো। খিচুড়ির হাঁড়িটা পাশে রেখে একটা চ্যাপ্টা কাঠের ঠুকরো দিয়ে চামচের কাজ চালিয়ে খিচুড়ি ঢেলে দিল। আমরা দু-পাশে বসে একই সঙ্গে খেলাম।

খাওয়ার পর গগন ওর হাঁড়িটা ধুতে গেল নালাটাতে। হাঁড়ি করে জল ভরে আনবে ও—জল খাব তখন। পাইপটাকে ধরিয়ে আমি ইজিচেয়ারে শোয়ার মতো করে পাথরটার উপর হেলান দিয়ে শুয়েছি, এমন সময় হঠাৎ একেবারে অতর্কিতে সামনের বাঁ দিকের জঙ্গলে একটা আলোড়নের শব্দ শুনলাম। শব্দটা এত কাছে ও এত দ্রুত হল যে, কিছু বোঝার আগেই লাফিয়ে উঠতে উঠতেই দেখলাম যে, বাইসনটা প্রচণ্ড বেগে আমার দিকে ধেয়ে আসছে। আমি উঠে দু'পায়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতেই ও প্রায় পনেরো হাতের মধ্যে পৌঁছে গেল। সেই মুহূর্তে বড় রাইফেলটা রেখে আসার জন্যে আমি নিজেকে অভিসম্পাত দিলাম। সময় ছিল না বেশি, রাইফেলটা হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে সেফ্‌টি ক্যাচ সামনে টেনে ওটাকে শুটিং পজিশানে আনতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আনতেই বাইসনটা খয়েরী রঙা একটা মালগাড়ির ওয়াগনের মতো আমার উপর এসে পড়ল বিদ্যুৎগতিতে। আমি গুলি করলাম, আমার মনে আছে, গুলি করলাম, তার পরমুহূর্তেই বাইসনটার মাথাটাকে আমার পেটের কাছে দেখলাম। একেবারে কাছে।

শূন্যে উঠে গেলাম। সোজা শূন্যে উঠে গেলাম—অনেক—অনেকখানি উৎক্ষিপ্ত হয়ে গাছগাছালির ফাঁকে ফাঁকে আমি সূর্যকে দেখতে পেলাম, নীল ঝকঝকে আকাশ দেখতে পেলাম একঝলক, তারপর শূন্যেই ডিগবাজী খেয়ে নীচে পড়লাম। কখন যে জোর ব্যথা লেগেছিল আমার মনে নেই। যখন বাইসনটা তার মাথায় করে আমাকে আকাশে ছুঁড়ে ছিল তখনই, না যখন নীচে পড়লাম তখন, তা জানি না। নিচে পড়লাম। তারপরে আমার আর কিছু মনে নেই। অর্কিডের লক্ষ লক্ষ হলুদ ফুল ফুটে উঠল আমার চোখের সামনে, আমার চেতনার আলোকিত চত্বরায় অনেক আলো জ্বলে উঠল। তারপরেই হঠাৎ অন্ধকার, চাপ চাপ গাঢ় অন্ধকার, বোবা অন্ধকার। চারিদিকে। এখন কী আরাম। কী আরামের ঘুম।

দূর থেকে তোমার বাড়ির আলোটা দেখা যাচ্ছিল। ঝাঁকড়া গাছ দুটোর ফাঁকে ফাঁকে তোমার ঘরের আলোর ফালি পথে এসে পড়েছিল। আমি অন্ধকারের মধ্যে পতঙ্গের মতো নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে, জ্বালার দিকে; তোমার ঘরের আলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম।

তোমার বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছেছি, সেই বাড়ির দরজায় আমার ভালোলাগার পা রাখব আমি; এমন সময় চুপ করে অন্ধকার হয়ে গেল। লোড শেডিং হয়ে গেল।

তোমার দরজা খোলা ছিল। আমি অন্ধকারে দরজা ঠেলে ঢুকলাম। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলাম। কোথাও আলো দেখা যাচ্ছিল না। কোথাও আলোর আভাসমাত্র ছিল না।

অন্ধকারে পথ হারিয়ে শিশু যেমন মাকে খোঁজে, তার আশ্রয়কে খোঁজে, আমি তেমন করে বললাম, নয়না, আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না; তুমি কোথায়? তুমি কোথায়?

চাপ-চাপ অন্ধকারে আমার প্রশ্ন হারিয়ে গেল। উত্তর পেলাম না কোনো।

অনেকক্ষণ পর, যেন অনেক যুগ পর, দূর থেকে, বহুদূর থেকে তোমার শান্ত সুন্দর গলা শুনলাম। তুমি বললে, আমি ছাদে আছি। ছাদে আসুন।

তোমার গলার স্বর আমার বুকের মধ্যে ইলেকট্রনিক কমপিউটারের মতো চাবি টিপে-টিপে আমার সমস্ত বোধ, আমার সমস্ত চেতনাকে যোগ করল। যোগ করে নেবার পর, যোগফলের সঙ্গে আমার আনন্দ দিয়ে তাকে গুণ করল। তারপর সেই বহু-গুণান্বিত সংখ্যাগুলো টুকরো টুকরো আনন্দের বোধ হয়ে আমার মনের আকাশময় ছড়িয়ে গেল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি হাতড়ে হাতড়ে আস্তে আস্তে তোমার দিকে হেঁটে যাচ্ছিলাম : কতক্ষণ সিঁড়ি বেয়ে উঠেছিলাম, মনে নেই। অনেকক্ষণ পর ছাদে পৌঁছলাম আমি। তোমার কাছে।

তুমি উঠে এলে না। আমাকে দেখে তুমি যে খুশি হয়েছ, এমন কোনো লক্ষণ দেখালে না। তবুও আমি অন্ধকারের মধ্যে তোমার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম।

প্রায় তোমার কাছে পৌঁছে গেছি, এমন সময় আমার পায়ে লেগে কী যেন একটা ঝন্ ঝন করে ভেঙে গেল।

আমি লজ্জিত হয়ে বুঝতে না পেরে বললাম, কি যেন ভাঙলাম!

তুমি উদাস নৈর্ব্যক্তিক গলায় বললে, আলো।

আমি বললাম, ইস্-স্!

তুমি বললে, কিছু হবে না। এর দাম বেশি না।

আমি আবারও যন্ত্রচালিতের মতো বললাম, ঈ-স্-স্!

তুমি আবারও বললে, দাম বেশি না।

আমি জানতাম যে, আলোর দাম তুমি কখনো জানোনি! যার জীবনে অন্ধকার নেই, ছিল না কখনও, সে আলোর কী যে দাম, তা জানবে কি করে?

আমি বললাম, না, তার জন্যে নয়।

তুমি বিরক্ত গলায় বললে, তবে কি জন্যে?

আমি বললাম, আমি শুধু অন্ধকারই ভাঙতে চেয়েছিলাম; আলো ভাঙতে চাইনি।

তুমি উত্তর দিলে না।

গা ধুয়ে তুমি ছাদে দাঁড়িয়েছিলে। তোমার গায়ের সাবানের গন্ধে ছাদ ভরে গিয়েছিল, সেই গন্ধের সঙ্গে বকুলফুলের গন্ধ মিশেছিল। সেই অন্ধকারে তোমার খুব কাছে দাঁড়িয়ে, তোমার সুস্নাতা শরীরের গন্ধে আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল যে···।

তুমি অনেকক্ষণ কোনো কথা বললে না। তারপরেই তুমি হঠাৎ আক্রমণের গলায় বললে, আপনাকে নিয়ে আমি ফেড-আপ্। আমি ফেড্আপ হয়ে গেছি।

আমি অনেক কিছু বলতে পারতাম, কিন্তু ইচ্ছে হল না। একসঙ্গে এত কথা ভিড় করে এল যে গুছিয়ে বলতে পারা সম্ভব ছিল না। গলার কাছে অভিমান দলা পাকিয়ে উঠল।

আমি বললাম, আমি যাচ্ছি।

তুমি বললে, বসবেন না?

তোমার গলায় আনন্দের রেশ লাগল। আমি এখুনি চলে গেলে তুমি যে সুখি হও, এ কথাটা বুঝতে পেরেছি জেনে তুমি খুশি হলে।

আমি আবার বললাম, যাচ্ছি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তুমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, আচ্ছা।

আগে তুমি রোজ সিঁড়ির মুখ অবধি আসতে। আমি নেমে না-যাওয়া অবধি দাঁড়িয়ে থাকতে। আজ তুমি কিছুই করলে না। আমাকে তুমি ভেঙে-যাওয়া আলোর মতোই বাতিল করে দিলে।

আমি অন্ধকারের মধ্যে, অন্ধকারের সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে, অন্ধকার পথে নেমে এলাম। নেমে এসেই, দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমি কোথায় যাবো? আমার যে আর কোথাওই যাবার ছিল না; নেই।

তোমার বাড়ি, তোমার মন ছাড়া অন্য কোথাওই তো যাইনি কখনও আমি! অন্য কোনো মনেই তো আমি যেতে চাইনি।

অনিবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল হঠাৎ।

উনি ইশারায় বললেন, যাবেন নাকি? আমি যাচ্ছি।

উনি চলতে লাগলেন।

বাইসনটা আমার থেকে একটু দূরে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়েছিল।

ওর সারা গায়ে রক্ত। আমার সারা গায়েও রক্ত।

আমি ওর উদ্দেশ্যে বললাম, যাবেন নাকি? আমরা চললাম।

বাইসনবাবু কি বললেন উত্তরে, এবং আদৌ কিছু বললেন কিনা তা শুনতে পেলাম না।

মনে হল, তিনি আমাদের আগেই রওনা দিয়েছেন।

আমি আর অনিবাবু হেঁটে চললাম।

আস্তে আস্তে।

আমাদের কোনো তাড়া ছিল না।

হলুদ অর্কিড আর সবুজ নরম ফার্ণ পায়ে মাড়িয়ে, গিলিরী শিয়ারী, মুতুরী লতার পাশ দিয়ে; লাল লাল থোকা-থোকা না-নউ রয়া ফুল-ফোটা ঝোপের মধ্যে মধ্যে আমরা হেঁটে চললাম। যেন ভারশূন্য ভাবে ভেসে চললাম।

অনিবাবু বললেন, জঙ্গলই ভালো, বুঝলেন ঋজুবাবু; গোলামেলা, নিঃশ্বাসের কষ্ট হয় না। কি বলেন?

উত্তরে আমি বোধহয় কিছু বলতে চাইলাম, কিন্তু...।

আমি পাশাপাশি হেঁটে চললাম।

যেন ভেসে চললাম—

কোনো অজানা অথচ আশ্চর্য এক অনাবিল দেশে।

BanglaBook.org